# উপক্রমণিকা

মহান দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র বসুর নামাঙ্কিত এই মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্মুক্ত শিক্ষাঙ্গনে আপনাকে স্বাগত। সম্প্রতি এই প্রতিষ্ঠান দেশের সর্বপ্রথম রাজ্য সরকারি মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ন্যাক (NAAC) মূল্যায়নে 'এ' গ্রেড প্রাপ্ত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন প্রকাশিত নির্দেশনামায় স্নাতক শিক্ষাক্রমকে পাঁচটি পৃথক প্রকরণে বিন্যস্ত করার কথা বলা হয়েছে। এগুলি হল—'কোর কোর্স', 'ডিসিপ্লিন স্পেসিফিক ইলেকটিভ', 'জেনেরিক ইলেকটিভ' এবং 'স্কিল' / 'এবিলিটি এনহ্যান্সমেন্ট কোর্স'। ক্রেডিট পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে বিন্যস্ত এই পাঠক্রম শিক্ষার্থীর কাছে নির্বাচনত্মক পাঠক্রমে পাঠ গ্রহণের সুবিধে এনে দেবে। এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ষান্মাষিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা এবং ক্রেডিট ট্রান্সফারের সুযোগ। শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক এই ব্যবস্থা মূলত গ্রেড-ভিত্তিক যা অবিচ্ছিন্ন আভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সার্বিক মূল্যায়নের দিকে এগোবে এবং শিক্ষার্থীকে বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত সুবিধা দেবে। শিক্ষাক্রমের প্রসারিত পরিসরে বিবিধ বিষয় চয়নের সক্ষমতা শিক্ষার্থীকে দেশের অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আন্তঃব্যবস্থায় অর্জিত ক্রেডিট স্থানান্তরে সাহায্য করবে। শিক্ষার্থীর অভিযোজন ও পরিগ্রহণ ক্ষমতা অনুযায়ী পাঠক্রমের বিন্যাসই এই নতুন শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য।

UGC (Open and Distance Learning Programmes and Online Programmes) Regulations, 2020 অনুযায়ী সকল উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্নাতক পাঠক্রমে এই সি.বি.সি.এস. পাঠক্রম পদ্ধতি কার্যকরী করা বাধ্যতামূলক—উচ্চশিক্ষার পরিসরে এই পদ্ধতি এক বৈকল্পিক পরিবর্তনের সূচনা করেছে। আগামী ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষ থেকে স্নাতক স্তরে এই নির্বাচনভিত্তিক পাঠক্রম কার্যকরী করা হবে, এই মর্মে নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বর্তমান পাঠক্রমগুলি উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রের নির্ণায়ক কৃত্যকের যথাবিহিত প্রস্তাবনা ও নির্দেশাবলী অনুসারে রচিত ও বিন্যস্ত হয়েছে। বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে সেইসব দিকগুলির প্রতি যা ইউ.জি.সি কর্তৃক চিহ্নিত ও নির্দেশিত।

মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে স্ব-শিক্ষা পাঠ-উপকরণ শিক্ষার্থী সহায়ক পরিষেবার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সি.বি.সি.এস পাঠক্রমের এই পাঠ-উপকরণ মূলত বাংলা ও ইংরেজিতে লিখিত হয়েছে। শিক্ষার্থীদের সুবিধের কথা মাথায় রেখে আমরা ইংরেজি পাঠ-উপকরণের বাংলা অনুবাদের কাজেও এগিয়েছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ শিক্ষকরাই মূলত পাঠ-উপকরণ প্রস্তুতির ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন—যদিও পূর্বের মতই অন্যান্য বিদ্যায়তনিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের সাহায্য আমরা অকুণ্ঠচিত্তে গ্রহণ করেছি। তাঁদের এই সাহায্য পাঠ-উপকরণের মানোন্নয়নে সহায়ক হবে বলেই আমার বিশ্বাস। নির্ভরযোগ্য ও মূল্যবান বিদ্যায়তনিক সাহায্যের জন্য আমি তাঁদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই এই পাঠ-উপকরণ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণ পদ্ধতি-প্রকরণে নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। উন্মুক্ত শিক্ষাঙ্গনের পঠন প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত সকল শিক্ষকের সদর্থক ও গঠনমূলক মতামত আমাদের আরও সমৃদ্ধ করবে। মুক্তশিক্ষাক্রমে উৎকর্ষের প্রশ্নে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

পাঠ-উপকরণ প্রস্তুতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই এবং এই উদ্যোগের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

**অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার**

উপাচার্য

**Netaji Subhas Open University**

Under Graduate Degree Programme

Choice Based Credit System (CBCS)

Environmental Studies

পরিবেশ বিদ্যা

AE-ES-21

প্রথম মুদ্রণ : April, 2021

---

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী মুদ্রিত।

Printed in accordance with the regulations of the Distance Education Bureau of the University Grants Commission.

# Netaji Subhas Open University

**Under Graduate Degree Programme**
**Choice Based Credit System (CBCS)**
**(নির্বাচন ভিত্তিক মূল্যমান ব্যবস্থা)**

**বিষয়: পরিবেশ বিদ্যা**
**Subject- Environmental Studies**

**পাঠক্রম : AE-ES-21**

**: বিষয় সমিতি :**
**সদস্যবৃন্দ**


প্র. (ড.) কাজল দে
*Professor of Mathematics*
*N.S.O.U. (Chairperson)*

প্র. (ড.) শুভ্র কুমার মুখার্জি
*Former Principal & Professor of Zoology*
*Hooghly Mohsin College*
*W.B.S.E.S.*

প্র. (ড.) নন্দ দুলাল পাড়িয়া
*Professor of Botany*
*N.S.O.U.*

প্র. (ড.) অনিরুদ্ধ মুখোপাধ্যায়
*Professor of Environmental Science,*
*University of Calcutta*

শ্রী নীলাদ্রি শেখর মণ্ডল
*Assistant Professor of Environmental Science,*
*N.S.O.U.*

ড. প্রদীপ কুমার দত্ত
*Former Associate Professor of Physics,*
*W.B.E.S.*

*: রচনা :*
শ্রী নীলাদ্রি শেখর মণ্ডল
*Assistant Professor of Environmental Science,*
*Netaji Subhas Open University*

*: সম্পাদনা :*
প্র. (ড.) অনিরুদ্ধ মুখোপাধ্যায়
*Professor of Environmental Science,*
*University of Calcutta*

*: বিন্যাস সম্পাদনা :*
শ্রী নীলাদ্রি শেখর মণ্ডল



**প্রজ্ঞাপন**

এই পাঠ-সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোনো অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনোভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

**কিশোর সেনগুপ্ত**
নিবন্ধক

# নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

## নির্বাচন ভিত্তিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা

## (Choiced Based Credit System)

# পরিবেশ বিদ্যা

## (Environmental Studies)

## AE-ES-21


| | | |
|---|---|---|
| **একক 1** ❑ | পরিবেশের মৌলিক ধারণা (Fundamentals of Environment) | 7-21 |
| **একক 2** ❑ | প্রাকৃতিক সম্পদ : নবীকরণযোগ্য এবং অনবীকরণযোগ্য (Natural Resource:Renewable and Non renewable) | 22-40 |
| **একক 3** ❑ | বাস্তুতন্ত্র (Ecosystem) | 41-57 |
| **একক 4** ❑ | জীববৈচিত্র্য ও তার সংরক্ষণ (Biodiversity and its conservation) | 58-70 |
| **একক 5** ❑ | পরিবেশ দূষণ (Environmental Pollution) | 71-110 |
| **একক 6** ❑ | পরিবেশগত সমস্যা, নীতি এবং চর্চা (Environmental Issues, Policies and Practices) | 111-129 |
| **একক 7** ❑ | জনসংখ্যা ও পরিবেশ (Human Population and Environment) | 130-142 |

# একক ১ ❑ পরিবেশের মৌলিক ধারণা (Fundamentals of Environment)

গঠন


১.০ উদ্দেশ্য

১.১ প্রস্তাবনা

১.২ পরিবেশের সংজ্ঞা [Definition of Environment]

১.৩ পরিবেশের শ্রেণিবিভাগ [Types of Environment]

১.৪ ভৌত পরিবেশ সম্পর্কে ধারণা [Concept of Physical Environment]

১.৫ পরিবেশ বিদ্যার মৌলিক ধারণা [Basic Concept of Environmental Studies]

১.৬ পরিবেশ বিদ্যার গুরুত্ব [Importance of Environmental Studies]

১.৭ পরিবেশ বিদ্যার পরিধি [Scope of Environmental Studies]

১.৮ প্রাকৃতিক পরিবেশের বৈশিষ্ট [Nature of Physical Environment]

১.৯ প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদান [Components of Physical Environment]

১.১০ পরিবেশ শিক্ষা [Environmental Education]

১.১১ অনুশীলনী


## ১.০ উদ্দেশ্য (Introduction)

এই এককটি পাঠ করে আপনি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানতে পারবেন।

- পরিবেশ কাকে বলে।
- পরিবেশ কয়প্রকার ও কি কি।
- মানবজীবনে পরিবেশবিদ্যা পাঠের প্রয়োজনীয়তা পরিবেশের বিভিন্ন সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য আমরা কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করব।
- প্রাকৃতিক পরিবেশের বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি।
- প্রাকৃতিক পরিবেশের জৈব, অজৈব ও শক্তি উপাদানগুলি কিভাবে পরিবেশকে প্রভাবিত করে।
- পরিবেশ শিক্ষার উদ্দেশ্য।

## ১.১ প্রস্তাবনা

মানুষ যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে পৃথিবীতে বসবাস করে তাকেই পরিবেশ বলে। পারিপার্শ্বিক অবস্থা বলতে বোঝায় প্রকৃতির সমস্ত দান, যেমন— পাহাড়-পর্বত, নদী, বন-জঙ্গল, কীটপতঙ্গ, জল, মাটি, বাতাস, জীবজন্তু ও মানুষ। পরিবেশের এই উপাদানগুলিই মানুষকে প্রভাবিত করে এবং পরিবেষ্টিত রাখে।

পরিবেশ বিদ্যা একটি বহুমুখী বিষয়। রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, জীবনবিজ্ঞান, মৃত্তিকাবিজ্ঞান, কৃষিবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, জনস্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যকারুবিদ্যা, আইন, সমাজবিদ্যা, ইতিহাস, ভূগোল, ভূতত্ত্ব ইত্যাদি বহুবিধ বিষয় এর অন্তর্গত। এক কথায় সমস্ত পরিবেশ তার জল, স্থল, অন্তরীক্ষ নিয়ে একদিকে আর মানুষ অন্যদিকে— এ দুয়ের যাবতীয় মিতস্ক্রিয়া এবং তৎ সঞ্জাত ফলশ্রুতি পরিবেশ বিদ্যায় আলোচিত হয়ে থাকে।

তবে পরিবেশবিজ্ঞান ও পরিবেশ বিদ্যার মধ্যে একটি পার্থক্য আছে। পরিবেশ বিজ্ঞানে বীক্ষনাগারের একটা ভূমিকা থাকে। সেখানে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ ও তৎসঞ্জাত সিদ্ধান্ত গ্রহণ একটি বিশেষ ভূমিকা নেয়। আর সেইজন্য বিজ্ঞানের এক বা যুগপৎ একাধিক শাখায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি প্রয়োজন। অন্যদিকে পরিবেশ বিদ্যা সকলের জন্য। এর একটি বড় দিক হচ্ছে সচেতনতা (Awareness)। এই বিদ্যার প্রচারও অধিপতির উদ্দেশ্য হচ্ছে বিশেষ করে ছাত্র সাধারণকে এবং সাধারণভাবে বৃহত্তর মানব সম্পদকে পরিবেশের সুরক্ষা, সংরক্ষণ ও সুব্যবহার সম্বন্ধে সচেতন ও অবহিত করা।

বর্তমানে সংকলনটি এই লক্ষ্য নিয়েই পরিকল্পিত হয়েছে। অবশ্য আরও একটি উদ্দেশ্য আছে। নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী শিক্ষার্থিনীদের পরিবেশবিদ্যার প্রাথমিক স্বশিক্ষণ উপকরণ হিসাবেও এটি ব্যবহৃত হবে। সেজন্যই এই আলোচনা সম্পূর্ণ পাঠক্রম ভিত্তিক এবং অবশ্যই অসম্পূর্ণ। বিশ্ববিদ্যালয় ভবিষ্যতে সম্পূর্ণতর সংকল্প প্রকাশে আগ্রহী। অবশ্য এটাও নিশ্চিত যে এই সংকলনের পর্যালোচনা শিক্ষার্থী সাধারণকে সম্পূর্ণতর ও বিস্তৃততর আলোচনায় প্রবেশ করতে আগ্রহী হবে।

## ১.২ পরিবেশের সংজ্ঞা (Definition of Environment)

পরিবেশ শব্দটির উৎপত্তি ‘ফ্রেঞ্চ’ শব্দ environ থেকে, যার অর্থ en অর্থে in অর্থাৎ মধ্যে এবং viron অর্থে circuit অর্থাৎ পরিবেষ্টন। অর্থাৎ পরিবেশ বলতে পরিবেষ্টনকারী পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে বুঝায়। দ্য কনসাইজ অক্সফোর্ড ডিকশনারিতে (১৯৯২) পরিবেশের সংজ্ঞা হিসাবে বলা হয়েছে— ‘‘পরিবেশ হল উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতের ওপর প্রভাব বিস্তারকারী বহিরঙ্গের অবস্থাগুলির সমষ্টি।” জীবের জন্ম, বৃদ্ধি ও অস্তিত্ব রক্ষার সহায়ক জৈব, অজৈব ও সাংস্কৃতিক উপাদানগুলি পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ায় যে পারিপার্শ্বিক অবস্থা গড়ে ওঠে তাকে পরিবেশ বলে। আর্মস (Arms) ১৯৯৪ খ্রিঃ এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স নামক গ্রন্থে বলেছেন যে— জৈব সম্প্রদায়ের পারিপার্শ্বিক জৈব এবং প্রাকৃতিক অবস্থাকে পরিবেশ বলে। পরিবেশ বিজ্ঞানী বট্‌কিন ও কেলার (Botkin and Keller) ১৯৯৫ খ্রিঃ ‘‘এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স” নামক গ্রন্থে বলেছেন যে জীব, উদ্ভিদ বা প্রাণী তাদের জীবনচক্রের যে কোন সময়ে যে সমস্ত জৈব এবং অজৈব কারণগুলি দ্বারা প্রভাবিত হয়, সেই কারণগুলির সমষ্টিকে পরিবেশ বলে। C. C. Park-এর মতে— "Environment refers to the sum total of conditions which surround man at a given point in space and time," স্থান ও কালের কোন প্রদত্ত বিন্দুতে যেসব অবস্থা মানুষকে পরিবেষ্টন করে রাখে, তাদের সমষ্টিগত অবস্থাকে পরিবেশ বলে।

## ১.৩ পরিবেশের শ্রেণিবিভাগ (Types of Environment)

প্রকৃতিগত পার্থক্য ও মৌলিক গঠনের উপর ভিত্তি করে পরিবেশকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। যথা— প্রাকৃতিক পরিবেশ (Physical environment) এবং সাংস্কৃতিক বা মনুষ্যসৃষ্ট পরিবেশ (Cultural or man-made environment) পৃথিবীতে মানুষ আসার আগে 'সাংস্কৃতিক পরিবেশ' বলে কিছু ছিল না; যা ছিল, সবই 'প্রাকৃতিক পরিবেশ'। প্রাকৃতিক পরিবেশ সর্বত্র ও সবসময় মানুষের অনুকূল ছিল না। তাই বৌদ্ধিক শক্তি ও বৈজ্ঞানিক কৃৎকৌশল প্রয়োগের দ্বারা প্রয়োজন ও সুবিধামতো প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তন সাধন করে মানুষ যে পরিবেশ সৃষ্টি করেছে তাকে সাংস্কৃতিক পরিবেশ বলে।

পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও এদের শ্রেণিবিভাগ পরপৃষ্ঠায় ছকের আকারে দেখানো হলো—

## ১.৪ ভৌত পরিবেশ সম্পর্কে ধারণা (Concept of Physical Environment)

'প্রাকৃতিক পরিবেশ' প্রকৃতির সৃষ্টি। পৃথিবীতে জীব জন্মাবার আগে থেকেই 'প্রাকৃতিক পরিবেশ' রচিত হয়ে আছে। প্রাকৃতিক পরিবেশ রচনায় জীবকূলের এমন কি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জীব মানুষেরও কোন ভূমিকা বা অবদান নেই। মাটি, জল, মরুভূমি, পাহাড়-পর্বত, তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, মাটির গঠন ও প্রকৃতি, উদ্ভিদ, প্রাণী সব কিছু নিয়েই প্রাকৃতিক পরিবেশ। এই পরিবেশ তৈরি হতে প্রকৃতির সময় লেগেছে কোটি কোটি বছর। দীর্ঘ সময় ধরে খুব ধীর প্রক্রিয়ায় প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তন হয়। প্রাকৃতিক পরিবেশ যেমন বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতকে প্রভাবিত করে, তেমনই মানুষের যাবতীয় ক্রিয়াকলাপের ওপরও প্রভাব ফেলে। মানুষের নিকট প্রাকৃতিক পরিবেশ দুটি কারণে গুরুত্বপূর্ণ।

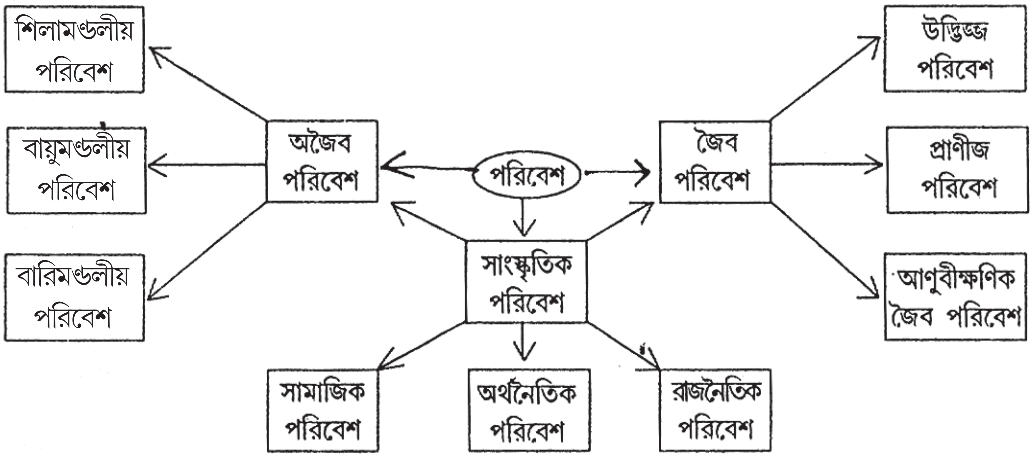


(i) জীবন প্রয়োজনীয় শর্ত হিসাবে

এবং

(ii) সম্পদের ভাণ্ডার হিসাবে।

কৃষি, খনিজ, শক্তি, বনজ দ্রব্য এবং শিল্পবিকাশ সব কিছুরই মূল ভিত্তি হল প্রকৃতি। অর্থাৎ প্রাকৃতিক পরিবেশ হল— The landscape before man was fashioned on the earth.

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশ বিভিন্ন। প্রাকৃতিক পরিবেশের তারতম্য জলবায়ু, মাটি, উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতের বৈশিষ্ট্যের তারতম্য ঘটে এবং মানুষের ক্রিয়া-কলাপেও তারতম্য দেখা যায়।

## ১.৫ পরিবেশ বিদ্যার মৌলিক ধারণা (Basic Concepts of Environmental Studies)

পরিবেশের সঙ্গে মানুষের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বিষয়ক পাঠই হল পরিবেশবিদ্যা। পরিবেশ বিদ্যায় যেমন প্রাকৃতিক পরিবেশ, সামাজিক পরিবেশ ও সমষ্টিগত পরিবেশের কথা বলা হয়, তেমনি এদের প্রত্যেকের মধ্যে যে সম্পর্ক আছে তাও আলোচনা করা হয়। পরিবেশ চর্চার মূল উদ্দেশ্যই হল পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন হওয়া। অর্থাৎ ভালভাবে পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে হলে অবশ্যই মানুষকে পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। পৃথিবীতে মানুষ সহ সমগ্র জীবজগত যাতে স্বাভাবিকভাবে বসবাস করতে পারে তার জন্য পরিবেশের উপাদানগুলির মান, পরিমাণ, সক্রিয়তা ও ভারসাম্য রক্ষা করা এবং পরিবেশের সমস্যাগুলির স্বরূপ অনুধাবন করে তার স্থায়ী সমাধানে যথাযথ ব্যবস্থা করতে মানুষকে পরিবেশ মনস্ক করে তুলতে পরিবেশ পাঠের প্রয়োজন আছে। অন্যদিকে প্রতিটি মানুষ যেন তার নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে ব্রতী হয়, সে ব্যাপারে সচেতন করতেও প্রয়োজন পরিবেশ পাঠের।

বিভিন্ন ভূতাত্ত্বিক কালে পরিবেশের যে আমূল পরিবর্তন হয়েছে তা সবই ছিল প্রাকৃতিক। আর বর্তমানে যা সারা বিশ্বকে ভাবিয়ে তুলেছে তা হলো মনুষ্যসৃষ্ট পরিবেশ সংকট। এর মোকাবিলা যদি না করতে পারা যায় তবে বর্তমান সভ্যতা নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে বাধ্য। প্রতিনিয়ত আমাদের গৃহস্থলী ও শিল্পজাত কঠিন ও তরল বর্জ্য পদার্থ, বাতাসে যানবাহন ও শিল্প নির্গত গ্যাসীয় পদার্থের মাত্রাতিরিক্ত নির্গমণ, ব্যাপক হারে অরণ্য ছেদন ইত্যাদির ফলে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে চলেছে। যার ফলশ্রুতি হিসাবে ভূপৃষ্ঠের ও আবহমণ্ডলের উষ্ণতামাত্রা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। পরিবেশ আজ জর্জরিত নানা ধরনের দূষণে (বায়ু, জল, শব্দ, মৃত্তিকা) ও ওজোন স্তরের ধ্বংসসাধনে। (মনুষ্যসৃষ্ট) এই দূষণের প্রতিকার মানুষকেই করতে হবে।

পরিবেশকে বাঁচাতে হলে মানুষের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা এবং সক্রিয় সহযোগিতার প্রয়োজন। তাই শুধুমাত্র শিক্ষিত এবং পরিবেশমনস্ক মানুষ নয়, শিক্ষার সর্ববিষয়ে এবং সর্বস্তরে পরিবেশ পাঠকে অপরিহার্য করে তুলতে হবে, যা পরিবেশ সংক্রান্ত বর্তমান সমস্যাগুলিকে সনাক্ত করতে ও তার স্থায়ী সমাধান খুঁজে নিয়ে মানবজাতির প্রকৃত সমৃদ্ধি ঘটাতে সাহায্য করবে।

## ১.৬ পরিবেশ বিদ্যার গুরুত্ব (Importance of Environmental Studies)

প্রাত্যহিক জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে প্রকৃতি এবং তার পরিবেশ, শুধুমাত্র আমরা নয় অন্যান্য জীবকুলও প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল। পরিবেশবিদ্যা, প্রকৃতি মায়ের গুরুত্ব, ও তার সংরক্ষণ সম্বন্ধে অবগত করায়। দিনের পর দিন যেভাবে পরিবেশ দূষণ হচ্ছে, জনসংখ্যার বৃদ্ধি হচ্ছে তাতে পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা খুবই জরুরি। পরিবেশবিদ্যা যে কারণগুলির জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে, তা হল :

- বিভিন্ন পরিবেশ সম্পর্কিত সমস্যা যেমন বিশ্ব-উষ্ণায়ন, ওজন স্তর ধ্বংস, অম্লবৃষ্টি, জীববৈচিত্র্য হ্রাস এই সমস্ত সমস্যা আজ আর কোন দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, সারা বিশ্বব্যাপী এর কারণ এবং প্রভাব দেখা

যাচ্ছে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য আন্তর্জাতিক স্তরে পরিবেশ সম্পর্কিত জ্ঞান এবং পরিবেশ চেতনার বিকাশ ঘটাতে পরিবেশ বিদ্যা আবশ্যক।

- যেভাবে দিনের পর দিন জনসংখ্যার স্ফীতি ঘটছে তার ফলস্বরূপ বর্জ্য ও দূষিত পদার্থের পরিমাণ বাড়ছে। শুধু তাই নয়, প্রাকৃতিক সম্পদের অত্যধিক ব্যবহারের ফলে তার হ্রাসও হচ্ছে এবং দূষিত পদার্থ পরিবেশে ফেলার ফলে জল, মাটি সবকিছু দূষিত হচ্ছে, যেমন— মাটির উর্বরতা হ্রাস, লবণাক্ততা বৃদ্ধি সবই পরিবেশ দূষণের জন্য হচ্ছে। এই সবকিছু সমাধানের জন্য পরিবেশ বিদ্যার বিস্তার জরুরি।
- মানব সভ্যতা বিজ্ঞান, প্রযুক্তির ফলে যত উন্নত হয়েছে তত বেশি বেশি পরিবেশের উপর অত্যাচার বেড়েছে। তৈরি করা হয়েছে বড় বড় ইমারত। কেটে ফেলা হচ্ছে বনভূমি ও সবুজ গাছ, পরিবর্তে গড়ে তোলা হচ্ছে কংক্রিটের জঙ্গল যা প্রাকৃতিক ভারসাম্য হ্রাস করছে।
- মনে রাখতে হবে সৌরজগৎ-এর মধ্যে একমাত্র পৃথিবীতে প্রাণের সঞ্চার ঘটেছে। সুতরাং যদি সুপরিকল্পিত ভাবে উন্নয়ন না করা হয় প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার অকিঞ্চিত ভাবে করা হয় তাহলে এই প্রাণের আলো একদিন নিভে যাবেই এবং অন্যান্য গ্রহের মতো পৃথিবী একটি মৃত গ্রহে পরিণত হবে। তাই মানব সচেতনতা ও পরিবেশকে সুস্থ সবল রাখার জন্য পরিবেশ বিদ্যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

## ১.৭ পরিবেশ বিদ্যার পরিধি (Scope of Environmental Studies)

আমরা পরিবেশের মধ্যে বসবাস করি এবং প্রকৃতি মাতা তার উপাদান দিয়ে আমাদের লালন পালন করেন। তাই প্রকৃতিকে সুস্থ রাখা আমাদের কর্তব্য। প্রকৃতি নিজের উপাদানগুলির মধ্যে সুসামঞ্জস্য বজায় রাখার চেষ্টা করে কিন্তু এর ব্যতিক্রম হল মানুষ, মানুষ তার নিজের চাহিদা মেটানোর জন্য পরিবেশের উপাদানকে নষ্ট করে চলেছে। ধ্বংস হচ্ছে সবুজ, নিঃশ্বেষ হয়ে যাচ্ছে পরিসুদ্ধ স্বাদু জলের ভাণ্ডার। এই সবকিছুর প্রতিকার হিসাবে পরিবেশবিদ্যা পাঠ্য বিষয় হওয়া খুবই জরুরি। পরিবেশবিদ্যা সাধারণ ভাবে একটি মিশ্র বিদ্যা কারণ এটি একটি নানা বিদ্যার সম্ভার। বর্তমান পরিবেশকে সঠিক ভাবে জানতে আমাদের সাহায্য করে পরিবেশবিদ্যা। পরিবেশবিদ্যার সাধারণত দুটি দিক আছে, একটি তাত্ত্বিক দিক যা পরিবেশের সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করে আর একটি ব্যবহারিক দিক যা সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

## ১.৮ প্রাকৃতিক পরিবেশের বৈশিষ্ট (Nature of Physical Environment)

(i) **প্রাকৃতিক পরিবেশ সতত পরিবর্তনশীল ঃ** পৃথিবীর জন্মের সময় থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর ভৌত রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে চলেছে। ভূ-অভ্যন্তরীণ ভূ-গাঠনিক শক্তি সমূহ ক্রিয়াশীল থাকায় সহনমন ও সংকোচন বলের প্রভাবে মহীখাতে সঞ্চিত পলিরাশিতে চাপের ফলে সৃষ্টি হয়েছে ভঙ্গিল পর্বত। পৃথিবীর জন্মলগ্নে ছিল না আবহাওয়া। বিভিন্ন গ্যাস ও জলীয় বাষ্পের আনুপাতিক হারে পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমান বায়ুমণ্ডলীয় পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। আবার বর্তমানে গ্রীণ হাউস গ্যাসগুলির মাত্রাতিরিক্ত সঞ্চয়ের ফলে পৃথিবীর উষ্ণতার মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। অতএব বলা যায়, প্রাকৃতিক পরিবেশ সততই পরিবর্তনশীল।

(ii) **প্রাকৃতিক পরিবেশ কতকগুলি নিয়মের মাধ্যমে চালিত হয় ঃ** প্রাকৃতিক নিয়ম স্থির ও সুনির্দিষ্ট। মানুষ তার কাজকর্মের মাধ্যমে প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া সমূহের মাত্রা ও তীব্রতার পরিবর্তন ঘটালেও প্রাকৃতিক পরিবেশের মুখ্য

প্রক্রিয়াসমূহ যথা অন্তর্জাত ও বহির্জাত প্রক্রিয়াসমূহ কতকগুলি মৌলিক প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক নিয়ম অনুসারে চলে।

(iii) **পরিবেশের প্রত্যেকটি উপাদান আন্তঃ সম্পর্কযুক্ত ঃ** প্রাকৃতিক পরিবেশ গঠনকারী উপাদানগুলি আন্তঃসম্পর্কযুক্ত হওয়ায় এদের একটির পরিবর্তন ঘটলে অন্যটির উপর তার প্রভাব পড়ে।

(iv) **প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রবণতা হল ভারসাম্য অবস্থায় উপনীত হওয়া ঃ** ভূ-আলোড়নের ফলে ভূমিরূপের যে পরিবর্তন হয় তাকে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য ক্রমায়মান প্রক্রিয়াগুলি সব সময় ক্রিয়াশীল থাকে। পরিবেশের ভারসাম্য বিঘ্নিত হলে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়েই তা পুনরায় ভারসাম্যে উপনীত হয়।

(v) **প্রাকৃতিক পরিবেশের কোন সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রমান নেই ঃ** জায়গাবিশেষে তা সুবৃহৎ, বৃহৎ, মধ্যম এমনকি সুক্ষ্ম বা অনুপরিবেশও হতে পারে।

## ১.৯ প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদান (Components of Physical Environment)

প্রাকৃতিক পরিবেশ যে যে উপাদান দিয়ে রচিত, সেগুলি তিন প্রকার।

1. অজৈব বা ভৌত উপাদানসমূহ (Abiotic = non-living components)
2. জৈব বা সপ্রাণ উপাদানসমূহ (Biotic = living components)
3. শক্তি উপাদান (Energy components)

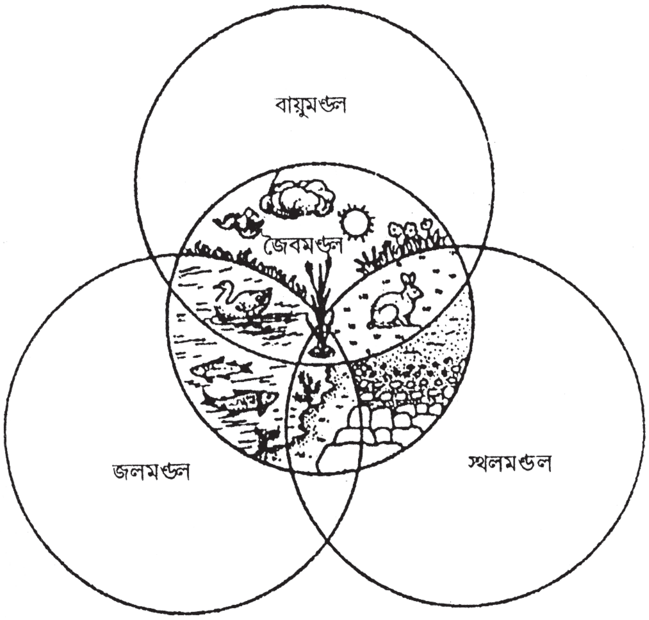


চিত্র : প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদানসমূহ

প্রাকৃতিক পরিবেশের অজৈব উপাদানসমূহ তিন প্রকার।

যথা— কঠিন (Solid), তরল (Liquid) ও গ্যাসীয় (Gaseous)।

(i) কঠিন উপাদানে গঠিত প্রাকৃতিক পরিবেশ, যথা— পৃথিবীর কঠিন অংশ যা শিলামণ্ডল (lithosphere) নামে।

(ii) তরল উপাদানে গঠিত প্রাকৃতিক পরিবেশ, যথা— পৃথিবীর তরল অংশ যা বারিমণ্ডল নামে (hydrosphere) এবং

(iii) গ্যাসীয় উপাদানে গঠিত প্রাকৃতিক পরিবেশ, যথা— পৃথিবীর গ্যাসীয় অংশ যা বায়ুমণ্ডল নামে (atmosphere) পরিচিত।

**(i) শিলামণ্ডল (Lithosphere) ঃ** কঠিন শিলা দ্বারা গঠিত পৃথিবীর বহিরাবরণকে শিলামণ্ডল বলে। বিভিন্ন ধরনের শক্ত শিলা দিয়ে ভূত্বক বা শিলামণ্ডল গঠিত। শিলামণ্ডলের গভীরতা সর্বত্র সমান নয়। সমুদ্রের তলদেশে এর গভীরতা মাত্র ৫ কিমি। কিন্তু মহাদেশের অংশে এর গভীরতা প্রায় ৩৫ কিমি। শিলামণ্ডলের সবচেয়ে ওপরের অংশটি সিলিকা (Si) ও অ্যালুমিনিয়াম (Al) দ্বারা গঠিত হওয়ায় একে সিয়াল (SIAL) স্তর বলে। মহাদেশগুলি সিয়াল স্তর দ্বারা গঠিত। এই স্তরে গ্রানাইট জাতীয় শিলা দেখা যায়। অন্যদিকে মহাসাগরগুলি শিলা স্তর দ্বারা গঠিত। এই স্তরে ব্যাসল্ট জাতীয় শিলা দেখা যায়। মহাদেশের শিলার ঘনত্ব ও ওজন মহাসাগরের শিলার থেকে কম বলে মহাসাগরগুলির ওপর মহাদেশগুলি ভাসমান অবস্থায় বিরাজ করছে।

**শিলা, মৃত্তিকা ও খনিজ ঃ** শিলামণ্ডলের ভূত্বকীয় অংশে উপাদান রূপে রয়েছে বিভিন্ন প্রকার খনিজ, শিলা, মৃত্তিকা, ক্ষয়জাত ও সঞ্চয়জাত ভূমিরূপ। পাহাড় পর্বতের ন্যায় বৃহদায়তন ভূমিরূপ, উদ্ভিদ ও প্রাণীর বাসস্থানরূপে বিভিন্ন ধরনের ছোট বড় বৈচিত্র্যপূর্ণ ভূমিরূপ প্রভৃতি। সব ধরনেরই প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া এই শিলামণ্ডলের উপর ক্রিয়াশীল হলেও প্রধানতঃ শিলামণ্ডলীয় উপাদানের পরিবর্তন সংগঠিত হয় দুটি মূল শক্তির দ্বারা। যথা—

(ক) অভ্যন্তরীণ শক্তি, যার ফলে সৃষ্টি হয় ভাঁজ, চ্যুতি, ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরি এবং (খ) বহির্শক্তি, যার ফলে ভূত্বকের উপরিভাগে আবহবিকার, পুঞ্জিতস্খলন, নদ-নদী, বায়ুপ্রবাহ হিমবাহ, সমুদ্র তরঙ্গ দ্বারা ভূত্বকের ধীর পরিবর্তন ঘটে থাকে।

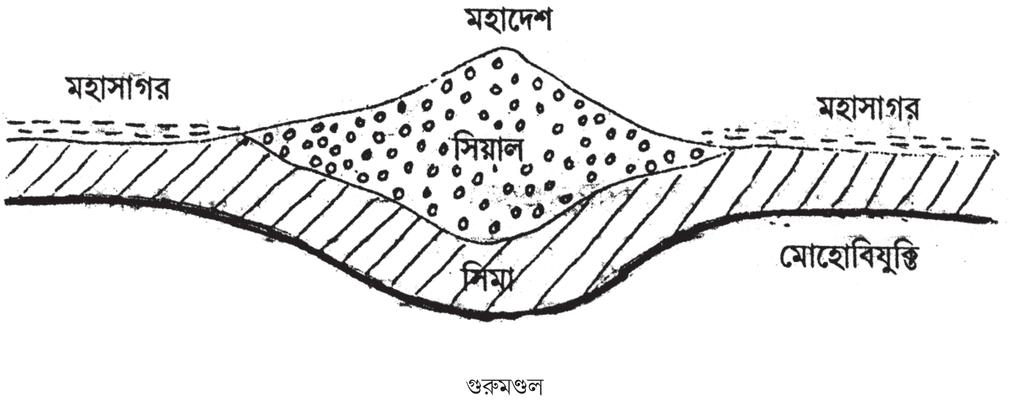


গুরুমণ্ডল

চিত্র : শিলামণ্ডল

শিলামণ্ডল আগ্নেয়, পাললিক ও রূপান্তরিত শিলা দ্বারা গঠিত। এই শিলা আবহবিকারের ফলে ও মাটি সৃষ্টির বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় একসময় মাটিতে পরিণত হয়। অর্থাৎ, ভূত্বকের ওপর শিথিল জৈব রাসায়নিক আবরণকে মাটি বলা হয়— যা পরিবেশের সজীব ও নির্জীব উপাদানগুলির মধ্যে সংযোগ রক্ষা করে চলে। রাশিয়ান বৈজ্ঞানী ভকুচেভের মতে মৃত্তিকা হল একটি গতিশীল মাধ্যম। কারণ মৃত্তিকার মধ্যে অবস্থিত উপাদানগুলির পরিবর্তনশীলতা মৃত্তিকার স্বাভাবিক ধর্মেরও পরিবর্তন ঘটায়।

ভূত্বক গঠনকারী মৌলিক পদার্থগুলির মধ্যে অক্সিজেন, সিলিকন, অ্যালুমিনিয়াম, লৌহ, ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম, পটাসিয়াম ও ম্যাগনেশিয়াম প্রধান। এই আটটি মৌলিক পদার্থ দিয়ে ভূত্বকের ৯৮ শতাংশ গঠিত। শিলামণ্ডল আগ্নেয়, পাললিক ও রূপান্তরিত শিলা দ্বারা গঠিত। আর শিলা তো খনিজ দিয়েই তৈরি। শিলাগঠনকারী প্রধান খনিজ দশটি— কোয়াটম, ফেলস্ফার, অভ্র, কর্দম খনিজ, ক্লোরাইড, হর্নব্লেন্ড, অগাইট, অলিভিন, ক্যালসাইট, ডলোমাইট ও লৌহ আকরিক।

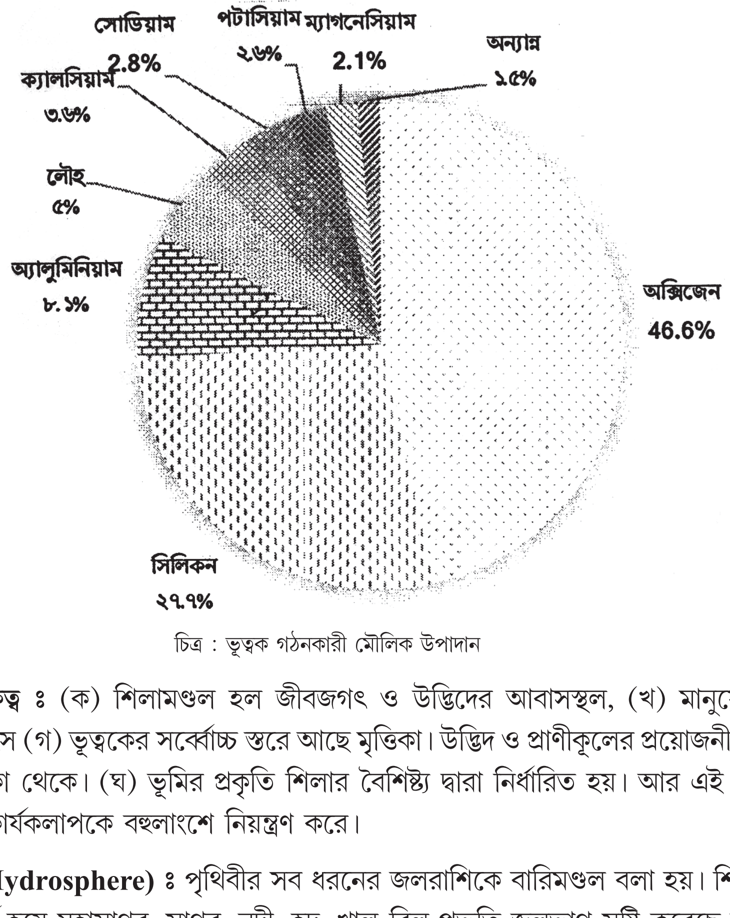


চিত্র : ভূত্বক গঠনকারী মৌলিক উপাদান

**শিলামণ্ডলের গুরুত্ব ঃ** (ক) শিলামণ্ডল হল জীবজগৎ ও উদ্ভিদের আবাসস্থল, (খ) মানুষের প্রয়োজনীয় সম্পদের আধার ও উৎস (গ) ভূত্বকের সর্ব্বোচ্চ স্তরে আছে মৃত্তিকা। উদ্ভিদ ও প্রাণীকূলের প্রয়োজনীয় সব উপকরণ পাওয়া যায় এই মৃত্তিকা থেকে। (ঘ) ভূমির প্রকৃতি শিলার বৈশিষ্ট্য দ্বারা নির্ধারিত হয়। আর এই ভূমির প্রকৃতিই মানুষের অর্থনৈতিক কার্যকলাপকে বহুলাংশে নিয়ন্ত্রণ করে।

**(ii) বারিমণ্ডল (Hydrosphere) ঃ** পৃথিবীর সব ধরনের জলরাশিকে বারিমণ্ডল বলা হয়। শিলামণ্ডলের যে সব নীচু অংশ জলপূর্ণ হয়ে মহাসাগর, সাগর, নদী, হ্রদ, খাল-বিল প্রভৃতি জলভাগ সৃষ্টি করেছে তাকে একসঙ্গে বারিমণ্ডল বলা হয় ভূপৃষ্ঠের মোট আয়তনের প্রায় ৭১.৪ ভাগ জুড়ে রয়েছে বারিমণ্ডল। সারা পৃথিবী জুড়ে বারিমণ্ডল কোনো-না-কোনো রূপে বিদ্যমান রয়েছেই। 'বারি'-র তিনটি রূপ— জল, বরফ ও জলীয় বাষ্প। 'জল-রূপে বিদ্যমানতাই বেশি'। জল হল একটি বর্ণহীন, গন্ধহীন স্বাদহীন প্রশম তরল পদার্থ (pH-7)।

পৃথিবীতে বারিমণ্ডলের বণ্টন

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (ক) | বিশ্ব সমুদ্র (World Ocean) | — | 97.200 | শতাংশ |
| (খ) | ভৌমজলরাশি রূপে | — | 00.625 | শতাংশ |
| (গ) | নদী, হ্রদ ইত্যাদি রূপে | — | 00.024 | শতাংশ |
| (ঘ) | বরফরূপে | — | 02.150 | শতাংশ |
| (ঙ) | জলীয় বাষ্পরূপে (বায়ুমণ্ডলে) | — | 00.001 | শতাংশ |
| | মোট | — | 100.000 | শতাংশ |

জল বায়ুমণ্ডল থেকে পৃথিবীপৃষ্ঠে এবং পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে পুণরায় বায়ুমণ্ডল আবর্তিত হয়। জলের এই বিরামহীন চক্রাকার আবর্তনকে জলচক্র (Hydrological cycle) বলে। জলচক্র সম্পাদিত হয় তিনটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। যথা— বাষ্পীভবন, ঘনীভবন ও অধঃক্ষেপন। এই তিনটি প্রক্রিয়ার যে কোন একটি বিঘ্নিত হলে জলচক্র ভারসাম্য হারায়। সূর্ততাপে জলভাগ উত্তপ্ত হলে জলে বাষ্পে পরিণত হয়। ঐ বাষ্প বায়ু দ্বারা জলভাগ ও স্থলভাগের দিকে পরিবাহিত হয়। অনুকূল পরিবেশে জলীয়বাষ্প ঘনীভূত হয়ে বৃষ্টি বা তুষারের আকারে স্থলভাগ ও জলভাগের উপর পতিত হয়। ভূপৃষ্ঠে পৌঁছানোর পূর্বেই জলের কিছু অংশ বাষ্পের আকারে বায়ুমণ্ডলে ফিরে যায়।

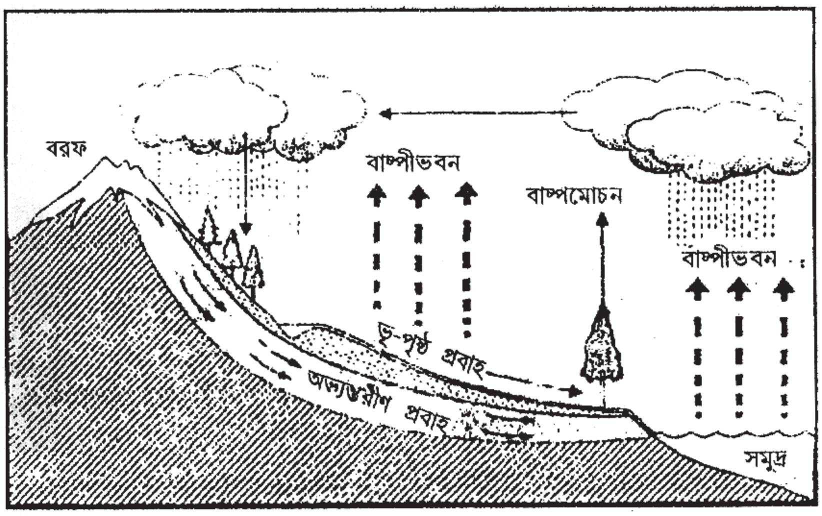


জলচক্র

বৃষ্টিপাতের এক অংশ মৃত্তিকা শোষণ করে ভৌমজলস্তর গড়ে তোলে আর কিছু অংশ অভ্যন্তরীণ প্রবাহরূপে সমুদ্রে স্থানান্তরিত হয়। পুনরায় ঐ জল বাষ্পীভূত হয়ে বায়ুমণ্ডলে ফিরে যায়। এই ভাবেই প্রকৃতিতে জল চক্রাকারে আবর্তিত হয়।

**জলের গুরুত্ব ঃ** বারিমণ্ডল প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত। বারিমণ্ডল বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদের রসায়নাগার, মানবজাতির কাছে বারিমণ্ডলের গুরুত্ব অপরিসীম। বারিমণ্ডলের গুরুত্ব নীচে আলোচনা করা হল।

(ক) জীবদেহ গঠনে জল অপরিহার্য। জীবদেহ গঠনকারী উপাদানগুলির মধ্যে জলের পরিমাণই ৭০ শতাংশ। (খ) জীবমণ্ডলে জলের সমতা রক্ষা হয় জলচক্রের মাধ্যমে যা বারিমণ্ডলের উপস্থিতির উপর নির্ভরশীল। (গ) বারিমণ্ডল জীবের প্রোটিন জাতীয় খাদ্যের ভাণ্ডার। বিভিন্ন ধরনের সামুদ্রিক মাছ, চিংড়ি, ক্রিল, ফার্ণ ইত্যাদি যথেষ্ট পরিমাণে সমুদ্রে জন্মায়। (ঘ) বারিমণ্ডল বিভিন্ন খনিজ দ্রব্য ও জ্বালানি দ্রব্যের ভাণ্ডার। (ঙ) চিরাচরিত ও অচিরাচরিত বিদ্যুৎ শক্তির উৎসও বারিমণ্ডল। (চ) জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ ও বায়ুদূষণ প্রতিরোধ করে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বারিমণ্ডলের ভূমিকা অবর্ণনীয়। (ছ) জলপথে সুলভে পণ্যদ্রব্য পরিবহণ করা যায় বলে হ্রদ, নদী, সাগর, মহাসাগরগুলিতে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক জলপরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। (জ) বারিমণ্ডল মানুষের কর্মবংস্থানের একটি প্রধান কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠেছে। নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলে বহুলোক সমুদ্র থেকে মৎস্য আহরণ করে জীবিকা নির্বাহ করে।

**(iii) বায়ুমণ্ডল (Atmosphere) ঃ** বায়ুমণ্ডল পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবেশের একটি অন্যতম প্রধান উপাদান ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১০,০০০ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত যে গ্যাসীয় আবরণ পৃথিবীকে ঘিরে রয়েছে তাকে বয়ুমণ্ডল বলে।

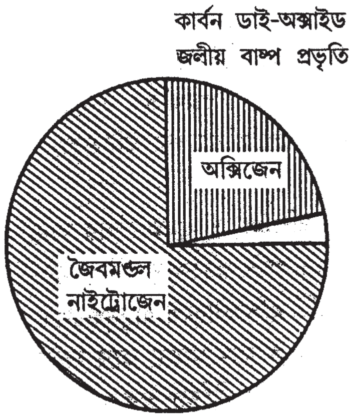

বায়ুর গ্যাসীয় উপাদান

**বায়ুমণ্ডলের উপাদান ঃ** বায়ুমণ্ডল প্রধানতঃ তিনটি উপাদানে গঠিত, যথা—

(ক) গ্যাসীয় উপাদান

(খ) জলীয় বাষ্প এবং

(গ) জৈব ও অজৈব উপাদান।

(ক) **গ্যাসীয় উপাদান ঃ** বায়ু হল বিভিন্ন গ্যাসের সংমিশ্রণ। বিশুদ্ধ বায়ুর প্রধান উপাদানগুলি হল নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং বিভিন্ন নিষ্ক্রিয় গ্যাস, যেমন আর্গন, হিলিয়াম, জেনন, ক্রিপ্টন প্রভৃতি। নিচের সারণিতে বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন উপাদানগুলির পরিমাণ দেওয়া হল।

| | উপাদান | প্রতীক | পরিমাণ (% শুষ্ক বায়ুতে) |
|---|---|---|---|
| 1. | নাইট্রোজেন | $N_2$ | 78.080 |
| 2. | অক্সিজেন | $O_2$ | 20.940 |
| 3. | আর্গন | Ar | 0.930 |
| 4. | কার্বন ডাই-অক্সাইড | $CO_2$ | 0.030 |
| 5. | নিয়ন, হিলিয়াম, ক্রিপ্টন, জেনন | Ne, He, Kr, Xe | 0.003 |
| 6. | জলীয় বাষ্প | | |

**(খ) জলীয় বাষ্প ঃ** বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন গ্যাসীয় উপাদানের পরেই জলীয় বাষ্পের স্থান। ইহা বায়ুমণ্ডলের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, উষ্ণতার প্রভাবে ভূপৃষ্ঠের জল বাষ্পীভূত হয়ে বায়ুমণ্ডলে অবস্থান করে। বায়ুমণ্ডলে

জলীয় বাম্পের উপস্থিতির জন্যই ঘনীভবন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মেঘ, বৃষ্টি, কুয়াশা, তুহিন ও তুষার সৃষ্টি হয়। উর্দ্ধাকাশে জলীয় বাম্পের ঘনীভবনে সৃষ্ট লীনতাপ আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটায়। জলীয় বাম্প উষ্ণতাকে নিয়ন্ত্রণ করে।

**(গ) ধূলিকণা ঃ** বায়ুমণ্ডলের অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো ধূলিকণা, মরু অঞ্চল ও সমুদ্রতীরের অতি সূক্ষ্ম ধুলো-বালি, অতিক্ষুদ্র খনিজ লবণ, বিভিন্ন কলকারখানার পোড়া কয়লার ছাই, আগ্নেয়গিরি হতে উৎক্ষিপ্ত ছাই, ভস্ম প্রভৃতি ধূলিকণারূপে বায়ুমণ্ডলে ভেসে বেড়ায়। এদের একত্রে অ্যারোসল (Aerosol) বলে। বায়ুমণ্ডলে ভাসমান বিভিন্ন ধূলিকণাকে আশ্রয় করে জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয় ও মেঘ-বৃষ্টিতে পরিণত হয়।

**বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তর ঃ** বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরকে সাধারণতঃ দু-ভাগে ভাগ করা যায়। যথা— (ক) রাসায়নিক গঠন অনুসারে, (খ) উষ্ণতা অনুসারে স্তরবিন্যাস।

U.S.A.-এর জাতীয় বিমান ও মহাকাশ সংস্থা (নাসা)র সমীক্ষা অনুযায়ী রাসায়নিক গঠন অনুসারে বায়ুমণ্ডল প্রধানতঃ দুটি স্তরে বিভক্ত—

(১) হোমোস্ফিয়ার বা সমমণ্ডল এবং

(২) হেটেরোস্ফিয়ার বা বিষমমণ্ডল।

**(১) হোমোস্ফিয়ার বা সমমণ্ডল ঃ** ভূপৃষ্ঠ হতে ওপরের দিকে ৯০ কিমি পর্যন্ত অঞ্চলে বায়ুমণ্ডলের রাসায়নিক গঠন এবং বিভিন্ন গ্যাসের অনুপাত প্রায় একই রকম থাকে, তাই এই স্তরকে বলা হয় হোমোস্ফিয়ার বা সমমমণ্ডল।

**(২) হেটোরোস্ফিয়ার বা বিষমণ্ডল ঃ** হোমোস্ফিয়ার স্তরের ওপরে বায়ুমণ্ডলের উর্ধ্বসীমা অর্থাৎ ১০,০০০ কিমি পর্যন্ত অঞ্চলে বিভিন্ন গ্যাসের অনুপাত এবং বিভিন্ন গ্যাসের স্তরগুলি একই রকম থাকে না, তাই এই স্তরকে হেটেরোস্ফিয়ার বা বিষমমণ্ডল বলে। রাসায়নিক গঠন অনুসারে এই স্তরকে চারটি উপবিভাগে ভাগ করা যায়। যথা—

(a) **হাইড্রোজেন স্তর** — বায়ুমণ্ডলের উর্ধ্বসীমা ১০,০০০ কিমি থেকে নীচে ৩,৫০০ কিমি পর্যন্ত অঞ্চল প্রধানতঃ হাইড্রোজেন পরমাণু স্তর দ্বারা গঠিত।

(b) **হিলিয়াম স্তর** — হাইড্রোজেন স্তরের নিচে ৩,৫০০ কিমি থেকে ১০০ কিমি পর্যন্ত অঞ্চল প্রধানতঃ হিলিয়াম গ্যাস দ্বারা গঠিত।

(c) **পারমাণবিক অক্সিজেন স্তর** — হিলিয়াম স্তরের নিচে ১,০০০ কিমি থেকে ২০০ কিমি পর্যন্ত অঞ্চল প্রধানতঃ অক্সিজেন দ্বারা গঠিত।

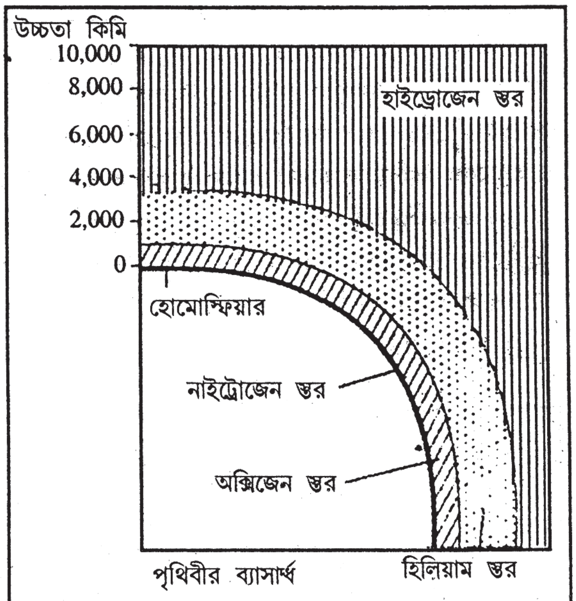


উপাদানের তারতম্যভেদে বায়ুমণ্ডলের স্তরবিন্যাস

(d) **আণবিক নাইট্রোজেন স্তর** — পারমাণবিক অক্সিজেন স্তরের ঠিক নিচে ২০০ কিমি থেকে হোমোস্ফিয়ারের সীমানা ৯০ কিমি পর্যন্ত অঞ্চল প্রধানতঃ নাইট্রোজেন দ্বারা গঠিত।

**(খ) উষ্ণতা অনুসারে স্তরবিন্যাস ঃ** বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরে উষ্ণতার তারতম্য দেখা যায়। ভূপৃষ্ঠ থেকে যতই ওপরের দিকে যাওয়া যায়, ততই বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা ক্রমশঃ হ্রাস পেতে থাকে। উষ্ণতা অনুসারে বায়ুমণ্ডলকে ট্রপোস্ফিয়ার, স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার, মেসোস্ফিয়ার, থার্মোস্ফিয়ার বা আয়নোস্ফিয়ার, এক্সোস্ফিয়ার ও ম্যাগনেটোস্ফিয়ার, — এই ছয়টি ভাগে ভাগ করা যায়।

(a) **ট্রপোস্ফিয়ার বা ক্ষুব্ধমণ্ডল ঃ** এই স্তরটি বায়ুমণ্ডলের সবথেকে নিচের স্তর। ভূপৃষ্ঠ থেকে ১৮ কিমি পর্যন্ত ওপরের বায়ুস্তরকে ট্রপোস্ফিয়ার বলে। তবে নিরক্ষীয় অঞ্চলে ১৮ কিমি হলেও মেরু অঞ্চলে ইহা ৮৯ কিমি পর্যন্ত বিস্তৃত। বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন গ্যাসীয় উপাদানের প্রায় ৭৬% এবং সমস্ত প্রকার জলীয় বাষ্প ও ধূলিকণা এই স্তরেই দেখতে পাওয়া যায়। মেঘ, বৃষ্টি, বজ্রপাত, ঝড়, শিশির, কুয়াশা সহ সমস্ত প্রকার প্রাকৃতিক দুর্যোগ এই স্তরেই দেখা যায় বলে একে ক্ষুব্ধমণ্ডল বলে। এই স্তরে ভূপৃষ্ঠ থেকে ওপরের দিকে উচ্চতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা হ্রাস পায়। এই তাপমাত্রা হ্রাসের হার সাধারণভাবে প্রতি ১০০ মিটার উচ্চতায় ০.১° সেন্টিগ্রেড বা প্রতি ১০০০ মিটার (১ কিমি) উচ্চতায় ৬.৫° সেন্টিগ্রেড। ট্রপোস্ফিয়ার ও স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার এর মধ্যবর্তী অঞ্চল ট্রপোজ নামে পরিচিত।

(b) **স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার বা শান্তমণ্ডল ঃ** ট্রপোপজের ওপরে ৫০ কিমি পর্যন্ত বায়ুস্তরটি স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার নামে পরিচিত। এই বায়ুস্তরে অতি সূক্ষ্ম ধূলিকণা ছাড়া কোনরকম জলীয় বাষ্প থাকে না, ফলে আবহাওয়া শান্ত থাকে। এইজন্য এই স্তরকে শান্তমণ্ডল বলে। বায়ু প্রবাহিত হয় না বলে এই স্তরের মধ্য দিয়ে সাধারণতঃ জেট বিমানগুলি চলাচল করে। বায়ুপ্রবাহ থাকে না বলে জেটবিমানের ইঞ্জিন নির্গত ধোঁয়া পুঞ্জাকারে সাদা দাগের আকারে দেখা যায়। এই স্তরে উচ্চতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বাড়তে থাকে। এই স্তরে ওজোন গ্যাসের স্তর বেশি পরিমাণে দেখা যায়। স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার ও মেসোস্ফিয়ারের মধ্যবর্তী অঞ্চলকে স্ট্র্যাটোপজ বলে।

(c) **মেসোস্ফিয়ার ঃ** স্ট্র্যাটোপজের ওপর ৮০ কিমি পর্যন্ত বিস্তৃত বায়ুমণ্ডলকে মেসোস্ফিয়ার বলে। এই স্তরেও ট্রপোস্ফিয়ারের মতো উচ্চতা বাড়ার সঙ্গে উষ্ণতা হ্রাস পায়। মহাকাশ থেকে যেসব উল্কা পৃথিবীর দিকে ছুটে আসে সেগুলির অধিকাংশ এই স্তরের মধ্যে এসে পুড়ে যায়। মেসোস্ফিয়ারের ওপরে তাপমাত্রা হ্রাস পাওয়া থেমে যায়। এই স্তরকে মেসোপজ বলে।

(d) **থার্মোস্ফিয়ার বা আয়নোস্ফিয়ার ঃ** মেসোপজের ওপরে প্রায় ৫০০ কিমি পর্যন্ত বিস্তৃত বায়ুস্তরকে থার্মোস্ফিয়ার বলা হয়। এই অংশে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা অত্যন্ত দ্রুত হারে বাড়তে থাকে। এই অংশে বায়ুস্তর অত্যন্ত হাল্কা। তীব্র সৌরবিকিরণে রঞ্জনরশ্মি ও অতি বেগুনি রশ্মির সংঘাতে এই অংশের বায়ু আয়নযুক্ত হয়। তাই এই স্তরকে আয়নোস্ফিয়ার বলে। ভূপৃষ্ঠ থেকে পাঠানো বেতার তরঙ্গ আয়নোস্ফিয়ারের বিভিন্ন আয়নে বাধা পেয়ে পুনরায় ভূপৃষ্ঠে ফিরে আসে। ফলে পৃথিবীতে বেতার সংযোগ রক্ষা করা সম্ভব হয়। এই স্তরে বিভিন্ন তড়িতাহত অণুর চৌম্বক বিক্ষেপের ফলে অণুগুলি প্রোটন ও ইলেকট্রনের সংস্পর্শে উত্তেজিত হয়ে পড়ে এবং সুমেরু ও কুমেরু অঞ্চলে একপ্রকার উজ্জ্বল আলোক বিচ্ছুরণ দেখা যায়, একে মেরুজ্যোতি বলে। সুমেরু অঞ্চলের মেরুজ্যোতিকে সুমেরুপ্রভা বা আরোরা বোরিয়ালিস এবং কুমেরু অঞ্চলের মেরুজ্যোতিকে কুমেরুপ্রভা বা আরোরা অস্ট্রালিস বলে।

(e) **এক্সোস্ফিয়ার ঃ** থার্মোস্ফিয়ারের ওপরে প্রায় ৭৫০ কিমি পর্যন্ত যে বায়ুস্তর আছে তাকে এক্সোস্ফিয়ার বলে। এই স্তরেও উচ্চতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়। এই স্তরে হিলিয়াম ও হাইড্রোজেন গ্যাসেরর প্রাধান্য দেখা যায়।

(f) **ম্যাগনেটোস্ফিয়ার ঃ** এক্সোস্ফিয়ারের ওপরে বায়ুমণ্ডলের শেষ সীমা পর্যন্ত বায়ুস্তরকে ম্যাগনেটোস্ফিয়ার বলে। এই স্তরে

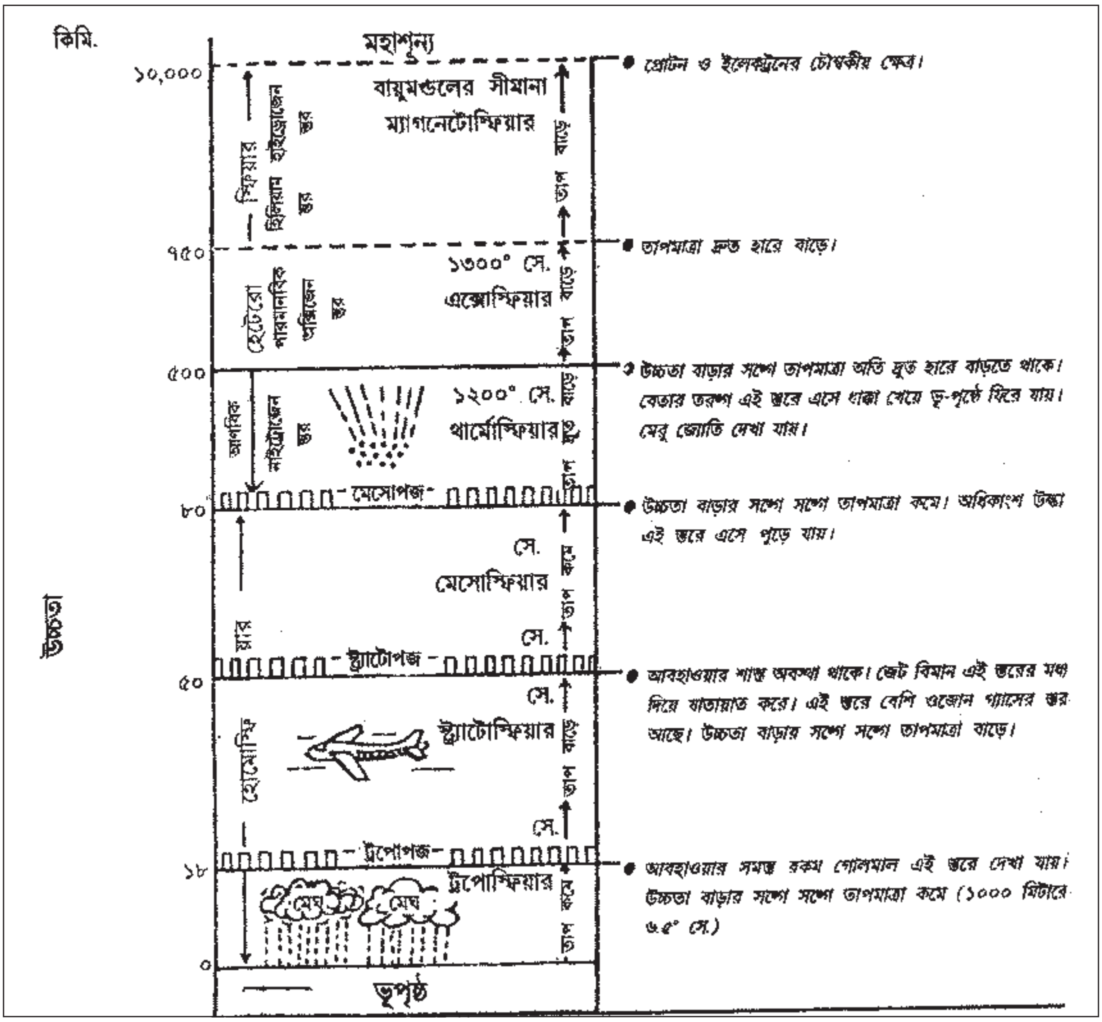


বায়ুমণ্ডলকে বেষ্টন করে একটি প্রোটন ও ইলেকট্রনের চৌম্বকীয় ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়। এই স্তর সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না।

**বায়ুমণ্ডলের গুরুত্ব ঃ** পৃথিবীতে বায়ুমণ্ডলের গুরুত্ব অপরিসীম। বায়ুমণ্ডলের জন্যই পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। জল, বাতাস প্রভৃতির উৎস হল বায়ুমণ্ডল। প্রাণীজগৎকে অক্সিজেন ও উদ্ভিদজগৎকে কার্বন—

ডাই-অক্সাইড সরবরাহ করে বায়ুমণ্ডল। বায়ুমণ্ডল পৃথিবীতে তাপমাত্রার ভারসাম্য রক্ষা করে। ধূলিকণা বায়ুমণ্ডলের তাপ শোষণে, জলীয় বাষ্পের ঘনীভবনে সাহায্য করে। জলীয় বাষ্পে মেঘ, বৃষ্টি, তুষারপাত ও কুয়াশার সৃষ্টি করে।

(iv) **জৈবমণ্ডল (Biosphere) ঃ** ভূ-পৃষ্ঠে অবস্থানকারী সকল সজীব উপাদান জৈবমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত। যে কোন সজীব উপাদান, তা আণুবীক্ষনিক জীবই হোক বা সালোক সংশ্লেষকারী সবুজ উদ্ভিদ বা জীবশ্রেষ্ঠ মানুষ যাই হোক না কেন, কেউই পরিবেশের মধ্যে একাকী বেঁচে থাকতে পারে না। সকলেই কোন না কোন ভাবে একে অপরের উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল হতে হয়। বিস্তারিত ভাবে বলা যায়, সবুজ উদ্ভিদ সূর্যালোকের উপস্থিতিতে মাটি থেকে জল ও খনিজ উপাদান সংগ্রহ করে অক্সিজেন এবং শর্করা জাতীয় খাদ্য তৈরি করে যা প্রাণীকুল খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে এবং উৎপন্ন অক্সিজেন শ্বসনে কাজে লাগায়, পরিবর্তে কার্বন-ডাই-অক্সাইড যোগান দেয় যা উদ্ভিদকুল সালোকসংশ্লেষের কাজে লাগায়। আবার অণুজীবরা মৃত উদ্ভিদের ও প্রাণীর দেহাবশেষ খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে এবং তা ভেঙ্গে প্রয়োজনীয় নানান উপাদানকে (যেমন— নাইট্রোজেন, পটাশিয়াম, ফসফরাস, ক্যালসিয়াম জাতীয় মৌল) মাটির মধ্যে ফিরিয়ে দেয় যা উদ্ভিদের বৃদ্ধিতে কাজে লাগে।

## ১.১০ পরিবেশ শিক্ষা (Environmmental Education)

মানুষ প্রকৃতির শ্রেষ্ঠজীব যে নিজের চাহিদা অনুযায়ী পরিবেশের উপাদানগুলিকে যথাসাধ্য ভাবে ব্যবহার করে চলেছে এবং পরিবেশকে নষ্ট করে চলেছে। এই পরিবেশ সচেতনতা আমাদের দায়িত্ব বা কর্তব্য। এই কারণেই 'পরিবেশ' ও 'শিক্ষা' এই দুটি শব্দের সমন্বয় ঘটে হয়েছে 'পরিবেশ শিক্ষা' (Environmental Education)। সাধারণ ভাবে বলা হয় ১৯৪৮ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত আন্তঃরাষ্ট্রীয় প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ সংস্থার (INCW–International Union for Conservation of Water) সম্মেলনে প্রথম এই পরিবেশ শিক্ষার কথা ব্যবহার করা হয়।

পরিবেশ শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্যগুলি হল—

(১) জনসাধারণের মধ্যে পরিবেশ সম্পর্কিত সমস্যা এবং সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

(২) পরিবেশ সম্বন্ধে নানা অভিজ্ঞতা অর্জন করা এবং পরিবেশকে ও তার সম্বন্ধিত নানা সমস্যা ভালো করে বোঝা।

(৩) জনগণের মধ্যে একটি পরিবেশ সহানুভূতির দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করা।

(৪) পরিবেশের সমস্যা খুঁজে বের করা এবং তার প্রতিকার খুঁজে বের করা।

(৫) জনসাধারণকে পরিবেশ সম্পর্কিত নানান ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণ করানো।

## ১.১১ অনুশীলনী

**সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করুন :**

(১) তাপমাত্রা, আলো, বাতাস, মাটি ইত্যাদি—

(i) জৈব উপাদান (ii) অজৈব উপাদান (iii) জীবের অপ্রয়োজীন (iv) পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য উপাদান নয়।

(২) ভূত্বকে সবথেকে বেশি কোন মৌল পাওয়া যায়?

(i) সিলিকন (ii) অ্যালুমিনিয়াম (iii) অক্সিজেন (iv) লৌহ

(৩) ভূপৃষ্ঠে জলের পরিমাণ —%

(i) ৩০ (ii) ৭১ (iii) ৭৫ (iv) ৯০

(৪) বায়ু মণ্ডলে নাইট্রোজেনের পরিমাণ—

(i) ৭০.২৮% (ii) ৮০% (iii) ৭৮.০৮% (iv) ৭৭.০৮%

(৫) প্রতি ১০০০ মিটার উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে সাথে তাপমাত্রা হ্রাস পায়—

(i) ৬°C (ii) ৬.৪°C (iii) ৬.৫°C (iv) ১°C

(৬) সাধারণত জেট বিমানগুলি চলাচল করে—

(i) ট্রপোপজ (ii) ট্রপোস্ফিয়ার (iii) স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার (iv) মেসোপজ

(৭) স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার ও মেসোস্ফিয়ারের মধ্যবর্তী অঞ্চলকে বলে—

(i) ট্রপোপজ (ii) ট্রপোস্ফিয়ার (iii) স্ট্র্যাটোপজ (iv) মেসোপজ

(৮) আরোরা বোরিয়ালিস কোথায় দেখতে পাওয়া যায়—

(i) কুমেরু (ii) সুমেরু (iii) দুটিতেই (iv) কোনটি না

(৯) বায়ুমণ্ডলে সবথেকে বেশি পরিমাণ গ্যাসীয় উপাদান কোন স্তরে অবস্থিত—

(i) ট্রপোপজ (ii) ট্রপোস্ফিয়ার (iii) স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার (iv) থারমোস্ফিয়ার

(১০) কোন স্তরে বায়ু আয়ন যুক্ত—

(i) ট্রপোপজ (ii) ট্রপোস্ফিয়ার (iii) স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার (iv) থারমোস্ফিয়ার

**অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্ন :**

(১) পরিবেশ বলতে কি বোঝেন?

(২) জৈব উপাদান কাকে বলে? উদাহরণ দিন।

(৩) সিয়াল কাকে বলে?

(৪) ক্ষুব্ধ মণ্ডল কাকে বলে?

(৫) ওজন গ্যাস কোন স্তরে সবথেকে বেশি পাওয়া যায়?

**সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্ন :**

(১) পরিবেশ বিদ্যার গুরুত্ব বর্ণনা করুন।

(২) পরিবেশের উপাদানগুলি কি কি?

(৩) জলের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করুন।

(৪) জীব মণ্ডল কাকে বলে?

(৫) পরিবেশ শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য-গুলি লিখুন।

(৬) উষ্ণতার উপর ভিত্তি করে বায়ুমণ্ডলকে কয়টি স্তরে ভাগ করা হয়েছে ও কি কি?

**উত্তর সংকেত**

**নির্বাচন ভিত্তিক প্রশ্ন :**

(১) (ii) অজৈব উপাদান (২) (iii) অক্সিজেন (৩) (ii) ৭১% (৪) (iii) ৭৮.০৮%

(৫) (iii) ৬.৫$^{0}$C (৬) (iii) স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার (৭) (iii) স্ট্র্যাটোপজ

(৮) (ii) সুমেরু (৯) (ii) ট্রফোস্ফিয়ার (১০) (iv) থার্মোস্ফিয়ার

# একক ২ ❑ প্রাকৃতিক সম্পদ : নবীকরণযোগ্য এবং অনবীকরণযোগ্য (Natural Resource : Renewable and Non renewable)

গঠন

২.০ উদ্দেশ্য

২.১ প্রস্তাবনা

২.২ প্রকারভেদ (Types of resource)

২.৩ বনসম্পদ (Forest Resource)

২.৩.১ ভারতের অবস্থান

২.৩২. বনভূমির উপকারিতা (Importance of Forest)

২.৩.৩ অরণ্য নিধন ও জনজাতির উপর তার প্রভাব (Deforestation and effects of deforestation on Tribal people)

২.৩.৪ যৌথ বন পরিচালন ব্যবস্থা (Joint Forest Management)

২.৪ খনিজসম্পদ (Mineral Resources)

২.৪.১ খনন পদ্ধতি

২.৪.২ ভারতের খনিজ সম্পদ (Minaral resources in India)

২.৪.৩ পরিবেশ ও সমাজের উপর খনন কার্যের প্রভাব (Environmental and social impacts of mining)

২.৫ ভূমিসম্পদ (Land Resources)

২.৫১ ভূমি ও ভূমি সম্পদের গুরুত্ব (Importance of Land and Land Resources)

২.৫.২ ভূমির অবক্ষয় ও ভূমি দূষণ (Land Degradation and Land Pollution)

২.৫.৩ ভূমি অবক্ষয়ের কারণ

২.৫.৪ ভূমি ধ্বস (Landslide)

২.৫.৫ মৃত্তিকা ক্ষয় (Land erosion)

২.৬ জলসম্পদ (Water Resource)

**২.৬.১ ভূপৃষ্ঠের জলের বন্টন (Distribution of water on Earth)**

**২.৬.২ ভূপৃষ্ঠের ও ভূগর্ভের জলের ব্যবহার ও অপব্যবহার (Use and over-utilization of surface and groundwater)**

**২.৬.৩ জলের অপব্যবহার**

**২.৬.৪ জল সংকট নিবারণ (Minimise water crisis)**

**২.৬.৫ ভারতের জল সম্পদের ব্যবস্থাপনা (Water resource management in India)**

**২.৭ ধারণযোগ্য উন্নয়নের ধারণা (Concept of Sustainable development)**

**২.৭.১ নীতি নির্দেশিকা (Guidelines)**

**২.৮ অনুশীলনী**

## ২.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানতে পারবেন।

- সম্পদ কাকে বলে, ইহা কয়প্রকার ও কি কি।
- ভারতের বিভিন্ন অংশে বনজ সম্পদের অবস্থান ও উপযোগীতা।
- অরণ্য নিধনের কারণ ও ফলাফল।
- খনিজ সম্পদের সংজ্ঞা।
- কি কি পদ্ধতিতে খনন কার্য সম্পন্ন হয়।
- ভূমি ও ভূমি সম্পদের গুরুত্ব, ভূমি দূষণ, ভূমি ধ্বস ও ভূমি অবক্ষয়ের প্রাকৃতিক ও মনুষ্যদৃষ্ট কারণ।
- মৃত্তিকা ক্ষয়ের মনুষ্যসৃষ্ট ও প্রাকৃতিক কারণ এবং তা নিবারণের উপায়।
- জল সম্পদের প্রয়োজনীয়তা ও স্থলভাগের জলবন্টন।
- ভূগর্ভস্থ জলের ব্যবহার, অপব্যবহার ও জলসংকট নিবারণের উপায়গুলি।

## ২.১ প্রস্তাবনা

যে সমস্ত উপকরণ যা রূপান্তরিত বা এমনভাবে পরিবর্তিত হতে পারে যে এটি আরো মূল্যবান এবং দরকারি হয়ে ওঠে বা মানুষের দৈনন্দিন জীবনে যে সমস্ত বস্তু ব্যবহৃত হয় তাকেই সম্পদ (Resource) বলা হয়।

পৃথিবীর কিছু কিছু বস্তু নিজে থেকেই সম্পদ তাদের **প্রাকৃতিক সম্পদ (Natural Resource)** বলা হয়, যেমন— জল, বাতাস, মাটি, খনিজ, জীবকূল ইত্যাদি। মানুষ তার অত্যাধুনিক বিজ্ঞান এবং যন্ত্রপাতি দ্বারা আরো

বেশি ব্যবহার যোগ্য ও আরো বিভিন্ন সম্পদে পরিবর্তন ঘটাচ্ছে যেমন— শক্তি সম্পদ। বর্তমান যুগে স্বাস্থ্যবান, শিক্ষিত, মেধাপূর্ণ ও সর্বপরি শৃঙ্খলাপরায়ণ নাগরিক যে কোন দেশের মূল্যবান সম্পদ অর্থাৎ মানব সম্পদ বলে চিহ্নিত করা হয়। এই অধ্যায়ে বিভিন্ন ধরনের সম্পদের মূলত নবীকরণ যোগ্য ও অনবীকরণ যোগ্য সম্পদের ব্যবহার, অপব্যবহার এবং তাদের সংরক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

## ২.২ প্রকারভেদ (Types of resource)

উৎপত্তি ও ব্যবহারের ভিত্তিতে সম্পদকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে,

(১) **উৎস ভিত্তিক :** সম্পদের উৎসের উপর ভিত্তি করে সম্পদকে ২টি ভাগে ভাগ করা যায়, জৈবিক এবং অজৈবিক সম্পদ।

**জৈবিক সম্পদ :** যে সমস্ত সম্পদ জীবমণ্ডল থেকে পাওয়া যায় তাদের জৈবিক সম্পদ বলা হয়। যেমন— বন এবং বনজ সম্পদ, জলজসম্পদ (মাছ), ফসল ইত্যাদি।

**অজৈব সম্পদ :** যে সমস্ত সম্পদ অজৈব বস্তু দ্বারা নির্মিত তাদের থেকে পাওয়া যায় তাদের অজৈব সম্পদ বলা হয়। যেমন— জল, বাতাস, মৃত্তিকা, খনিজ ইত্যাদি।

(২) **উপযোগিতা ভিত্তিক :** উপস্থিতির উপর ভিত্তি করে সম্পদকে ২টি ভাগে ভাগ করা যায়, যথা— নবীকরণ যোগ্য ও অনবীকরণ যোগ্য সম্পদ।

**নবীকরণ যোগ্য সম্পদ :** যে সমস্ত সম্পদ প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পুনঃপ্রতিস্থাপিত হয় তাদের নবীকরণ যোগ্য সম্পদ (Renewable resource) বলা হয়। উদাহরণ, বনভূমি, ঘাসজমি, ভূগর্ভস্থ স্বাদু জল, পরিসুদ্ধ বাতাস, উর্বর মাটি ইত্যাদি। তবে এই সকল সম্পদের অত্যধিক ব্যবহার বা অপব্যবহারের মাধ্যমে এই নবীকরণ যোগ্য সম্পদ অনবীকরণ যোগ্য সম্পদে পরিবর্তিত হতে পারে।

**অনবীকরণ যোগ্য সম্পদ :** যে সমস্ত সম্পদ খুবই স্বল্প মাত্রায় ভূপৃষ্ঠে পাওয়া যায় বা বলা যেতে পারে পুনঃপ্রতিস্থাপিত হয় না বা খুবই স্বল্প গতিতে পুনঃপ্রতিস্থাপিত হতে পারে তাদের অনবীকরণ যোগ্য সম্পদ (Nonrenewable resource) বলা হয়। উদাহরণ স্বরূপ, খনিজ তেল, কয়লা, প্রাকৃতিক গ্যাস, বিভিন্ন খনিজ পদার্থ যেমন লোহা, তামা, অ্যালুমিনিয়াম, ইউরেনিয়াম, রেডিয়াম ইত্যাদি।

## ২.৩ বনসম্পদ (Forest Resource)

### ২.৩.১ ভারতের অবস্থান

১৯৯৩ সালে ভারতবর্ষের আসল বনভূমির পরিমাণ ছিল শুধুমাত্র ৬৩৯,৩৬৮ sq. km. অর্থাৎ যা হল সমস্ত ভূভাগের মাত্র ১৯.৪৫%। মাথাপিছু বনভূমির পরিমাণ মাত্র ৯০০ sq. m.। এরপর নানা বনসংরক্ষণ এবং বনসৃজন প্রকল্প চালু করা হয় যার ফলে বর্তমানে Indian State of Forest Report (ISFR), MoEFCC (Ministry of Environment Forest and Climate Change) ২০১৭ সালের তথ্য অনুযায়ী ভারতের মোট বনভূমি দাঁড়ায় ৭,০৮,২৭৩ sq. km. যা মোট ভূভাগের ২১.৫৩%। বনভূমি বৃদ্ধির হার নিরিখে ভারতবর্ষ বিশ্বে অষ্টম স্থান

অধিকার করেছে। ভারতবর্ষে মধ্যপ্রদেশে সবথেকে বেশি এলাকা বনভূমি বিস্তার করে আছে প্রায় ৭৭,৪১৪ sq. km. এবং মোট ভূভাগের সর্বোচ্চ বেশি শতাংশ বনভূমির নিরিখে সর্বোচ্চ স্থানের অধিকারী লাক্ষাদ্বীপ (৯০.৩৩%)। পশ্চিমবঙ্গে বনভূমির পরিমাণ ১১,৮৭৯ sq. km. যা মোট ভূভাগের মাত্র ১৩.৬%। প্রধানত দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, ২৪-পরগনা, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার মধ্যেই এই বনভূমি সীমাবদ্ধ।

### ২.৩.২. বনভূমির উপকারিতা (Importance of Forest)

জীবজগতের সৃষ্টির আগে থেকে বনভূমির সৃষ্টি হয়েছে। বনভূমিকে ঘিরেই জীবজগতের সৃষ্টি হয় এবং বাসস্থান হিসাবে বনভূমি শুধু আদিম মানুষই নয় বর্তমান আদিবাসীদেরও বাসস্থান এবং খাদ্য সংস্থানের জায়গা। মানুষের জন্মের থেকে শুরু করে শেষকৃত্য সম্পন্ন করা পর্যন্ত বনভূমির এবং বনজসম্পদের অবদান অপরিসীম। বনভূমির বহুল উপকারিতার মধ্যে কিছু নিম্নে আলোচনা করা হল—

(১) সালোকসংশ্লেষ (Photosynthesis) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভিদ বাতাসের $CO_2$ কে শোষণ করে এবং পরিবর্তে $O_2$ বাতাসে ছাড়ে। কার্বন সঞ্চয় (Carbon sequestration) পদ্ধতিতে গাছপালার আয়তন বৃদ্ধি পায় এবং সাথে সাথে বাতাসের কার্বনের পরিমাণ কমায়। এর ফলে গ্রিন হাউস গ্যাস (Greenhouse Gas)-এর পরিমাণ হ্রাস পায় এবং ফলস্বরূপ বিশ্ব উষ্ণায়নের (Global warming) প্রভাব হ্রাস পায়। প্রতিবছর প্রায় ২.০ বিলিয়ন টন কার্বনকে বনভূমি শোষণ করে।

(২) বনভূমির উদ্ভিদের শিকড়ের সংলগ্ন মাটিতে উপস্থিত পরিত্যক্ত হিউমিক অ্যাসিড এবং Fluric অ্যাসিড বাতাসের প্রায় ৩ মিলিয়ন টন কার্বন শোষণ করে রাখতে পারে।

(৩) গাছের শিকড় মাটিকে খুব আস্টেপৃষ্টে ধরে রাখে এবং গাছের শাখা-প্রশাখা বৃষ্টির জলকে সরাসরি মাটিকে আঘাত আনতে দেয় না ফলে ভূমিক্ষয় রোধ হয়।

(৪) গাছ পাতার স্টোমাটার মাধ্যমে মাটির জলকে বাতাসের মধ্যে বাষ্পাকারে নির্গমন করে তার ফলে বনভূমির ওপর মেঘের সৃষ্টি হয়। যা পরবর্তীকালে শীতলিভূত হয়ে বৃষ্টির সৃষ্টি করে। সুতরাং বলা যায় বনভূমি বৃদ্ধি মানে বৃষ্টিপাত বৃদ্ধি।

(৫) গাছের শিকড় এবং কাণ্ড বৃষ্টিপাতের জলকে সরাসরি বয়ে যেতে দেয় না তার ফলে মাটির নিচের জলস্তরের বৃদ্ধিতেও বনভূমির ভূমিকা আছে।

(৬) বনভূমি বাতাসের ধূলিকণা, বিষাক্ত গ্যাস যেমন, SOx, NOx শোষণ করে এবং কিছু কিছু গাছ যেমন নিম, ইউক্যালিপটাশ বাতাসের জীবাণু ধ্বংস করে। তাই বনভূমিকে প্রকৃতির ফুসফুস বলা হয়।

(৭) শব্দূষণ প্রতিরোধে বড়ো পাতা যুক্ত বনভূমির ভূমিকা আছে।

(৮) বনভূমি বহুল জীবজন্তুর বাসস্থান প্রায় স্থলভাগের ৭০% জীবজন্তু বনভূমিতে দেখতে পাওয়া যায়, তাই বনভূমি জীব বৈচিত্র্যের আধার হিসাবে ধরা হয়।

(৯) বনজসম্পদ মানুষের চাহিদা এবং রুজির ওপর প্রভাব বিস্তার করে। কাষ্ঠসম্পদ, নানা ফলমূল, ঔষধি, ফুল ইত্যাদি সম্পদ আদিবাসীরা বনভূমি থেকে আহরণ করে নিজেদের পেট চালানোর জন্য এবং জীবিকা নির্বাহ করে থাকে।

### ২.৩.৩ অরণ্য নিধন ও জনজাতির উপর তার প্রভাব (Deforestation and effects of deforestation on Tribal people)

মানব সভ্যতা যত আধুনিক থেকে আধুনিকতর হয়েছে এবং জনজাতির বিস্তার ঘটেছে তত বনাঞ্চল ধ্বংস হয়েছে, বনাঞ্চল ধ্বংসের প্রধান কারণ গুলি হল—

(১) বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমূলক ক্রিয়াকলাপ যেমন— রাস্তা, রেল লাইন, বড় বড় জলাধার এবং কারখানা নির্মাণ কার্যের জন্য বনভূমি কাটা হচ্ছে।

(২) জ্বালানির কাজের জন্য গ্রাম্য জনজাতি গাছপালা কেটে নেয়।

(৩) জনসংখ্যার বৃদ্ধির জন্য তাদের খাদ্যের যোগান দিতে নতুন উর্বর জমির জন্য বনভূমিকে নিঃশেষ করা হচ্ছে।

(৪) অতিরিক্ত পশুচারণ বনভূমির হ্রাসের একটি কারণ।

(৫) বনজ দ্রব্যাদি যেমন, আসবাব পত্রের জন্য কাঠ, কাগজ শিল্পের জন্য কাঁচামাল ইত্যাদির জন্য বনভূমি বিনষ্ট হচ্ছে।

(৮) প্রাকৃতিক কারণ যেমন— দাবানল, অগ্নুৎপাত ইত্যাদির জন্যও বনভূমি বিনষ্ট হয়।

**ফলাফল :**

অরণ্যের বাস্তুতন্ত্রের সাথে অরণ্যের আদিবাসী বা বনবাসী মানুষদের জীবনযাত্রা ওতোপ্রত ভাবে জড়িত অনেকটা মিথোজীবিদের ন্যায়। বনাঞ্চল নষ্ট হওয়ার ফলে আদিবাসী মানুষদের জীবনযাত্রার ওপর বিভিন্ন প্রভাব পড়েছে, সেগুলি হল—

(১) বনাঞ্চল আদিবাসীদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পীঠস্থান ফলে বন ধ্বংস হবার জন্য তাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আচরণবিধি বিঘ্নিত হয়।

(২) বনাঞ্চল নষ্ট হওয়ায় তাদের বাসস্থান স্থানান্তরিত হয়।

(৩) বনাঞ্চল নষ্ট হবার ফলে তাদের জীবিকার মূল উৎস বিনষ্ট হয় এবং পাশাপাশি তাদের মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য বিনষ্ট হয়।

(৪) রুজি রুটির জন্য তারা নানান অসামাজিক ক্রিয়াকলাপের সাথে যুক্ত হয়।

(৫) বনাঞ্চল বিনষ্ট হবার ফলে পৃথিবীর অনেক জায়গাতে বিভিন্ন প্রাচীন জনজাতি বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

### ২.৩.৪ যৌথ বন পরিচালন ব্যবস্থা (Joint Forest Management)

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য এবং বনভূমি সংরক্ষণের জন্য নানা ধরণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল যৌথ বন পরিচালন ব্যবস্থা। এটি একটি স্থানীয় জনগণ এবং সরকারের বনদপ্তরের যৌথ সহযোগে বন পরিচালন ব্যবস্থা (Joint Forest Management)। এটি প্রথম প্রচেষ্টামূলক ভাবে ১৯৭১-৭২ সালে পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলার আড়াবাড়ি জঙ্গলে চালু করা হয়। সেই সময় বনদপ্তরের আধিকারিক ছিলেন

ডঃ অজিত কুমার ব্যানার্জী। প্রথমাবস্থায় আড়াবাড়িতে ১১টি গ্রামের ৩৬৭০ জন সদস্যকে নিয়ে এই যৌথ কর্মসূচী চালু করা হয়। পরবর্তীকালে ১৯৮৯-১৯৯০-এ পশ্চিমবঙ্গ সরকার JFM কে অনুমোদন দেয় এবং এটাও জানায় যে বনপ্রতিরক্ষা সমিতির সদস্যরা মোট কাষ্ঠজাত দ্রব্যের বিক্রয়ের ২৫% ভাগ পাবে এবং তারা কাষ্ঠ ব্যতীত অন্যান্য দ্রব্যাদিও বন থেকে সংগ্রহ করতে পারবে। পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গে আরো অনেক বনপ্রতিরক্ষা সমিতি গঠিত হয়, এর পরবর্তীকালে অন্যান্য রাজ্য এবং ভারত সরকার এই যৌথ বনপরিচালন ব্যবস্থায় অনুপ্রাণিত হয়ে নানা জায়গায় এর প্রয়োগ করে চলেছে।

## ২.৪ খনিজ সম্পদ (Mineral Resources)

প্রাকৃতিকভাবে বহু লক্ষ বছর ধরে ভূপৃষ্ঠে খনিজের সৃষ্টি হয়ে থাকে। এর একটি নির্দিষ্ট রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য আছে। আকরিক হল একটি খনিজ বা অনেক খনিজের সমষ্টি যার থেকে প্রয়োজনীয় পদার্থ নিষ্কাশন করা এবং বিভিন্ন কাজে লাগানো সম্ভব, যেমন— ধাতু, লোহা, নিকেল, তামা জিঙ্ক প্রভৃতি শিল্পক্ষেত্রে ব্যবহৃত অতি প্রয়োজনীয় কাঁচামাল এছাড়া কয়লা, পেট্রোলিয়াম, সোনা, হিরে ইত্যাদিও খনিজ সম্পদের উদাহরণ।

খনিজ আকরিককে মাটির গভীর থেকে খনন করে বাইরে এনে কাজে লাগানো হয়। এই খনন কার্য সাধারণত চারটি ধাপে হয়ে থাকে—

- প্রসপেকটিং (prospecting) : খনিজের সন্ধান করা।
- অন্বেষণ (Exploration) : খনিজের অবস্থান, আকার, আয়তন এবং অর্থনৈতিক মূল্য পরিমাপ করা।
- উন্নয়ন (Development) : নানা নির্মাণ কাজ ও পরিকাঠামো তৈরি করা যাতে মাটির নিচে জমা খনিজ বের করে আনা যায়।
- শোষণ (Exploitation) : খনির মধ্য থেকে খনিজ বের করে আনা।

### ২.৪.১ খনন পদ্ধতি

সাধারণ ভাবে ২ ধরনের খনন করা হয়ে থাকে—

(১) পৃষ্ঠতল খনন (Surface Mining) : এটি বর্তমানে বহুল প্রচলিত খনন পদ্ধতি। ভূপৃষ্ঠের গাছপালা, মাটি এবং প্রাথমিক শিলা স্তরকে খুঁড়ে ফেলা হয় এবং তারপর খনিজের স্তরটি খুঁড়ে বাইরে নিয়ে আসা হয়। উদাহরণ— Open pit mining, Strip mining ইত্যাদি।

(২) ভূগর্ভস্থ খনন (Underground Mining) : সুড়ঙ্গ খুঁড়ে মাটির গভীরে পৌঁছে তার থেকে খনিজের স্তরটিকে বাইরে আনা হয়। ভূপৃষ্ঠের উপরিতল অক্ষত থাকে এবং খননের পর ফাঁকা জায়গাটি বালি দ্বারা ভর্তি করে দেওয়া হয়। Drift mining, Slop mining এই পদ্ধতির উদাহরণ।

### ২.৪.২ ভারতের খনিজ সম্পদ (Minaral resources in India)

ভারত প্রাকৃতিক খনিজ সম্পদের ভাণ্ডার এবং খনিজের উপর নির্ভর করেই ভারত আজ তার স্থান বিশ্বে ওপরের দিকে গ্রহণ করে চলেছে। প্রায় ৮৭ ধরনের খনিজ সম্পদ ভারত উৎপাদন করে থাকে।

**ভারতের উল্লেখযোগ্য খনিজ এবং তাদের উৎপন্ন স্থল—**

| ক্রমিক সংখ্যা | খনিজ | স্থান |
|---|---|---|
| ১ | অ্যালুমিনিয়াম | কেরালা |
| ২ | এসবেস্টস | কর্ণাটক, রাজস্থান |
| ৩ | বক্সাইট | ঝাড়খণ্ড, মহারাষ্ট্র, চণ্ডীগড় |
| ৪ | কয়লা | পশ্চিমবঙ্গ (রানিগঞ্জ), ঝাড়খণ্ড (ঝারিয়া, বোকারো) |
| ৫ | হীরে | মধ্যপ্রদেশ (পান্না) |
| ৬ | সোনা | কর্ণাটক (কোলার) |
| ৭ | ক্রোমিয়াম | ওড়িশা (সুকিন্দা) |
| ৮ | খনিজ তেল | আসাম |

### ২.৪.৩ পরিবেশ ও সমাজের উপর খনন কার্যের প্রভাব (Environmental and social impacts of mining)

(১) পরিবেশের উপর প্রভাব :

খনন কার্য পরিবেশের উপর ব্যাপক হারে প্রভাব ফেলে থাকে, যেমন—

- সোনা, সিসা, তামা, জিঙ্ক, রুপো, লোহা সাধারণ সালফইড যুক্ত পাথর থেকে পাওয়া যায়। সুতরাং খনন কাজের পর আকরিক সংগ্রহ হয়ে গেলে পাথরের যে বিশাল পাহাড় সৃষ্টি হয় তার থেকে বর্ষার সময় পাথরে থাকা ক্ষতিকর পদার্থ জলের সাথে মিশে গিয়ে অ্যাসিড জাতীয় তরল বর্জ্য পদার্থের সৃষ্টি করে। উল্লেখ্য বিষয় এই যে অ্যাসিড জাতীয় বর্জ্য আসে পাশে থাকা পদার্থের মধ্যের দূষিত মৌল যেমন— তামা, সিসা, ক্যাডমিয়াম, পারদ ইত্যাদিকে দ্রবীভূত করে এবং তা পরবর্তী কালে ভৌম জল স্তরকে দূষিত করে থাকে।
- স্তুপাকৃতি খনন কার্যজাত বর্জ্য পদার্থ থেকে বর্ষাকালে অবশিষ্ট বিভিন্ন ভারি ধাতু ক্রোমিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম, ক্যাডমিয়াম ইত্যাদি পার্শ্ববর্তী জলে চলে আসে এবং দূষণ ঘটায়।
- এছাড়া খনন কাজ করতে অতিরিক্ত মাত্রায় ভূমিক্ষয় হয়ে থাকে যা পার্শ্ববর্তী নদী বা জলাশয়কে ক্ষতিগ্রস্ত করে থাকে। Open cast mining-এর ক্ষেত্রে মাটিতে অনেক গভীর গর্তের সৃষ্টি হয় এবং তার জন্য প্রতিনিয়ত জলকে বাইরে পাম্পের সাহায্যে ফেলা হয়, ফলস্বরূপ মাটির নিচের জল স্তর হ্রাস পায়।

- খনন কাজের জন্য এবং তার পরিবহনের জন্য টন-টন ধুলো, মাটি বাতাসে মেশে এবং বায়ুদূষণ করে।
- খনন কাজের জন্য বিশাল এলাকা জুড়ে বনভূমি ও ভূপৃষ্ঠের মাটিকে সরিয়ে দেওয়া হয় ফলস্বরূপ জীব বৈচিত্র্যের হ্রাস ঘটে।
- উৎপন্ন পাথর, মাটির স্তূপ আশেপাশের চাষযোগ্য জমিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে ও মাটির প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটায়।

(২) সমাজের ওপর প্রভাব :

- কখনো কখনো স্থানীয় বাসিন্দাদের সম্পূর্ণভাবে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এরফলে তাদের জীবনযাত্রা ও ভূমি সবই নষ্ট হয়।
- খনন কাজের জন্য বাইরে থেকে অনেক শ্রমিক আসে এবং আশেপাশে বসতি গড়ে তোলে যা পূর্বের স্থানীয় মানুষজনদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করে।
- পরিবেশ, ভৌমজল, বায়ু, খাদ্য দূষণের ফলে স্থানীয় আদিবাসীদের শারীরিক অবনতি ঘটে এবং সিলিকসিস, আসবেসটোসিস, ক্যান্সারের মত জটিল রোগের সৃষ্টি হয়।
- এছাড়া জীবিকা ও মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য খনন কাজ সাহায্য করে।

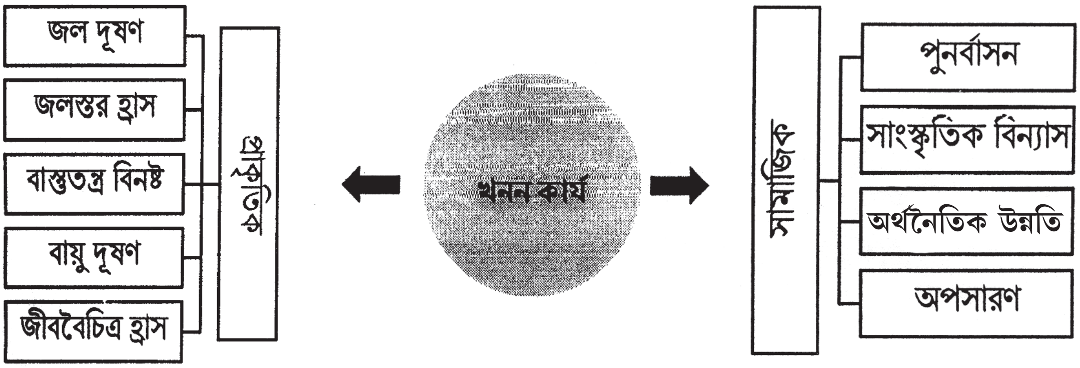


## ২.৫ ভূমি সম্পদ (Land Resources)

পরিবেশের উপাদানগুলির মধ্যে অন্যতম হল ভূমি। আর ভূমি অতি মূল্যবান সম্পদ বলে অতীতে রাজায় রাজায় যুদ্ধ লেগেছে। শুধু তাই নয়, বর্তমানে ভূমির অধিকারের জন্য পরিবারের মধ্যে, পাশাপাশি পরিবারের মধ্যে এমনকি দুটি প্রতিবেশী দেশের মধ্যে বিবাদের কম নজির মেলে না। শুধুমাত্র জমি অধিগ্রহণের জন্য দুটি প্রতিবেশী দেশ আজ পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের হুঙ্কার দিচ্ছে।

### ২.৫.১ ভূমি ও ভূমি সম্পদের গুরুত্ব (Importance of Land and Land Resources)

পৃথিবীর ২৯% স্থলভাগ যা উঁচু, কোথাও শিলাস্তর আবার কোথাও মাটির আস্তরণ দ্বারা ঢাকা। এই স্থলভাগের মাটি, জল, খনিজ, উদ্ভিদ ও জীবজন্তুকে মানুষ নিজের প্রয়োজন মেটাতে সম্পদ হিসাবে ব্যবহার করে। এর ভিত্তিতে

মানুষ কৃষিকার্য ও খাদ্য উৎপাদন করছে। বাসস্থানের জন্য শহর গ্রাম তৈরি করছে, এছাড়া শিল্পাঞ্চলও গড়ে তুলছে। ভূমি একটি অনবীকরণ যোগ্য সম্পদ হলেও সঠিকভাবে ব্যবহার করলে তাকে নবীকরণ যোগ্য সম্পদে পরিবর্তিত করা সম্ভব।

### ২.৫.২ ভূমির অবক্ষয় ও ভূমি দূষণ (Land Degradation and Land Pollution)

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে চাহিদাও অনেক বেড়েছে ফলে উন্নত কৃষিকার্যের মাধ্যমে অত্যধিক খাদ্যের যোগান, শিল্প ও উন্নত নগর পরিকল্পনার বৃদ্ধি ঘটেছে যার সাথে ভূমির অবক্ষয় ও দূষণ সমানুপাতিক হারে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে।

প্রাকৃতিক কারণে বা মানুষের অত্যধিক পরিমাণে ব্যবহারের ফলে ভূমির ব্যবহার যোগ্যতা হ্রাস পেলে তা ভূমির অবক্ষয় নামে পরিচিত। এক্ষেত্রে স্বল্প ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে স্বল্প সময়ের মধ্যে ভূমিকে আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভবপর হয়।

ভূমির সাধারণ উৎপাদনের সাথে দূষিত পদার্থের অনুপ্রবেশের ফলে মাটির ব্যবহার যোগ্যতা পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যায়। কোনরকম ব্যবস্থাপনা বা পদ্ধতি অবলম্বন করলেও কোন বিশেষ পরিবর্তন হয় না।

### ২.৫.৩ ভূমি অবক্ষয়ের কারণ

ভূমি অবক্ষয়ের কারণগুলি হল—

**প্রাকৃতিক কারণ :**

- পার্বত্য অঞ্চলে ভূমির ধ্বসের কারণে ভূমির অবনমন ঘটে।
- বন্যার সময় সাময়িকভাবে ভূমির ব্যবহার যোগ্যতা হ্রাস পায়।
- বন্যার সময় উপকূলবর্তী অঞ্চলে সামুদ্রিক নোনা বালি ঢুকে ভূমির লবণাক্ততা বৃদ্ধি করে।

**মনুষ্য সৃষ্ট কারণ :**

- অতিরিক্ত চাষবাসের মাধ্যমে ভূমির উর্বরতা হ্রাস পায়।
- অনিয়ন্ত্রিত পশুচারণের ফলে ভূমির ব্যবহার যোগ্যতা হ্রাস পায়।
- খনি অঞ্চলে খনন সৃষ্ট ভবিষ্যতের জন্য প্রচুর ব্যবহার্য জমি নষ্ট হয়।
- শহরাঞ্চলের আবর্জনা সঞ্চয়ের ফলে প্রচুর পরিমাণে জমি অব্যবহার্য হয়ে ওঠে।

### ২.৫.৪ ভূমি ধ্বস (Landslide)

কোন ভূভাগের বিস্তৃত অংশ প্রাকৃতিক বা মানুষের ক্রিয়ার প্রভাবে হঠাৎ বিচ্যুত হয়ে নিচে নেমে আসাকে ভূমিধ্বস বলে। সাধারণত পাহাড়ি অঞ্চলে বর্ষাকালে খাড়া ঢাল যুক্ত অংশগুলিতে এই ধরণের ঘটনা দেখতে পাওয়া যায়।

**কারণ :**

প্রাকৃতিক কারণগুলি হল—

(১) ভূমিকম্প (২) অধিক বৃষ্টিপাত (৩) তীব্র খাড়া ঢালে চ্যুতি থাকলে (৪) ভূমির গঠন (৫) অন্তর্বর্তী জলের প্রবাহ থাকলে ভূমিধ্বস হয়ে থাকে।

মনুষ্য সৃষ্ট কারণ :

- পরিবহন ব্যবস্থা উন্নত করার তাগিদে রাস্তা, রেললাইন তৈরি করা হচ্ছে পার্বত্য অঞ্চলে।
- ড্যাম নির্মাণ
- বনাঞ্চল নষ্ট
- বৃহৎ অট্টালিকা, হোটেল ইত্যাদি পাহাড়ের ঢাল তৈরির মাধ্যমে ভূমিধ্বসের প্রকোপ বৃদ্ধি করেছে।

**প্রভাব :**

এর প্রভাবে প্রাণহানি হয় এমনকি বড় বিপর্যয়ে ও ডেকে আনতে পারে, বনভূমি নষ্ট হয়, জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হয়। রাস্তা ঘাট, নির্মাণ নষ্ট হয়ে যায়।

### ২.৫.৫ মৃত্তিকা ক্ষয় (Land erosion)

নদী, বায়ু প্রভাব, বৃষ্টির জল ও সমুদ্র তরঙ্গ প্রভৃতি প্রাকৃতিক কারণের প্রভাবে প্রতিনিয়ত মৃত্তিকা ক্ষয় হয়ে চলেছে। মানুষের ক্রিয়াকলাপের দ্বারা তা আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে, ফলস্বরূপ কৃষি জমির পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে, উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে।

- পাহাড়ের ধাপে চাষ করার জন্য ও গবাদি পশু চারণের জন্য ভূমিক্ষয় হয়।
- বনভূমি ও মাটির ওপরের সবুজ হ্রাস করার ফলে মাটি আলগা হয়ে যায় এবং তার ক্ষয় হয়।
- খনি অঞ্চলে খনন কাজের জন্য মৃত্তিকার যথেষ্ট ক্ষয় হয়।

**মৃত্তিকার ক্ষয় নিয়ন্ত্রণের উপায় ঃ**

- পাহাড়ি অঞ্চলে ঢালু জায়গাতে বনভূমির সৃষ্টি করতে হবে।
- উপকূলে পাড় বা পাথর দ্বারা উপকূল অঞ্চল ঢেকে দিতে হবে যাতে ক্ষয় না হয়।
- পাহাড়ের ঢালে চাষের জন্য উপযুক্ত ঢাল তৈরি করে তবেই চাষ করতে হবে।
- মরুভূমির চারিদিকে ঝাও গাছের মত গাছ লাগিয়ে বলয় বনভূমি নির্মাণ করতে হবে।

## ২.৬ জল সম্পদ (Water Resource)

জল জীবকুলের কাছে অত্যাবশ্যক সম্পদ, জল ছাড়া জীবন অসম্ভব। আমরা খাবার ছাড়া ৩০ দিন পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারি কিন্তু জল ছাড়া মাত্র কয়েক দিনই বেঁচে থাকা সম্ভব। আমাদের শরীরে জলের পরিমাণ ১% কমলে আমরা তেষ্টার অনুভব হয় কিন্তু ১০% কমলে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

মানুষের দৈনন্দিন কাজে জলের গুরুত্ব অপরিসীম। স্নান, শৌচের কাজে, রান্না, গৃহস্থলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কারণে প্রচুর পরিমাণে জল ব্যবহার হয়ে থাকে। জীবনযাপন ছাড়াও মানব সভ্যতার সাথে জলের গুরুত্ব অপরিসীম। মানব সভ্যতার অতীত ঘাঁটলে জানা যায় সভ্যতার সৃষ্টি হয়েছিল নদীকে কেন্দ্র করে এছাড়া কৃষিকার্য ও শিল্পক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে জলের প্রয়োজন হয়ে থাকে। এই প্রয়োজনের যোগান দিতে ভূগর্ভের জল ভাণ্ডারের ব্যবহার বাড়ছে। ফলে ভূগর্ভস্থ জলের ভাণ্ডার ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছে, বাড়ছে জল সংকট। জল সম্পদের হ্রাসের কারণে আজ বাস্তুতন্ত্রের জীববৈচিত্র্য পর্যন্ত সংকটের মুখে।

### ২.৬.১ ভূপৃষ্ঠের জলের বণ্টন (Distribution of water on Earth)

পৃথিবীর ৭১ ভাগ জল ও ২৯ ভাগ স্থল তাই আপাত দৃষ্টিতে জলের ভাণ্ডার অপরিসীম হলেও, আজ বিশ্বের বহু দেশ জল সংকটে ভুগছে। তার প্রধান কারণ হল পৃথিবীতে মোট জলের ৯৭ শতাংশ জল সমুদ্রে অবস্থান করছে যা আসলে অব্যবহার্য নোনা জল আর বাকি ৩ শতাংশ জল যা স্থল ভাগে আছে তা স্বাদু জলের মধ্যে পড়ে। এই ৩% জল সঞ্চিত আছে, ভূপৃষ্ঠের জল, ভূ-অভ্যন্তরের জল, মেরু প্রদেশ ও পাহাড়ে বরফ হিসাবে।

ভূ-ভাগে জলের ২% জল বরফ হিসাবে সঞ্চিত আছে হিমবাহ এবং পাহাড়ে, আর বাকি ১% জল যা আসলে আমরা ব্যবহার করতে পারি তার নদী নালা, জলাশয় ও ভৌম জল স্তরে সঞ্চিত আছে। স্থল ভাগের এই ১% জলরাশিকে ১০০ ভাগে ভাগ করলে ৯৬.৬% ভৌম জল, ১.৪% জলাশয়ের জল, নোনা হ্রদ ও খাড়ি ১.৪% এবং জলীয় বাষ্প ও নদী নালা ০.৮%।

**কারণ :**

ভূমিক্ষয় একটি খুব স্বাভাবিক ঘটনা—

স্থলভাগের জলবন্টন (বরফ ছাড়া)

| **অবস্থান** | **জলের পরিমাণ (%)** |
|---|---|
| ভৌম জলস্তর (অগভীর) | ৪৮.৩ |
| ভৌম জলস্তর (গভীর) | ৪৮.৩ |
| পুকুর, জলাশয় | ১.৪ |
| নোনা জলের খাঁড়ি ও হ্রদ | ১.২ |
| মৃত্তিকার জলীয় বাষ্প | ০.৭ |
| নদী নালা ও অন্যান্য | ০.১ |

সুতরাং উপরিউক্ত জল বন্টন দ্বারা বোঝা যাচ্ছে মোট ব্যবহার্য জলের বেশির ভাগটাই ভৌম স্তরে সঞ্চিত। কিন্তু তা আহরণ করা কষ্টসাধ্য তাছাড়া ভৌম জল সুপেয় জলের সর্বোৎকৃষ্ট ভাণ্ডার। যথেচ্ছ ব্যবহার এই মূল্যবান সম্পদের হ্রাস ঘটাচ্ছে। তাই প্রয়োজন বিকল্প ভাবনার যা আগামীদিনের জল সংকট দূর করবে।

### ২.৬.২ ভূপৃষ্ঠের ও ভূগর্ভের জলের ব্যবহার ও অপব্যবহার (Use and over-utilization of surface and groundwater)

দৈনন্দিন সমস্ত ক্রিয়াকলাপের জন্য জলের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। স্নান, খাওয়া-দাওয়া ও গৃহস্থলীর কাজের জন্য জলের প্রয়োজন অনেক। গৃহস্থালীর কাজে মাথা পিছু জলের পরিমাণ ৭০-১৩০ লিটার-এর মত। এছাড়া কৃষিকাজ, শিল্পের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় জলের পরিমাণ অনেক বেশি। তৃতীয় বিশ্বের অর্থাৎ উন্নয়নশীল দেশগুলির ক্ষেত্রে কৃষিকার্যে ব্যবহৃত জলের পরিমাণ প্রায় ৭০%। শুধু উন্নয়নশীল দেশগুলিই নয় উন্নত দেশগুলির ক্ষেত্রেও কৃষিতে ব্যবহৃত জলের পরিমাণ বেশি তবে শিল্পক্ষেত্রেও এর পরিমাণ তুলনামূলকভাবে বেশি।

সভ্যতার প্রাচীনকালে জলের প্রয়োজন ছিল অল্প কিন্তু বর্তমানে উন্নত জীবনযাত্রার তাগিদে গ্রাম ও শহরে জলের ব্যবহার বেড়েছে। এই জলের চাহিদা মেটাতে ভৌম জলের ব্যবহারের উপর নির্ভরশীলতা বেড়েছে ক্রমশ। বিশুদ্ধ ও পানযোগ্য এই ভৌম জলকে গৃহস্থালী, সেচে এবং শিল্পক্ষেত্রে ব্যবহার করা বিশুদ্ধ জলের অপচয় ছাড়া অন্য কিছু না। সরকার কর্তৃক গৃহীত বিনামূল্যে বিদ্যুৎ ও সবুজ বিপ্লবের পদক্ষেপে আজ ভৌম জল স্তর হ্রাসের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সভ্যতা যত উন্নত হয়েছে জলের ব্যবহার বেড়েছে এবং ফলস্বরূপ মাটির জলীয় বাষ্পের হ্রাস ঘটেছে যার ফল মরুকরণ প্রক্রিয়া, উদাহরণস্বরূপ— ঐতিহাসিক সর্বন্নত সিন্ধুসভ্যতা ও মিশরীয় সভ্যতা আজ মরুভূমির গ্রাসে।

জলের এই অত্যাধিক ব্যবহারের কারণে আগামী দিনে দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত জলের সংকট দেখা দেবে, তাই প্রয়োজন জলের সঠিক ব্যবহার এবং প্রয়োজনীয় জলের যোগান বৃদ্ধি করা। তবে একটি সুখবর হল জলকে পরিশোধন করে বহুবার পুনঃব্যবহার করা সম্ভব। এটা শুনলে অবাক হবেন আমাদের বর্তমান ব্যবহার্য জল কয়েক লক্ষ বছর আগে তৈরি। সুতরাং জল পরিশোধনের মাধ্যমে ব্যবহার্য জলের যোগান দেওয়া সম্ভব।

জল সম্পদের ব্যবহার

| কার্যাবলী | বিশ্বে জলের ব্যয় (%) | শিল্প ভিত্তিক উন্নত দেশে জলের ব্যয় (%) | উন্নয়নশীল দেশে জলের জলের ব্যয় (%) | ভারতে জলের ব্যয় (%) |
|---|---|---|---|---|
| **কৃষিকাজ** | ৭০ | ৩০ | ৮২ | ৭০ |
| **শিল্প** | ২২ | ৫৯ | ১০ | ১৫ |
| **গৃহস্থালী** | ৮ | ১১ | ৮ | ৫ |

### ২.৬.৩ জলের অপব্যবহার :

দিনের শুরুতে ঘুম ভাঙা থেকে রাতে ঘুমাতে যাওয়া পর্যন্ত জলের ব্যবহার হয় সবক্ষেত্রে। প্রত্যহ আমাদের জীবনযাত্রার তাগিদে ৭০-১৩০ লিটার জল মাথা পিছু প্রয়োজন। তবে এর পরিমাণ স্থান বিশেষে পরিবর্তিত হয়ে থাকে। বর্তমানে অত্যাধিক জলের ব্যবহার, দূষণ, জল সংকটের সম্মুখীন করেছে। ২০১৯ সালে গ্রীষ্মকালে চেন্নাই সহ বেশ কয়েকটি উন্নত শহর ভয়াবহ জল সংকটের সম্মুখীন হয়েছে। আগামী দিনে এর ভয়াবহতা কমবে না বরং বাড়বে। তাই প্রয়োজন জলের অপব্যবহার কমিয়ে জলসংকট দূর করা।

জল অপব্যবহারের মাধ্যমগুলি হল—

● কৃষিকার্যে অতিরিক্ত বিশুদ্ধ ভৌম জলের ব্যবহার।

● শুষ্ক অঞ্চলে আর্দ্র কৃষির প্রবর্তন।

● শহরাঞ্চলে পৌরসভা দ্বারা অতিরিক্ত জল সরবরাহ এবং জল সরবরাহ করার কল থেকে মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণে জল পড়ে যাওয়া।

● বাড়ি ঘর, জামাকাপড়, গাড়ি প্রভৃতি পরিষ্কার করার কারণে প্রচুর পরিমাণে জল ব্যবহার করা হয়।

● শিল্পাঞ্চলে ব্যবহৃত জল পুনঃ ব্যবহার না করা এবং দূষিত জল নদী-নালাতে ফেলে তা দূষিত করা।

● তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিতে প্রচুর পরিমাণে জলের প্রয়োজন হয় এবং তাতে পুনঃ পরিশোধিত জল ব্যবহার না করে নদী ও ভৌম জল যথেচ্ছ পরিমাণে নিষ্কাশন করার ফলে জল স্তরের হ্রাস ঘটছে।

● আর্দ্র অঞ্চলে ভূপৃষ্ঠের জলের সুবিধা থাকলেও কৃষিকার্যে ভৌম জলের ব্যবহার।

### ২.৬.৪ জল সংকট নিবারণ (Minimise water crisis)

নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলি অবলম্বন করে জল সংকট নিবারণ করা সম্ভব—

● জনগণকে জলের ব্যবহার ও অপব্যবহার সম্পর্কে জ্ঞান দান করতে হবে এবং সচেতন করতে হবে।

● জল সরবরাহ করার কলগুলিতে স্বয়ংক্রিয় ট্যাপ ব্যবহার করা যেতে পারে।

● প্রতিটি বাড়িতে ব্যবহৃত জলকে পুনঃ ব্যবহার্য করার ব্যবস্থা করতে হবে।

● কৃষিকার্যে যে সমস্ত শস্য চাষে বেশি জল লাগে তার জায়গায় স্বল্প জল লাগে সেইরকম শস্য ব্যবহার করতে হবে।

● Drip জলসেচ ও স্প্রিঙ্কলার পদ্ধতিতে চাষ করলে স্বল্প জলে বেশি ফসল হয়।

● শিল্পে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করা প্রয়োজন যাতে কম জল লাগে।

● চিরাচরিত পদ্ধতিতে পুকুর ও খাল খনন করার মাধ্যমে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ।

● বাড়ির ছাদে বৃষ্টির জল সংগ্রহ করে তা কাজে লাগানো হয়।

● যথেচ্ছ গভীর নলকূপ খনন ও যথেচ্ছ জল সংগ্রহের ক্ষেত্রে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার।

● জলের দাম সঠিক ভাবে রাখা উচিত যাতে অযথা অপব্যবহার না হয়।

### ২.৬.৫ ভারতের জল সম্পদের ব্যবস্থাপনা (Water resource management in India)

১৯৫৬ সালে ভারতে জল সম্পদ ব্যবস্থাপনাকে মাথায় রেখে রির্ভার বোর্ড অ্যাক্ট তৈরি হয় (River Board Act, 1956)। নদী অববাহিকায় জলসম্পদের বণ্টন, ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনার উদ্দেশ্যে এটি তৈরি করা হয়। নদী

অববাহিকা পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলির মধ্যে ঐক্য না থাকায়, ব্রহ্মপুত্র বোর্ড, নর্মদা নিয়ন্ত্রণ দপ্তর, দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন, তুঙ্গভদ্রা বোর্ড গঠন করা হয় উক্ত নদীগুলির অববাহিকার জলের বণ্টন, পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার তাগিদে।

ভারতের ভূগর্ভস্থ জলের পরিমাণ ও অবস্থা জানার জন্য ১৯৯৭ সালের জুলাই মাসে কেন্দ্রীয় ভূগর্ভস্থ জল দপ্তর (Central Ground Water Authority) পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, (১৯৮৬) অধীনে গঠন করা হয়। রাজ্যগুলির মধ্যে জাতীয় জল নীতি ও সমীক্ষা করার জন্য 'National Water Council' গঠন করা হয়। এই পরিষদের তত্ত্বাবধানে ২০১২ সালে জাতীয় জল নীতির খসড়া তৈরি করা হয় যার মুখ্য বিষয় হল ‘‘জল একটি সংকটাপন্ন সম্পদ এবং জীবন ও বাস্তুতন্ত্রের জন্য আবশ্যক’’।

জলসম্পদ মন্ত্রকের অধীনে থাকা বিভিন্ন সংস্থাগুলি উল্লেখ করা হল—

প্রধান অফিসের অন্তর্ভুক্ত :

- কেন্দ্রীয় জল কমিশন (Central Water Commission, CWC)
- কেন্দ্রীয় মাটি এবং খনিজ গবেষণা কেন্দ্র (Central Soil and Material Research Station, CSMRS)

সহায়ক অফিস :

- গঙ্গা বন্যা নিয়ন্ত্রক কমিশন (Ganga Flood Control Commission, GFCC)
- ফারাক্কা ব্যারেজ প্রকল্প (Farakka Barrage Project; FBP)
- কেন্দ্রীয় জল ও শক্তি গবেষণা কেন্দ্র (Central Water & Power Research Station; CWPRS)
- যমুনা নদী বোর্ড (Yamuna River Board, YRB)

এছাড়া :

- NPCC (National Projects Construction Corporation Limited)
- NIH (National Institute of Hydrology)
- Brahmaputra Board
- Tunghabhadra Board

—ইত্যাদি এর অন্তর্গত

## ২.৭ ধারণযোগ্য উন্নয়নের ধারণা (Concept of Sustainable development)

আন্তর্জাতিক স্তরে পরিবেশ সংক্রান্ত ভাবনাচিন্তার প্রথম সফল উদ্যোগ শুরু হয় 1972 সালে। এই বছর সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমে রাষ্ট্রসংঘের মানব পরিবেশ (Human Environment) শীর্ষক সম্মেলনে পরিবেশ ও উন্নয়নের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিশ্বের সব দেশকে আহ্বান করা হয়। এতে পরিবেশের মূল সমস্যাগুলি এবং দূষণ সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা হয়, এবং পরিবেশ ও উন্নয়ন সম্পর্কে 109টি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এরপর 1980 সালে প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণে আন্তর্জাতিক সংঘ (International Union for

the conservation of Nature and Natural Resources) ধারণযোগ্য বা স্থিতিশীল উন্নয়নের ধারণাটির উপর গুরুত্ব দেয়। এরও কয়েকবছর পর ১৯৮৭ সালে রাষ্ট্রপুঞ্জের উদ্যোগে স্থাপিত হয় পরিবেশ ও উন্নয়ন সংক্রান্ত বিশ্ব কমিশন (World commission on the Environment and development)। এই কমিশনের সভাপতি ছিলেন নরওয়ের প্রধানমন্ত্রী ব্রান্টল্যান্ড (Brundland) এবং তার নাম অনুসারে এই কমিশন ব্রান্টল্যান্ড কমিশন নামে পরিচিত। এই কমিশন ''আমাদের সাধারণ ভবিষ্যৎ'' বা "Our Common Future" শীর্ষক প্রতিবেদনে দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নের দুটি মূল বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করে— (i) পরিবেশ বা বাস্তুতন্ত্রকে অক্ষুণ্ণ রাখা এবং (ii) পরিবেশের গুণগত মান অপরিবর্তিত রেখে মানুষের জীবনধারণের মান উন্নয়নে যত্নশীল হওয়া। এই দুটি বিষয়কে মাথায় রেখে ব্রান্টল্যান্ড কমিশন স্থিতিশীল উন্নয়নের সবচেয়ে জনপ্রিয় সংজ্ঞা দেন— স্থিতিশীল উন্নয়ন হল বর্তমানের সমস্ত প্রয়োজনগুলিকে এমনভাবে মেটানো যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চাহিদাগুলি মেটানোর ক্ষমতা নষ্ট না হয় (Sustainable development is the development that meets the needs and aspirations of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs)। স্থিতিশীল উন্নয়নের সম্পর্কে ব্রান্টল্যান্ডের এই বক্তব্য পরবর্তীকালে প্রচুর বিতর্কের জন্ম দিলেও এই বক্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরে অবশ্য 1991তে IUCN Report 'কেয়ারিং ফর দি আর্থ' (Carino for the Earth) এবং 1992-র সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের বসুন্ধরা সম্মেলনের 'এজেন্ডা 21'-ও (Agenda 21 of Earth Summit) উন্নয়ন সম্বন্ধে একই কথা বলে। অর্থাৎ স্থিতিশীল উন্নয়ন হল—

➠ (1) যা টিকিয়ে রাখা যায় কয়েক প্রজন্ম ধরে

➠ (2) যার একটি সর্বাঙ্গীন দৃষ্টিভঙ্গি আছে।

➠ (3) যা বর্তমানের জন্য হলেও ভবিষ্যতের কোনো ক্ষতি করে না।

➠ (4) যা বিশেষ করে পৃথিবীর গরীব মানুষের চাহিদা পূরণের দিকে বেশি নজর রাখে।

➠ (5) সাংস্কৃতিক ও জীববৈচিত্র্য রক্ষার উপকরণের যথাযথ ব্যবহার সুনিশ্চিত করে।

### ২.৭.১ নীতি নির্দেশিকা (Guidelines)

স্থিতিশীল উন্নয়ন সম্পর্কে আমরা যে ধারণা পেয়েছি, তাতে এটা স্পষ্ট যে জনসাধারণের সক্রিয় সমর্থন ও সহযোগিতা ছাড়া এই ধরনের উন্নয়ন সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে প্রধান নীতি নির্দেশিকাগুলি হল—

[1] উন্নয়নমূলক যে-কোনো কাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় জনসাধারণকে অংশীদার করতে হবে।

[2] বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন আর্থ-সামাজিক মতবাদ ও রীতিনীতি প্রচলিত আছে। সুতরাং পরিবেশ সম্পদের সঠিক ব্যবহার ও সংরক্ষণের জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক গোষ্ঠীগুলির মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া প্রয়োজন।

[3] স্থিতিশীল উন্নয়নের জন্য সম্পদের সংরক্ষণ প্রয়োজন। সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজন—

➧ [a] সম্পদের উৎপাদন ও ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ

➧ [b] কোনো বিশেষ সম্পদ সেইসব কাজে ব্যবহার করতে হবে, যেসব কাজের পক্ষে উপযোগী এবং আর কোনো সম্পদ পরিবর্ত হিসাবে ব্যবহার করা যাবে না। খনিজ তেল উত্তাপ সৃষ্টির কাজে ও বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহৃত

হতে পারে। কিন্তু উত্তাপ সৃষ্টি কয়লা, কাঠ বা প্রাকৃতিক গ্যাসের দ্বারাও হতে পারে। বিদ্যুৎ, কয়লা পুড়িয়ে অথবা জলপ্রবাহ থেকেও উৎপাদিত হতে পারে। খনিজ তেল পরিশোধন করে যে পেট্রোল বা গ্যাসোলিন পাওয়া যায় তা মোটরগাড়ি ও বিমানপোত চালানোর জন্য ব্যবহার করা হয়। কিন্তু মোটরগাড়ি ও বিমানপোত চালানোর কাজ কয়লা, কাঠ, প্রাকৃতিক গ্যাস বা জলবিদ্যুতের দ্বারা সম্ভব নয়। সুতরাং সংরক্ষণের জন্য খনিজ তেল উত্তাপ সৃষ্টি বা বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ব্যবহার না করে মোটরগাড়ি ও বিমানপোত চালানোর জন্য এবং আরও যেসব কাজ তেল ছাড়া আর অন্য কোনো জিনিসের দ্বারা সম্ভব নয় সেইসব কাজের জন্য ব্যবহার করতে হবে।

➧ [c] প্রাকৃতিক সম্পদগুলির মধ্যে কয়লা, প্রাকৃতিক গ্যাস, খনিজ তেলের মতো যেগুলি সঞ্চিত বা গচ্ছিত সম্পদ সেগুলির পরিবর্তে যথাসম্ভব জলপ্রবাহ, সূর্যকিরণ, বায়ুপ্রবাহ ও বনভূমির মতো পুনর্ভব সম্পদ ব্যবহার করতে হবে। সংরক্ষণের জন্য শক্তি উৎপাদনের কাজে কয়লা, তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের খরচ যথাসম্ভব কমিয়ে জলস্রোতে, সূর্যকিরণ, বায়ুপ্রবাহ ও অন্যান্য অচিরাচরিত শক্তির ব্যবহার বাড়াতে হবে।

➧ [d] সম্পদের উৎপাদন বিজ্ঞানসম্মতভাবে করতে হবে। এমনভাবে উৎপাদন করতে হবে যাতে কোনো অপচয় না ঘটে এবং সবচেয়ে কম খরচে সবচেয়ে বেশি উৎপাদন করা যায়।

➧ [e] কোনো জিনিসের উৎপাদন শুধু প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নির্ভর করে না। একটি বিশেষ অনুপাতে প্রাকৃতিক সম্পদ, শ্রম ও মূলধনের সমন্বয়ের দ্বারাই উৎপাদন সংঘটিত হয়। এই কারণে সম্পদ সংরক্ষণ করতে হলে শুধু প্রাকৃতিক সম্পদ নিয়ে বিবেচনা করলে চলবে না, শ্রম মূলধন প্রভৃতি অন্যান্য উপাদানগুলি নিয়েও বিবেচনা করতে হবে। ব্যাপক কৃষিপদ্ধতিতে কম জমিতে বেশি মূলধন ও বেশি শ্রমিক নিয়োগ করে সেই একই পরিমাণ ফসল ফলানো যায়। অর্থাৎ প্রাকৃতিক সম্পদের অনুপাত কমিয়ে এবং উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানের অনুপাত বাড়িয়ে আমরা একই পরিমাণ জিনিস উৎপাদন করতে পারি। এইভাবে প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ হতে পারে।

➧ [f] গচ্ছিত সম্পদের মধ্যে কতগুলি সম্পদ প্রকৃতি থেকে আহরণের পর বারবার ব্যবহার করা (Recyling) যায়। যেমন আকরিক লোহা গচ্ছিত বা সঞ্চিত সম্পদ; একটা নির্দিষ্ট পরিমাণে পৃথিবীতে সঞ্চিত আছে এবং খনি থেকে উত্তোলনের সঙ্গে সঙ্গে এর পরিমাণ স্থায়ীভাবে কমে যাচ্ছে। কিন্তু, লোহা ও ইস্পাতের তৈরি জিনিস ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে গেলে সেগুলি গলিয়ে আবার নতুন ব্যবহার্য জিনিস তৈরি করা যায়।

➧ [g] পৃথিবীতে সম্পদের সর্বাধিক অপচয় ঘটে যুদ্ধের ফলে। আধুনিক সর্বাত্মক মহাযুদ্ধ অপরিমেয় সম্পদের ধ্বংসাধন করে। এর সঙ্গে বর্তমানে যুক্ত হয়েছে সন্ত্রাসবাদ। বিশ্বজুড়ে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ সম্পদের ধ্বংস সাধন করছে। যুদ্ধ ও সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বন্ধ এবং পৃথিবীতে চিরস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত না হলে সম্পদ সংরক্ষণের কোনো ব্যবস্থাই পুরোপুরি ফলপ্রসূ হবে না।

➧ [h] সম্পদ সংরক্ষণের জন্য সম্পদ উৎপাদন ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বার্থ ও সমষ্টি স্বার্থের মধ্যে মূল দ্বন্দ্ব রয়েছে তা দূর করতে হবে। এর জন্য সম্পদ সংরক্ষণ সম্পর্কে জনগণের চেতনা বৃদ্ধি এবং যেসব সম্পদের সংরক্ষণ জরুরী সেগুলির ওপর সমাজ ও রাষ্ট্রের কোনো না কোনোরকম নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। জাগ্রত জনমানস ও কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রই সমষ্টিস্বার্থের সর্বপ্রধান রক্ষক।

[4] **বসুন্ধরার বহনক্ষমতা অনুযায়ী উন্নয়ন :** পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্রের [Ecosystem] বহনক্ষমতার একটি নির্দিষ্ট সীমা আছে। সেই সীমা অতিক্রম করলে পরিবেশ দূষিত হয় ও বাস্তুতন্ত্র বিপর্যয় হয়ে পড়ে। সব অঞ্চলের বাস্তুতন্ত্রের বহনক্ষমতা সমান নয়। কোনো অঞ্চলের বাস্তুতন্ত্রের বহনক্ষমতা অনুযায়ী সেই অঞ্চলের জনসংখ্যা ও

জীবনযাপন প্রণালীর সামঞ্জস্য বিধান করা প্রয়োজন। তবেই উন্নয়ন স্থিতিশীল হবে। এর জন্য বিশেষ পর্যবেক্ষণ, প্রযুক্তি ও কর্মপন্থা প্রয়োগ করা দরকার।

[5] **পরিবেশের গুণগত মান বজায় রেখে উন্নয়ন :** উন্নয়নের যেসব পন্থা ও পদ্ধতি পরিবেশের গুণগত মানের হ্রাস ঘটায়, বাস্তুতন্ত্রের পুনরুৎপাদন ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ করে সেগুলি বাদ দিতে হবে। স্থিতিশীল উন্নয়নের জন্য পরিবেশের গুণগত মান বজায় রাখা দরকার। কারণ পরিবেশের গুণগত মান বজায় থাকলেই বাস্তুতন্ত্রের পুনরুৎপাদন ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ থাকে।

[6] **অসাম্য দূরীকরণ :** পৃথিবীতে অল্প কয়েকটি দেশ ধনী। বেশীর ভাগ দেশ দরিদ্র একটি দেশের মধ্যেও অঞ্চলে-অঞ্চলে বৈষম্য রয়েছে। পাঞ্জাবের তুলনায় বিহার বা ওড়িশা অনেক পিছিয়ে আছে। একটি অঞ্চলের মধ্যেও ধনী দরিদ্রে বিরাট বৈষম্য দেখা যায়। এই সর্বব্যাপী অসাম্য নানাভাবে সম্পদের অপচয়, বাস্তুতেন্ত্রর অবক্ষয় এবং পরিবেশের নিদারুণ ক্ষতি করছে। স্থিতিশীল উন্নয়নের জন্য দেশে-দেশে, অঞ্চলে-অঞ্চলে, মানুষে-মানুষে বৈষম্য দূর করে সামাজিক ন্যায় ও সাম্য প্রতিষ্ঠা করা দরকার।

[7] **দূষণ নিয়ন্ত্রণ :** পরিবেশ দূষিত হলে সম্পদের ধ্বংসসাধন ঘটে, বাস্তুতন্ত্র বিপর্যয় হয়, উদ্ভিদ ও প্রাণীর অস্তিত্ব সংকটাপন্ন হয়। শেষ পর্যন্ত শুধু যে উন্নয়ন ব্যাহত হয় তাই নয়, মানুষের অস্তিত্বও বিপন্ন হয়ে পড়ে। তাই দূষণ নিয়ন্ত্রণ ছাড়া স্থিতিশীল উন্নয়ন সম্ভব নয়।

[8] **জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ :** বর্তমানে বিশ্বের জনসংখ্যা 600 কোটিরও বেশি। আগামী 50 বছরে এই জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হবে 650 কোটিরও বেশি। লোকসংখ্যা এই হারে বাড়তে থাকলে খাদ্য ও অন্যান্য জিনিসের চাহিদা অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাবে এবং পরিবেশের ওপর নিদারুণ চাপ পড়বে। বর্তমান ও ভবিষ্যতের সম্পদের যোগান অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে উন্নয়ন সুস্থায়ী করতে হলে, জন্মহার নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য।

## ২.৮ অনুশীলনী

**সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করুন :**

(১) এদের মধ্যে কোনটি অনবীকরণ যোগ্য সম্পদ নয়—

(i) কয়লা (ii) লোহা (iii) বনভূমি (iv) খনিজ তেল

(২) MoEFCC এর পুরো নাম কি—

(i) Ministry of Environment Forest and Climate Control

(ii) Ministry of Environment Forest and Climate Change

(iii) Ministry of Environment For Climate Control

(iv) Ministry of Environment For Climate Change

(৩)

| **খনিজ** | **উৎপন্ন স্থল** | | **a** | **b** | **c** | **d** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (a) সোনা | (i) রানীগঞ্জ | (1) | iv | i | iii | ii |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (b) কয়লা | (ii) সুকিন্দা | (2) | iii | i | ii | iv |
| (c) ক্রোমিয়াম | (iii) কোলার | (3) | i | iv | ii | iii |
| (d) খনিজ তেল | (iv) ডিগবয় | (4) | ii | iii | iv | i |

(৪) পৃথিবীর মোট জলভাগের _______ জল সমুদ্রে উপস্থিত

(i) ৫০% (ii) ৭৫% (iii) ৯৭% (iv) ৮২%

(৫) কোন ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ জল ব্যবহৃত হয়—

(i) শিল্প (ii) গৃহস্থালি (iii) কৃষিকাজ (iv) হোটেল

(৬) ভারতের সর্ববৃহৎ নদী অববাহিকা কোনটি—

(i) সিন্ধু (ii) গোদাবরী (iii) গঙ্গা (iv) কাবেরী

(৭) একজন মানুষের প্রত্যহ গড়ে কত লিটার জল প্রয়োজন—

(i) ২৯৯-২৫০ (ii) ১০০-১৫০ (iii) ৭০-১৩০ (iv) ৫০-১১০

(৮) ২০১৯ সালে জল সংকটে আক্রান্ত শহর হল—

(i) কলকাতা (ii) চেন্নাই (iii) আসাম (iv) কর্ণাটক

(৯) কোনটি প্রাকৃতিক বনজাত সম্পদ নয়—

(i) জ্বালানি কাঠ (ii) মধু (iii) ঔষধি গাছ (iv) তসর

(১০) এর ২০১৭ সালের তথ্য অনুযায়ী ভারতের মোট ভূভাগের ______ % বনভূমি দ্বারা আবৃত—

(i) ২১% (ii) ২১.৫৩% (iii) ২৩.৭৮% (iv) ৪২%

**অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্ন :**

(১) অনবীকরণ যোগ্য সম্পদ কাকে বলে? ২টি উদাহরণ দিন।

(২) কার্বন সঞ্চয় কাকে বলে?

(৩) অরণ্য নিধন কাকে বলে?

(৪) পৃষ্ঠতলে খনন পদ্ধতি বলতে কি বোঝেন?

(৫) মৃত্তিকা ক্ষয় কাকে বলে?

(৬) ভৌম জল হ্রাসের মুখ্য কারণ গুলি কি কি?

**সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্ন :**

(১) প্রাকৃতিক সম্পদ কয় প্রকার? উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা করুন।

(২) বনভূমি আমাদের কিভাবে উপকার করে?

(৩) যৌথ বন পরিচালন ব্যবস্থা বলতে কি বোঝেন।

(৪) পরিবেশের ওপর খনন কাজের প্রভাবগুলি লিখুন।

(৫) ভূমি অবক্ষয়ের কারণগুলি ব্যাখ্যা করুন।

(৬) ভারতে জল সংকট নিবারণের উপায়গুলি আলোচনা করুন।

**উত্তর সংকেত**

**নির্বাচন ভিত্তিক প্রশ্ন :**

(১) (iii) বনভূমি (২) (ii) Ministry of Environment Forest and Climate Change

(৩) (২) iii i ii iv (৪) (iii) ৯৭% (৫) (iii) কৃষিকাজ

(৬) (iii) গঙ্গা (৭) (iii) ৭০ - ১৩০ (৮) (ii) চেন্নাই

(৯) (iv) তসর (১০) (ii) ২১.৫৩%

# একক ৩ ❑ বাস্তুতন্ত্র (Ecosystem)

গঠন

৩.০ উদ্দেশ্য

৩.১ প্রস্তাবনা

৩.২ বাস্তুতন্ত্রের সংজ্ঞা (Definition of Ecosystem)

৩.৩ বাস্তুতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Ecosystem)

৩.৪ বাস্তুতন্ত্রের প্রকারভেদ (Types of Ecosystem)

৩.৪.১ বনভূমির বাস্তুতন্ত্র (Forest ecosystem)

৩.৪.২ তৃণভূমির বাস্তুতন্ত্র (Grassland ecosystem)

৩.৪.৩ সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্র (Marine ecosystem)

৩.৫ বায়োম (Biome)

৩.৬ বাস্তুতন্ত্রের উপাদান (Componets of Ecosystem)

৩.৬.১ কার্যভিত্তিক উপাদান

৩.৬.২ সাংগঠনিক উপাদান

৩.৭ ট্রপিক লেভেল, খাদ্যশৃঙ্খল, খাদ্য জালক ও খাদ্য পিরামিড (Trophic level, Food chain, Food web and Food Pyramid)

৩.৮ বাস্তুতেন্ত্রর উৎপাদনশীলতা (Productivity of Ecosystem)

৩.৯ বাস্তুতন্ত্রে শক্তি প্রবাহ (Energy flow in Ecosystem)

৩.৯.১ তাপ গতিবিদ্যার সূত্রদ্বয়

৩.৯.২ শক্তিপ্রবাহের পর্যায়

৩.৯.৩ শক্তিপ্রবাহের মডেল

৩.৯.৪ শক্তিপ্রবাহের বৈশিষ্ট্য

৩.১০ পুষ্টি চক্র (Nutrient Cycle)

৩.১০.১ সংজ্ঞা

৩.১০.২ বিভিন্ন পুষ্টি চক্র

৩.১০.২.১ কার্বন চক্র

৩.১০.২.২ নাইট্রোজেন চক্র

৩.১১ অনুশীলনী

## ৩.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানতে পারবেন।

- বাস্তুতন্ত্রের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য ও প্রকারভেদ।
- বাস্তুতন্ত্রের উপাদান।
- ট্রপিক লেভেল, খাদ্যশৃঙ্খল, খাদ্য জালক ও খাদ্য পিরামিড।
- বাস্তুতন্ত্রে শক্তি প্রবাহ।
- পুষ্টিচক্র কাকে বলে ও বিভিন্ন প্রকার পুষ্টিচক্র।

## ৩.১ প্রস্তাবনা

জীব ও তার পরিবেশের পারস্পরিক আন্তঃসম্পর্ক চর্চার বিষয়কে বাস্তুবিদ্যা বা ecology বলে। জার্মান বিজ্ঞানী হেকেল (Haeckel) ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম Oekologie (গ্রীক 'Oikos' অর্থ বাসস্থান এবং 'Logos' অর্থ জ্ঞান) শব্দটি প্রয়োগ করেন। এই Oekologie থেকেই ecology শব্দটির উৎপত্তি। বাস্তুবিদ্যার সাধারণ সংজ্ঞা হিসাবে বলা যায় "**যে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বা বিদ্যা জীবের সঙ্গে ভৌত ও সজীব পরিবেশের পারস্পরিক ক্রিয়া এবং এই ক্রিয়ার ফলে উদ্ভুত বেঁচে থাকার উপাদান ও শক্তি সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত ধারণার সৃষ্টি করে তাকে বলে বাস্তুবিদ্যা**"।

বাস্তুবিদ্যার মৌল কার্যকরী একককে বাস্তুতন্ত্র বলে। কোনো একপ্রকার জীবকে পরিবেষ্টনকারী এবং তার সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষাকারী সজীব ও নির্জীব বস্তুসমূহকে জীবটির পরিবেশ বলে। একটি জীবের সঙ্গে তার পরিবেশের প্রতিনিয়তই কোনো না কোনো আদানপ্রদানের সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয়। এইভাবে আদানপ্রদানের দ্বারা কোনো একটি অঞ্চলে বসবাসকারী সকল জীব সম্প্রদায়ই পরস্পরের উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে এবং এই পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ভিত্তিতেই বসবাসের উপযোগী যে সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাটি গড়ে ওঠে তাকেই বাস্তুতন্ত্র বলে। বস্তুতপক্ষে পৃথিবীর বায়োস্ফিয়ার বহুসংখ্যক বাস্তুতন্ত্রেরই সমষ্টিমাত্র। সুতরাং বলা যেতে পারে বাস্তুতন্ত্র হল নির্দিষ্ট সময়ে একটি নির্দিষ্ট স্থানে বিস্তৃত এমন এক মুক্ত ব্যবস্থা যাতে বিভিন্ন সজীব ও জড় উপাদান পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে সুশৃঙ্খলভাবে বেঁচে থাকে। বাস্তুতন্ত্র প্রাকৃতিক (যেমন— পুকুর, নদী, অরণ্য ইত্যাদি) বা কৃত্রিম (যেমন— মাছ, ঘর, বাঁধ, বাগান, শহর ইত্যাদি) এই দুই প্রকার হতে পারে।

## ৩.২ বাস্তুতন্ত্রের সংজ্ঞা (Definition of Ecosystem)

১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে বাস্তুবিদ এ. জি. ট্যান্সলি (A. G. Tansley) বাস্তুতন্ত্র বা eco-system শব্দটি প্রথম চয়ন করেন। তিনি 'eco' শব্দটিকে পরিবেশ অর্থে ব্যবহার করেন। বিজ্ঞানী ওয়েবস্টার (Webster) 'System' শব্দটির ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তাঁর মতে, পুঞ্জীকৃত বাস্তুসমূহের পারস্পরিক আন্তঃক্রিয়ার ফলে সংযোগ সাধিত হয়। বাস্তুবিদ ওডাম (Odum, 1971) বাস্তুবিদ্যার নিম্নরূপ বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা প্রদান করেন—

"যে বিশেষ পদ্ধতিতে কোনো বসতিস্থানে অবস্থিত জীবগোষ্ঠীগুলি একে অপরের সঙ্গে এবং ওই বসতি অঞ্চলের অজৈব পরিবেশের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া করে একটি সুস্থিত তন্ত্র গঠন করে, সেই সুস্থিত তন্ত্র গঠনের ক্রিয়া পদ্ধতিকে বাস্তুতন্ত্র বলে।"

## ৩.৩ বাস্তুতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Ecosystem)

বিজ্ঞানী স্মিথ (Smith) ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে বাস্তুতন্ত্রের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহের উল্লেখ করেন—

1. বাস্তুতন্ত্র হল বাস্তুবিদ্যার মূল কার্যকরী একক। বাস্তুতন্ত্রের মধ্যে দিয়েই পুষ্টির চক্র আবর্তিত হয়।

2. বাস্তুতন্ত্র পরিবেশের বিভিন্ন জৈব এবং অজৈব উপাদান নিয়ে গঠিত।

3. বাস্তুতন্ত্রের মধ্যে দিয়েই শক্তির প্রবাহ সংঘটিত হয়। এই প্রবাহ বজায় রাখার জন্য উপাদানসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

4. বাস্তুতন্ত্রের মধ্যে দিয়ে শক্তির প্রবহন মাত্রা উৎপাদক সৃষ্ট শক্তির উপর নির্ভরশীল।

5. শক্তি পরিবহনের সময় প্রতিটি ট্রপিক স্তরে শক্তির পরিমাণ হ্রাস পায় এবং এই বৈশিষ্ট্যই প্রতিটি স্তরে জীবভর নির্ধারণ করে।

6. প্রাথমিক ট্রপিক স্তর থেকে উচ্চতর ট্রপিক স্তরে অপেক্ষাকৃত জটিল তন্ত্র পরিলক্ষিত হয় এবং প্রতিটি স্তরে স্থিতিশক্তির পরিমাণ হ্রাস পায়।

7. কোনো একটি বাস্তুতন্ত্রে নির্দিষ্ট প্রজাতির পপুলেশন একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত বৃদ্ধি পায় এবং তারপর স্থিতাবস্থায় আসে এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিক কারণে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়।

## ৩.৪ বাস্তুতন্ত্রের প্রকারভেদ (Types of Ecosystem)

পরিবেশের সজীব এবং জড় উপাদান সমূহের আন্তঃক্রিয়ার ফলে একটি বাস্তুতন্ত্র গড়ে ওঠে। পরিবেশে বিভিন্ন ধরণের বাস্তুতন্ত্র লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণস্বরূপ— বনভূমি, তৃণভূমি, মরুভূমি, জলাভূমি, (পুকুর, নদী, বৃহৎ জলাশয়) এবং সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্র এদের মধ্যে কয়েকটি নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

### ৩.৪.১ বনভূমির বাস্তুতন্ত্র (Forest ecosystem)

পৃথিবীর সমগ্র ভূ-ভাগের ৪০% জায়গা জুড়ে আছে বনভূমি এবং পরিমাণ মূল ভূ-ভাগের একের পাঁচ অংশ। বনভূমির বাস্তুতন্ত্রের মুখ্য উপাদানগুলি হল—

● **অজৈবিক উপাদান :** মাটির অজৈবিক উপাদানের সাথে সাথে মৃত পদার্থ, যেমন মৃত প্রধান গাছের পাতা, শাখা-প্রশাখার অংশাবশেষ পচে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে।

● **জৈবিক উপাদান :** বনভূমিতে উপস্থিত জীবের মধ্যে খাদ্য শৃঙ্খল নিম্নোক্ত ভাবে বজায় থাকে।

**উৎপাদক :** বনভূমির বাস্তুতন্ত্রের প্রধান উৎপাদক হিসাবে গাছকেই ধরা হয় তবে গুল্মজাতীয় উদ্ভিদও পাওয়া যায়। এই কারণে বনভূমিতে সবথেকে বেশি জীববৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। শাল, সেগুন, ইউক্যালিপটাশ প্রভৃতি গাছ মূলত বনভূমিতে জন্মায়। এছাড়া পাহাড়ি অঞ্চলে পাইন, জুনিপ্রাস, সিডার ইত্যাদি গাছ দেখতে পাওয়া যায়।

**খাদক :**

(১) প্রথম শ্রেণীর খাদক : শাকাহারী প্রাণী যারা গাছের পাতা খেয়ে বেঁচে থাকে যেমন— পিঁপড়ে, মাকড়সা, বিটল, লিফহপার ইত্যাদি ছোট প্রাণী এবং হাতি, নীলগাই, হরিণ, কাঠবিড়ালি, বাদুড়, মঙ্গোস ইত্যাদি দেখতে পাওয়া যায়।

(২) দ্বিতীয় শ্রেণীর খাদক : মংশাসী প্রাণী, যেমন সাপ, পাখি, টিকটিকি, শেয়াল ইত্যাদি

(৩) তৃতীয় শ্রেণীর খাদক : সর্বোচ্চ স্তরের খাদক (মাংশাসী) হিসাবে বাঘ, সিংহ, ইত্যাদি যারা দ্বিতীয় শ্রেণীর ও প্রথম শ্রেণীর উভয়দের খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে।

**বিয়োজক :** এই বাস্তুতন্ত্রে বহুধরনের আণুবীক্ষনিক জীব পাওয়া যায় যেমন ছত্রাক (অ্যাস্পারজিলাস, পলিপোরাস ইত্যাদি), ব্যাক্টেরিয়া (ব্যাসিলাস, ক্লস্ট্রিডিয়াম, সিউডোমোনাস ইত্যাদি) যারা মৃত জৈবপদার্থকে মাটির উপাদানে পরিণত করে। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের বনভূমিতে বিয়োজনের মাত্রা অনেক বেশি।

### ৩.৪.২ তৃণভূমির বাস্তুতন্ত্র (Grassland ecosystem)

পৃথিবীর সমগ্র ভূ-ভাগের মোটামাটি ১৯% হল তৃণভূমি। তৃণভূমি বাস্তুতন্ত্রের প্রধান উপাদান সমূহ :

● **অজৈব উপাদান :** বিভিন্ন মৌল যেমন— C, H, O, N, P, S ইত্যাদি মাটি এবং বাতাসে অবস্থিত যা নাইট্রেট, ফসফেট এবং সালফেট প্রদান করে, সাথে নানা ট্রেস-এলিমেন্টও উপস্থিত থাকে।

● **জৈব উপাদান :**

**উৎপাদক :** ফাইটোপ্লাঙ্কটন ছাড়া সবুজ শৈবাল ও নানান জলজ উদ্ভিদ যেমন কচুরিপানা, শালুক, পদ্ম, পাতাঝাঁঝি, হাইড্রিলা, শুশনি, ভ্যালিসিনেরিয়া ইত্যাদি মুখ্য উৎপাদক হিসাবে অবস্থান করে।

**খাদক :**

**প্রাথমিক খাদক :** পুকুরের মুখ্য প্রাথমিক খাদকের মধ্যে জুপ্লাঙ্কটন, ছোটমাছ, শাকাহারী বড়মাছ যেমন— রুই, কাতলা ইত্যাদি। এছাড়া কিছু প্রাণী আছে যারা জলের একদম নিচের স্তরে থাকে, প্রায় মাটির কাছাকাছি এরা মূলত মরা পচা খাবার খেতে পছন্দ করে। এদের বেনথস্ বলে। উদাহরণস্বরূপ— শামুক, ঝিনুক, মাগুর, শিংগি জাতীয় মাছ।

**দ্বিতীয় শ্রেণীর খাদক :** ছোট পোকামাকড়, জুপ্লাঙ্কটনদের খায় এবং কিছু ছোট মাছ আছে যারাও প্লাঙ্কটনদের খায়, তাদের দ্বিতীয় শ্রেণীর খাদক বলে।

**তৃতীয় শ্রেণির খাদক :** বৃহৎ মাংসাশী মাছরা, যেমন— বোয়ালমাছ, এরা ছোট মাছদের নিজের খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে থাকে।

**বিয়োজক :** এদের ক্ষুদ্র খাদকও বলা হয়ে থাকে। পুকুরের বাস্তুতন্ত্রে প্রচুর পরিমাণে বিয়োজকের সম্ভার পাওয়া যায়। তার প্রধান কারণ পুকুরের মধ্যে জৈবিক বর্জ্যপদার্থ অনেক বেশি পরিমাণে আসে। এছাড়া বিভিন্ন প্রাণী ও উদ্ভিদের মৃত দেহাবশেষও থাকে। বিভিন্ন ব্যাক্টোরিয়ার সাথে নানা ধরনের ছত্রাক পাওয়া যায়, যেমন— ক্ল্যাডোস্পোরিয়াম, রহিজোপাস প্রভৃতি পুকুরের কাদা বা পাঁক-এর মধ্যে বিয়োজক হিসাবে অবস্থান করে।

### ৩.৪.৩ সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্র (Marine ecosystem)

পৃথিবীর মোট জলভাগের ৯৭% সমুদ্র। স্বাদু জলের বাস্তুতন্ত্রের তুলনায় সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্র অনেক স্থিতিশীল, তার অন্যতম কারণ আর কিছুই না সমুদ্রের লবণাক্ত জল এবং অন্যান্য ভৌত—উপাদান যেমন তাপমাত্রা, দ্রবীভূত অক্সিজেন এবং আলো খুব কম পরিবর্তন হয়।

**জৈবিক উপাদান :** সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্রের জৈবিক উপাদান সমূহ হল।

**উৎপাদক :** এই বাস্তুতন্ত্রের উৎপাদক শ্রেণীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ফাইটো প্ল্যাঙ্কটন, ডায়াটম এবং কিছু আনবিক্ষণিক শৈবালসমূহ। এছাড়াও সামুদ্রিক আগাছা, বাদামি ও লাল শৈবাল। এই উৎপাদক সমুদ্রের বিভিন্ন গভীরতায় বিভক্ত থাকে।

**খাদক :** শাকাহারী যারা সরাসরি উৎপাদককে আহার হিসাবে গ্রহণ করে। যেমন— জু-প্ল্যাঙ্কটন, শামুক ইত্যাদি।

দ্বিতীয় শ্রেণীর খাদক : যারা উপরিউক্ত প্রাথমিক খাদককে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে, যেমন— মাছ (হেরিরং, সার্ডিন, মকরেল ইত্যাদি)।

তৃতীয় শ্রেণীর খাদক : মাংশাসী মাছ যারা দ্বিতীয় শ্রেণীর খাদকদের খায়, যেমন— কর্ড হালিবুট এরাই খাদ্য শৃঙ্খলের সর্বোচ্চ স্থান অধিকারী।

বিয়োজক : আনুবীক্ষণিক জীব যারা মৃত জৈবিক বস্তুর পচনের কাজে অংশগ্রহণ করে তাদের বিয়োজক বলে। সাধারণত সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্রে ব্যাক্টেরিয়া বিয়োজক হিসাবে মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

## ৩.৫ বায়োম (Biome)

কোন নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলের বাস্তুতন্ত্রের সমষ্টিকে বায়োম বলে। জলবায়ুর প্রকৃতি একটি নির্দিষ্ট বায়োমে বসবাসকারী উদ্ভিদ ও প্রাণী গোষ্ঠীর প্রজাতি এবং বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে। অবস্থানের ভিত্তিতে বায়োমকে মুখ্য দুই ভাগে ভাগ করা হয়— স্থলজ বায়োম (Terrestrial Biome) ও জলজ বায়োম (Aqatic Biome)। স্থলজ বায়োমের শ্রেণীভেদ— সরলবর্গীয় বনভূমি (Coniferous Forest); পর্ণমোচী বনভূমি (Deciduous Forest); তৃণভূমি (Grassland); সাভানা (Savana); হিমালয় এবং মরুভূমির বায়োম (Desert Biome)। জলজ বায়োম তিনপ্রকার— স্বাদু জলের (Freshwater biome), ঈষৎ লবণাক্ত (ভেড়ি-অঞ্চল) (Estuarine Biome) এবং সামুদ্রিক বায়োম (Marine Biome)।

## ৩.৬ বাস্তুতন্ত্রের উপাদান (Componets of Ecosystem)

বাস্তুতন্ত্রের কার্যকারিতার উপর ভিত্তি করে বিজ্ঞানী ওডাম (1966) বাস্তুতন্ত্রের উপাদানসমূহকে প্রধান দুইভাগে ভাগ করেন। এরা যথাক্রমে—

১। কার্যভিত্তিক উপাদান

২। সাংগঠনিক উপাদান

আবার গঠনগতভাবে বাস্তুতন্ত্রের উপাদানসমূহকে নিম্নলিখিত উপায়ে ভাগ করা যায়—

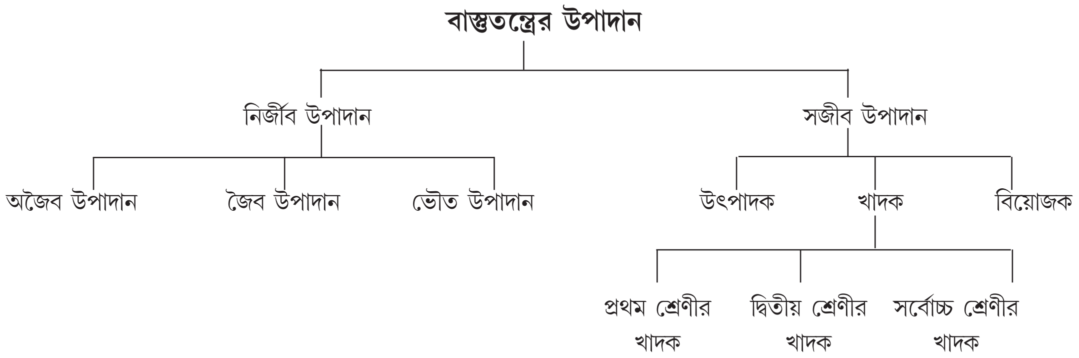


### ৩.৬.১ কার্যভিত্তিক উপাদান

**স্বভোজী উপাদান :** যেসকল জীব নিজেদের খাদ্য নিজেরাই উৎপন্ন করতে পারে তাদের স্বভোজী উপাদান বলে। কয়েকটি প্রাণী (যেমন— ইউগ্লিনা) ছাড়া ক্লোরোফিল যুক্ত সকল উদ্ভিদেরই এই ক্ষমতা বর্তমান। ক্লোরোফিল বায়ু থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড ($CO_2$) গ্রহণ করে এবং সূর্যালোক ও মূলরোম দ্বারা শোষিত জলের সাহায্যে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় জটিল শর্করা খাদ্য তৈরি করে।

$$6CO_2 + 12H_2O = C_6H_{12}O_6 + 6O_2 + 6H_2O + \text{তাপশক্তি।}$$

গ্লুকোজ ($C_6H_{12}O_6$) ছাড়াও প্রোটিন, অ্যামাইনো অ্যাসিড ইত্যাদি প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহও সংশ্লেষিত হয়। অর্থাৎ, পৃথিবীর সকল উদ্ভিদই বাস্তুতন্ত্রের উৎপাদক।

**পরভোজী উপাদান :** যে সকল জীব নিজের খাদ্য নিজেরা তৈরি করতে পারে না, পরন্তু খাদ্যের জন্য অন্যের উপর নির্ভরশীল তাদের পরভোজী বলে। কিছু ক্লোরোফিল বিহীন উদ্ভিদ এবং সকল প্রাণী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উৎপাদকের উপর খাদ্যের জন্য নির্ভরশীল।

### ৩.৬.২ সাংগঠনিক উপাদান

**নির্জীব উপাদান :** পরিবেশের সকল জড় উপাদান এর অন্তর্গত। এই উপাদানসমূহকে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা যায়—

(i) অজৈব উপাদান : জল, মাটি, বিভিন্ন খনিজ লবণ, গ্যাসীয় পদার্থ বাস্তুতন্ত্রের অজৈব উপাদান। সবুজ উদ্ভিদ খাদ্য প্রস্তুতিতে এই সকল উপাদানসমূহকে ব্যবহার করে।

(iii) জৈব উপাদান : মৃত উদ্ভিদ বা প্রাণীর দেহের বিভিন্ন রকম জৈববস্তুর পচনের ফলে উদ্ভুত পদার্থসমূহ, যেমন— প্রোটিন, ফ্যাট, ইউরিয়া, কার্বোহাইড্রেট ইত্যাদি পরিবেশের জৈব উপাদানের অন্তর্গত।

(iii) ভৌত উপাদান : সৌরশক্তি, তাপমাত্রা, বায়ুপ্রবাহ, আলো, আর্দ্রতা ইত্যাদি পরিবেশের ভৌত উপাদান। যে কোনো বাস্তুতন্ত্রের প্রয়োজনীয় শক্তির একমাত্র উৎস সূর্যালোক।

**সজীব উপাদান :** বাস্তুতন্ত্রের সকল জীবই এই উপাদানের অন্তর্গত। এই উপাদানসমূহকে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা যায়—

**উৎপাদক :** যে সকল ক্লোরোফিলযুক্ত জীব সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় তার নিজের দেহে শর্করা জাতীয় খাদ্য প্রস্তুত করতে পারে তাদের উৎপাদক বলে। যেমন— ক্লোরোফিলযুক্ত সবুজ উদ্ভিদ। সকল প্রাণীই জীবনধারণের জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উৎপাদকের উপর নির্ভরশীল।

**খাদক :** যে সকল জীব সালোকসংশ্লেষে অক্ষম এবং খাদ্যের জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উৎপাদকের উপর নির্ভরশীল তাদের খাদক বলে। প্রধানত তিন শ্রেণীর খাদক বাস্তুতন্ত্রে পরিলক্ষিত হয়।

(ক) প্রথম শ্রেণীর খাদক : যে সকল প্রাণী তাদের জীবন ধারণের জন্য সরাসরি উৎপাদকের উপর নির্ভরশীল তাদের প্রথম শ্রেণীর খাদক বলে। যেমন— শামুক, তৃণভোজী মাছ, গোরু, ছাগল, হরিণ ইত্যাদি।

(খ) দ্বিতীয় শ্রেণীর খাদক : যে সকল প্রাণী খাদ্যের জন্য প্রথম শ্রেণীর খাদকের উপর নির্ভরশীল তাদের গৌণ খাদক বা দ্বিতীয় শ্রেণীর খাদক বলে। যেমন— নেকড়ে, বিভিন্ন পতঙ্গভুক পাখি ইত্যাদি।

(গ) সর্বোচ্চ শ্রেণীর খাদক : যে সকল প্রাণী তাদের খাদ্যের জন্য প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর খাদকের উপর নির্ভরশীল তাদের সর্বোচ্চ শ্রেণীর খাদক বলে। যেমন— বাঘ, সিংহ, মানুষ ইত্যাদি।

**বিয়োজক :** যে সকল অণুজীব মৃত উৎপাদক এবং খাদকের দেহাবশেষকে বিয়োজিত করে বাস্তুতন্ত্রে উৎপাদকের পুনঃব্যবহারযোগ্য জৈব বস্তুতে রূপান্তরিত করে তাদের বিয়োজক বলে। যেমন— বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক। বাস্তুতন্ত্র বা ইকোসিস্টেমের বিভিন্ন উপাদানগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নিচে ছকের সাহায্যে দেখানো হলো—

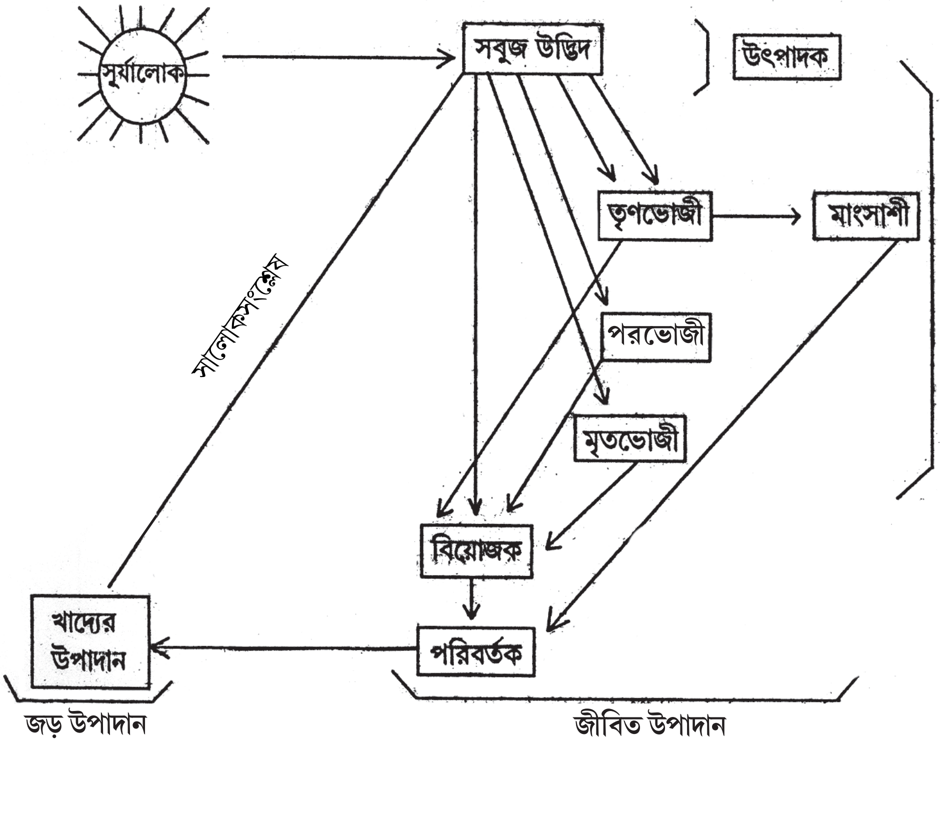

## ৩.৭ ট্রপিক লেভেল, খাদ্যশৃঙ্খল, খাদ্য জালক ও খাদ্য পিরামিড (Trophic level, Food chain, Food web and Food Pyramid)

উদ্ভিদ ও প্রাণীর পারস্পরিক সম্পর্কের কথা জানতে হলে পুষ্টি স্তর, খাদ্যশৃঙ্খল, খাদ্য জালক, খাদ্য পিরামিড ও ইকোসিস্টেমের শক্তিপ্রবাহ প্রভৃতি সম্বন্ধে বিশেষভাবে জ্ঞান আহরণ করা প্রয়োজন।

**ট্রপিক স্তর :** ইকোসিস্টেমের অন্তর্গত কোনো সদস্য জীব খাদ্যশৃঙ্খলের যে খাদ্যস্তরে অবস্থান করে সেই খাদ্যস্তরকে ওই খাদ্যশৃঙ্খলের 'সংরক্ষিত তল' বা 'ট্রপিক লেভেল' বা 'পুষ্টি স্তর' বলে। একটি খাদ্যশৃঙ্খলে দুই বা ততোধিক ট্রপিক লেভেল থাকতে পারে। উৎপাদক (সবুজ উদ্ভিদ) খাদ্যশৃঙ্খলের সূচনা করে, তাই এই স্তরকে ''প্রথম ট্রপিক লেভেল'' বলা হয়।

**খাদ্যশৃঙ্খল :** খাদ্য খাদকের সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে নির্দিষ্ট প্রণালীতে খাদ্যশক্তি উৎপাদকের কাছ থেকে ক্রমপর্যায়ে আরও উন্নত জীবগোষ্ঠীর মধ্যে প্রবাহিত হয়। শক্তি প্রবাহের এই ক্রমিক পর্যায়কে খাদৃশঙ্খল বলে। বিজ্ঞানী ওডামের মতে, ''উৎপাদক কর্তৃক আবদ্ধ শক্তি পরপর বিভিন্ন খাদ্যস্তরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সর্বোচ্চ খাদ্যস্তরে পৌঁছানোর শৃঙ্খলকে খাদ্যশৃঙ্খল বলে।'' উদাহরণস্বরূপ, একটি মিষ্টি জলের খাদ্যশৃঙ্খলের মাধ্যমে শক্তিপ্রবাহ নীচে দেখানো হল।

(উৎপাদক) (প্রথম শ্রেণীর খাদক) (দ্বিতীয় শ্রেণীর খাদক) (তৃতীয় শ্রেণীর খাদক) (চতুর্থ শ্রেণীর খাদক)

উদ্ভিদ, শৈবাল → পতঙ্গ → ব্যাঙ → মাছ → মানুষ

(ফাইট্রোপ্ল্যাঙ্কটন)

বাস্তুতন্ত্রে সাধারণত নিম্নলিখিত তিন প্রকার খাদ্যশৃঙ্খল দেখা যায়। যেমন—

(১) **শিকারী খাদ্যশৃঙ্খল (Predator food chain) :** এই শৃঙ্খল উৎপাদক থেকে শুরু হয় এবং এর পরবর্তী পর্যায়গুলিতে জীবের আকার ক্রমশ বাড়তে থাকে এবং একই সঙ্গে তাদের সংখ্যাও হ্রাস পায়।

উদাহরণ :—

উদ্ভিদ → কীটপতঙ্গ → ব্যাঙ → বাজপাখি

(২) **পরজীবী খাদ্যশৃঙ্খল (Parasitic food chain):** এই শৃঙ্খল বৃহৎ জীব থেকে আরম্ভ হয়ে ক্রমপর্যায়ে ক্ষুদ্র পরজীবীতে শেষ হয়।

উদাহরণ :—

মানুষ → কৃমি → আদ্যপ্রাণী

(৩) **মৃতজীবী খাদ্যশৃঙ্খল (Saprophytic food chain) :** এই শৃঙ্খল মৃতজীবী থেকে আরম্ভ হয়ে ব্যাকটেরিয়াতে শেষ হয়।

উদাহরণ :—

মৃত উদ্ভিদ → ছত্রাক → ব্যাকটেরিয়া

**খাদ্য জালক :**

বাস্তুতন্ত্রের শক্তি ও বস্তু অসংখ্য আন্তঃসম্পর্কযুক্ত খাদ্যশৃঙ্খলের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়। এইভাবে সংযুক্ত খাদ্যশৃঙ্খলগুলিকে খাদ্য জালক বলে। নিম্নে প্রেইরি তৃণভূমির একটি খাদ্য জালক চিত্রসহ দেখানো হল।

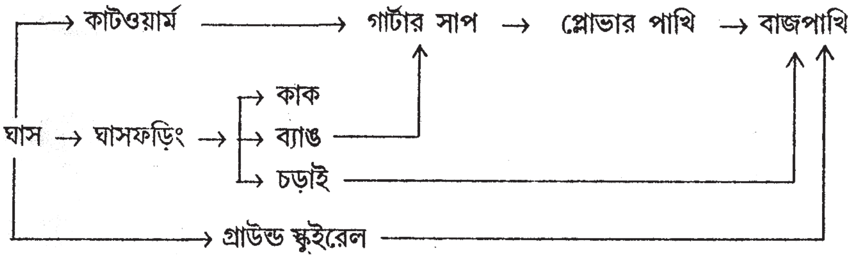


চিত্র ঃ প্রেইরি তৃণভূমির খাদ্য জালক

**খাদ্য পিরামিড :** একটি নির্দিষ্ট বাস্তুতন্ত্রের বিভিন্ন পুষ্টিতন্ত্রের সামগ্রিক গঠনকে অনুক্রমিকভাবে সাজালে যে পিরামিড বা শিখর গঠিত হয় তাকে খাদ্য পিরামিড বলে। ব্রিটিশ ইকোলজিস্ট চার্লস এলটন (1972) সর্বপ্রথম এই পিরামিড সম্পর্কে ধারণা দেন।

(1) সংখ্যা পিরামিড

(2) শক্তির পিরামিড

(3) জীবভর পিরামিড

**(1) সংখ্যা পিরামিড :**

উৎপাদক থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ পর্যায়ের খাদক পর্যন্ত জীবের সংখ্যা ক্রমশ কমতে থাকে এরূপে সৃষ্ট পিরামিডকে সংখ্যা পিরামিড বলে।

নীচে একটি সংখ্যার পিরামিড দেখানো হল—

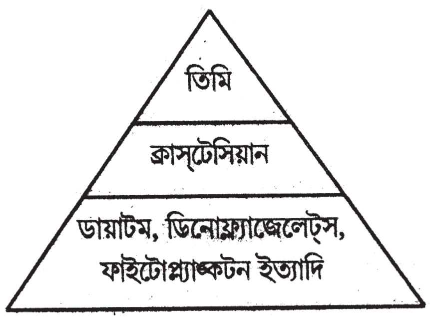


এখানে ডায়াটাম, ডিনোফ্ল্যাজেলেট্‌স ও ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটনের সংখ্যা অনেক বেশি (উৎপাদক)। প্রথম শ্রেণীর খাদক যেমন, ক্রাস্টেসিয়ান-এর সংখ্যা উৎপাদকের সংখ্যা থেকে কম। আবার দ্বিতীয় শ্রেণীর খাদকের (তিমি) সংখ্যা সবথেকে কম।

(2) **শক্তির পিরামিড :**

একটি খাদ্যশৃঙ্খলের প্রতিটি খাদ্যস্তরে (উৎপাদক থেকে সর্বোচ্চ শ্রেণীর খাদক পর্যন্ত) সঞ্চিত শক্তির পরিমাণ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়ে যে পিরামিড সৃষ্টি করে তাকে শক্তির পিরামিড বলে।

একটি শক্তির পিরামিডের চিত্র দেখানো হল—

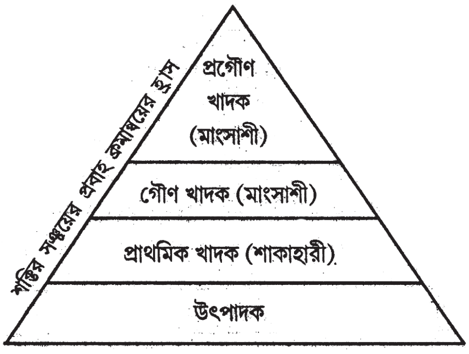


(3) **জীবভর পিরামিড :**

একটি খাদ্যশৃঙ্খলের প্রত্যেক স্তরের সজীব বস্তুর শুষ্ক ওজনকে জীবভর বলে। দেখা যায় উৎপাদকের জীবভর থেকে প্রাথমিক স্তরের খাদকের জীবভর কম হয়, আবার প্রাথমিক থেকে দ্বিতীয় স্তর থেকে তৃতীয় স্তরে জীবভর ক্রমান্বয়ে কমতে থাকে। এইভাবে সৃষ্ট পিরামিডকে জীবভরের পিরামিড বলে। পরজীবীদের ক্ষেত্রে জীবভর পিরামিড বিপরীত মুখী হয়ে থাকে।

নিম্নে জীবভরের পিরামিড দেখানো হল।

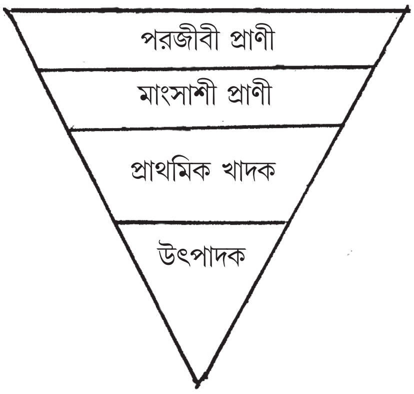


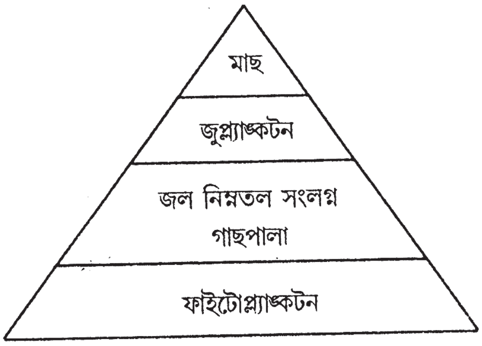


## ৩.৮ বাস্তুতন্ত্রের উৎপাদনশীলতা (Productivity of Ecosystem)

বাস্তুতন্ত্রের প্রথম ট্রপিক স্তরটি উৎপাদক বা সবুজ উদ্ভিদ। সবুজ উদ্ভিদ সূর্যালোকের উপস্থিতিতে এবং পত্রস্থ ক্লোরোফিলের সাহায্যে বায়ুস্থিত অক্সিজেন ও জলের পারস্পরিক বিক্রিয়ায় শর্করা খাদ্য উৎপাদন করে। ফলে বলা যেতে পারে সূর্য রশ্মি শক্তি হিসাবে জীবিত কলায় আত্তীভূত হয় বা শর্করা খাদ্যের মধ্যে স্থিত হয়। যেহেতু উদ্ভিদ শর্করা গঠনের মাধ্যমে সকল শক্তি রাসায়নিক শক্তি হিসাবে সঞ্চিত করে ফলে উৎপন্ন শর্করার পরিমাণ জানা

থাকলে কী পরিমাণ শক্তির আত্তীকরণ হয়েছে তা জানা সম্ভব। একেই **সামগ্রিক প্রাথমিক উৎপাদন** বা Gross Primary Productivity বলে।

এই উৎপাদিত শক্তির বহুলাংশ উদ্ভিদের শ্বসনে ব্যবহৃত হয় সুতরাং পরোক্ষভাবে উদ্ভিদের সকল জৈব পদার্থের পরিমাপের সঙ্গে সঙ্গে **জীবভরের** (Biomass) ওজন পাওয়া যায়। আবার প্রকৃত উৎপাদন বা Net Production হল জীবভর ও শ্বসনে ব্যবহৃত শক্তির বিয়োগফল। গাণিতিক ভাষায়

$Pg - R = Pn$ ; যেখানে $Pg$ = সামগ্রিক উৎপাদন,

বা $Pg = Pn + R$ ; $Pn$ = প্রকৃত উৎপাদন

$R$ = শ্বসনে নিমিত্ত শক্তির ব্যয়।

অর্থাৎ, নির্দিষ্ট সময়ে স্থিতিশক্তির বৃদ্ধিকেই প্রকৃত উৎপাদন এবং যে-কোনো সময়ের সামগ্রিক শক্তির উৎপাদনকে জীবভর বলে। এই গাণিতিক সূত্রে $Pg = R$ হয় তবে শক্তির হারের তারতম্য হয় না। আবার $Pg > R$ হলে জীবভর হ্রাস পায়। একইভাবে $Pg < R$ হলে জীবভরের ওজন বৃদ্ধি পায়।

## ৩.৯ বাস্তুতন্ত্রে শক্তি প্রবাহ (Energy flow in Ecosystem)

একটি বাস্তুতন্ত্রে উপস্থিত সজীব এবং নির্জীব উপাদানের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক বর্তমান। সকল সজীব বস্তু সৌরক্তিকে কাজে লাগায়। উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষ পদ্ধতিতে সৌরশক্তিকে রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে এবং বিপাকীয় কার্যে এই রাসায়নিক শক্তি যান্ত্রিক অথবা তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। আবার একই বাস্তুতন্ত্রে বর্তমান খাদ্য এবং খাদক পরস্পরের সঙ্গে খাদ্যশৃঙ্খল তৈরি করে। উৎপাদক সৃষ্ট শক্তি খাদ্যশৃঙ্খলের মাধ্যমে নিম্নতম খাদ্যস্তর উচ্চতর খাদ্যস্তরের দিকে প্রবাহিত হয়। ফলে শক্তিপ্রবাহের সংজ্ঞা হিসাবে আমরা বলতে পারি, ‘‘শক্তির অবস্থান্তর ও খাদ্যশৃঙ্খলের বিভিন্ন ট্রপিক স্তরের জীবের মধ্যে দিয়ে এক ধারাবাহিক পরিচালনকে শক্তিপ্রবাহ বলে।’’

বাস্তুতন্ত্রের শক্তির প্রবহন সম্পর্কে সম্যক অনুধাবন করতে হলে তাপগতিবিদ্যার প্রথম ও দ্বিতীয় সূত্র সম্বন্ধে বিশেষভাবে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

### ৩.৯.১ তাপ গতিবিদ্যার সূত্রদ্বয়

**প্রথম সূত্র :** শক্তির সৃষ্টি বা বিনাশ হয় না। শুধুমাত্র এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় শক্তির পরিবর্তন ঘটে।

**দ্বিতীয় সূত্র :** যখন শক্তির স্থানান্তর বা অবস্থান্তর ঘটে তখন শক্তির কিছু অংশ এমন অবস্থায় পৌঁছায় যে এটি পরবর্তী পর্যায়ে প্রবাহিত হতে পারে না।

একটি বাস্তুতন্ত্রে সৌরশক্তি থেকে উদ্ভিদের দেহে রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হওয়া তাপ গতিবিদ্যার প্রথম সূত্রকে অনুসরণ করে। আবার বিভিন্ন খাদক স্তরে রূপান্তরিত হওয়ার সময় যে শক্তি হ্রাস পায়, তা তাপ গতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়।

### ৩.৯.২ শক্তিপ্রবাহের পর্যায়

বাস্তুতন্ত্রে রূপান্তরিত সৌরশক্তি উৎপাদক থেকে তিনটি পর্যায়ে খাদকের দেহে স্থানান্তরিত হয়। যেমন—

(i) **শক্তি অর্জন :** বাস্তুতন্ত্রে শক্তির মূল উৎস হল সূর্যালোক। সবুজ উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় সৌরশক্তি গ্রহণ করে তাকে রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে। এই শক্তি উৎপন্ন খাদ্যের মধ্যে স্থিতিশক্তিরূপে আবদ্ধ থাকে। সেজন্য এই পর্যায়কে শক্তি অর্জন পর্যায় বলে। সূর্য থেকে আপতিত সৌরশক্তির মাত্র 0.2 শতাংশ উৎপাদক সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় সংশ্লেষিত খাদ্যে আবদ্ধ করতে পারে।

(ii) **শক্তির ব্যবহার :** উৎপাদকের সংশ্লেষিত খাদ্যে যে পরিমাণ শক্তি আবদ্ধ হয় তার কিছু অংশ তারা নিজের শারীরবৃত্তীয় কাজে ব্যবহার করে। কিছু অংশ অপাচ্য ও রেচন পদার্থরূপে পরিবেশে পরিত্যক্ত হয়। অবশিষ্টাংশ, প্রাণীরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে গ্রহণ করে খাদ্যস্থ স্থিতি শক্তিকে শ্বসন প্রক্রিয়ার সাহায্যে গতিশক্তিতে রূপান্তরিত করে এবং বিভিন্ন জৈবনিক কাজগুলি সম্পন্ন করে।

(iii) **শক্তি স্থানান্তকরণ :** উৎপাদক থেকে শক্তি প্রথম শ্রেণীর খাদকের এবং পর্যায়ক্রমিক দ্বিতীয় শ্রেণীর ও তৃতীয় শ্রেণীর খাদকের দেহে প্রবাহিত বা স্থানান্তরিত হয়। সর্বোপরি বিয়োজক মৃত খাদক সমূহকে বিশ্লিষ্ট করে পুনরায় পরিবেশে ফিরিয়ে দেয়।

**৩.৯.৩ শক্তিপ্রবাহের মডেল**

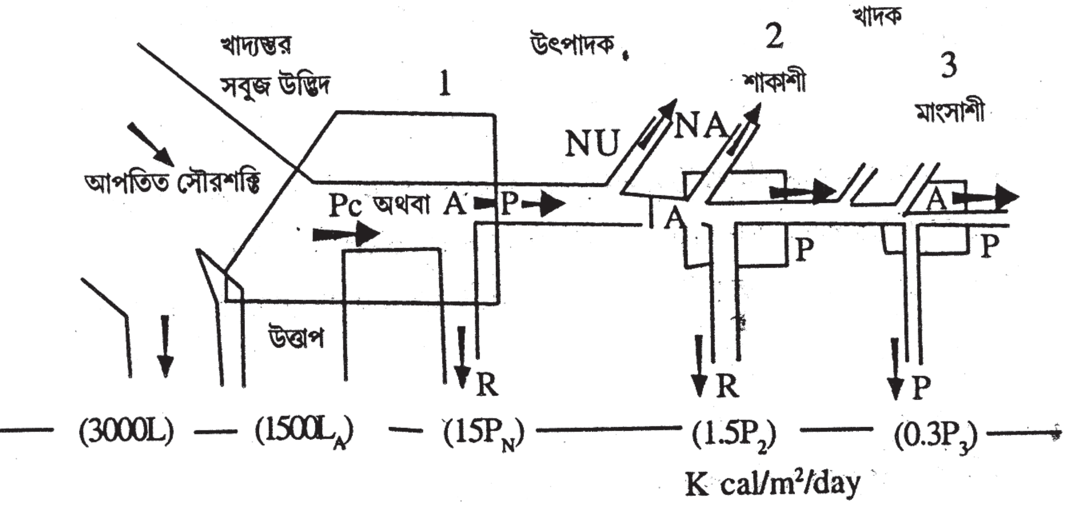


উপরের চিত্রে তিনটি বাক্স (1, 2 এবং 3) তিনটি পর্যায়ক্রমিক খাদ্যস্তরকে নির্দেশ করে এবং পাইপ লাইনটি শক্তি প্রবহনের খাদ্যস্তরে প্রবেশ এবং খাদ্যস্তর থেকে নিষ্ক্রমণকে নির্দেশ করে। প্রতিটি খাদ্যস্তরের জীবসমূহ তার পূর্ববর্তী খাদ্যস্তর থেকে শক্তি গ্রহণ করে এবং এই গৃহীত শক্তির বেশিরভাগই শারীরবৃত্তীয় কাজে ব্যবহার করে। বেশ কিছু পরিমাণ শক্তি অব্যবহৃত থাকে এবং বাকি পরিমাণ নিজ দেহে আত্তীকরণ হয়। অর্থাৎ, শক্তির অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী প্রবহনে শক্তির পরিমাণ হ্রাস পায়, যা তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রকে সমর্থন করে। উপরিঅঙ্কিত মডেল অনুসারে 3000 কিলো ক্যালোরি সৌরশক্তি সবুজ উদ্ভিদের উপর আপতিত হয় কিন্তু সবুজ উদ্ভিদ মাত্র 1500 কিলো ক্যালোরি শক্তি শোষণ করে, যার মধ্যে মাত্র 1.5 কিলো ক্যালোরি প্রথম শ্রেণির খাদকে পরিবর্তিত হয়। সুতরাং প্রকৃত উৎপাদন 1.5 কিলো ক্যালোরি এবং শেষ খাদ্যস্তরে সামগ্রিক শক্তি তার মাত্র 10%। অর্থাৎ প্রতিটি খাদ্যস্তরে শক্তির পরিমাণ পর্যায়ক্রমিকভাবে হ্রাস পায়।

### ৩.৯.৪ শক্তিপ্রবাহের বৈশিষ্ট্য

একটি বাস্তুতন্ত্রে শক্তির প্রবহনের বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ—

- বাস্তুতন্ত্রের সমগ্র শক্তির উৎস হল সৌরশক্তি।
- শক্তিপ্রবাহ তাপগতিবিদ্যার প্রথম ও দ্বিতীয় সূত্রকে মেনে চলে।
- বাস্তুতন্ত্রে শক্তির প্রবাহ সর্বদাই একমুখী।

উৎপাদক থেকে সর্বোচ্চ শ্রেণির খাদক পর্যন্ত প্রতিটি খাদ্যস্তরে শক্তির পরিমাণ ক্রমশ হ্রাস পায়।

## ৩.১০ পুষ্টি চক্র (Nutrient Cycle)

পদার্থের সংরক্ষণ সূত্র অনুযায়ী কোনো পদার্থকেই সৃষ্টি বা ধ্বংস করা যায় না। স্বাভাবিকভাবেই প্রকৃতিস্থ কার্বন এবং নাইট্রোজেন সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্নবার ব্যবহৃত হয়। বহিঃজগত থেকে বিশাল পরিমাণ পদার্থ কখনই পৃথিবীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে না, বা পৃথিবী থেকে ওই পদার্থ বহিঃজগতে গমন করে না। কার্বন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, ফসফরাস, সালফার প্রভৃতি প্রোটোপ্লাজমের বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য মৌলিক উপাদান। এই উপাদানসমূহ সর্বদাই চক্রাকারে প্রকৃতিস্থ বিভিন্ন পদার্থের মধ্য দিয়ে আবর্তিত হয়।

### ৩.১০.১ সংজ্ঞা

প্রোটোপ্লাজমের প্রধানতম রাসায়নিক উপাদানসমূহ জীবমণ্ডলে নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যযুক্ত পথে পরিবেশ থেকে জীবে এবং জীব থেকে পরিবেশে চক্রাকারে আবর্তিত হয়। বিভিন্ন রাসায়নিক উপাদানের এই চক্রগুলিকে জীব-ভূ-রাসায়নিক চক্র (Bio-geochemical cycle) বলে। জীবের এই সকল উপাদান এবং যৌগের চক্রকে পুষ্টিচক্রও (Nutrient cycle) বলে।

### ৩.১০.২ বিভিন্ন পুষ্টি চক্র

প্রকৃতির রাসায়নিক চক্রগুলির মধ্যে কার্বন চক্র, নাইট্রোজেন চক্র, অক্সিজেন চক্র, ফসফরাস চক্র, সালফার চক্র বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নিম্নে কার্বন চক্র এবং নাইট্রোজেন চক্র আলোচনা করা হল।

#### ৩.১০.২.১ কার্বন চক্র

বিভিন্ন রাসায়নিক পুষ্টি চক্রের মধ্যে কার্বন চক্রই সর্বাধিক সরল। উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষের প্রধানতম উপাদান হল কার্বন। প্রকৃতির কার্বনের বহুলাংশই সমুদ্রে বাই-কার্বনেট হিসাবে সঞ্চিত থাকলেও এই কার্বনের ভাণ্ডারই বায়ুর কার্বনের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে। সর্বোপরি কার্বন চক্রটি জীব ও বায়ুস্থিত কার্বনের মধ্যেই আবর্তিত হয়।

একটি বাস্তুতন্ত্রে কার্বন, কার্বন-ডাই-অক্সাইড রূপে উৎপাদক (সবুজ উদ্ভিদ) দ্বারা শোষিত হয়। অতঃপর উৎপাদক থেকে প্রথম স্তরের খাদক, প্রথম স্তরের খাদক থেকে দ্বিতীয় স্তরের খাদক এবং সেখান থেকে সর্বোচ্চ স্তরের খাদকের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। সবশেষে এই সকল খাদক বিয়োজক দ্বারা বিয়োজিত হয়ে কার্বনরূপে পুনরায় বায়ুতে ফিরে যায়। অর্থাৎ, বায়ুস্থিত কার্বন—উৎপাদক— খাদক—বিয়োজক—বায়ু এইভাবে চক্রটি সম্পন্ন হয়।

উৎপাদক ছাড়াও সমুদ্রের জল, প্রস্তরখণ্ড, চুনাপাথর, শিলা প্রভৃতি বায়ুর কার্বন-ডাই-অক্সাইড শোষণ করে বিভিন্ন ধাতব কার্বনেট গঠন করে। এ ছাড়াও কয়লা ও পেট্রোলিয়াম জাত দ্রব্যের দহন ও ভূগর্ভস্থ কয়েক প্রকার জীবাণুর শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়ার ফলে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। আগ্নেয়গিরি ও উষ্ণ প্রস্রবণ থেকেও কার্বন ডাইঅক্সাইড নির্গত হয়।

কার্বন ডাইঅক্সাইডের জলজ পর্যায় অধঃক্ষেপ পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয়। কার্বন ডাইঅক্সাইড জলের সঙ্গে বিক্রিয়ায় কার্বনিক অ্যাসিড ($H_2CO_3$) উৎপন্ন করে। বিক্রিয়াটি সর্বদা বিপরীতমুখী হওয়ার জন্য কার্বনিক অ্যাসিড ওই বিপরীতমুখী বিক্রিয়ায় $H^+$ এবং $CH_3^-$ আয়নে ভেঙে যায়। বিক্রিয়ার সমীকরণটি নিম্নরূপ—

$$CO_2 + H_2O \rightarrow H_2CO_3 \rightarrow H^+ + HCO_3^-$$

(কার্বনিক অ্যাসিড)

$$HCO_3^- \rightarrow 2H^+ + CO_3^-$$

(বাইকার্বনেট) (কার্বনেট)

নিম্নের চিত্রে একটি বাস্তুতন্ত্রের কার্বন চক্র দেখানো হল—

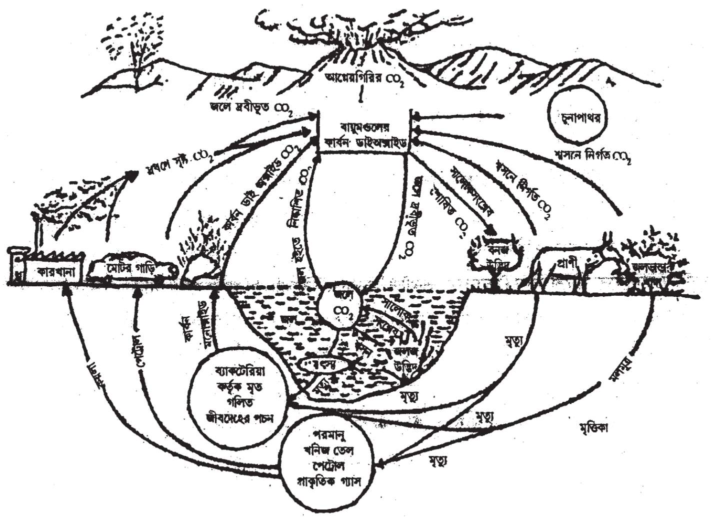


চিত্র : প্রকৃতিতে কার্বন চক্র

### ৩.১০.২.২ নাইট্রোজেন চক্র

জীবদেহের অন্যতম প্রধান সংগঠক বস্তুটি হল প্রোটিন। এই প্রোটিন হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন এবং কার্বন ঘটিত পদার্থ। কাজেই বলা যেতে পারে নাইট্রোজেন জীবদেহের অন্যতম প্রধান উপাদান। বায়ুমণ্ডলে শতকরা 78 ভাগ নাইট্রোজেন থাকা সত্ত্বেও উদ্ভিদ তা প্রত্যক্ষভাবে গ্রহণ করতে পারে না। উদ্ভিদরা মাটিতে অবস্থিত, দ্রব্যে নাইট্রেট থেকে নাইট্রোজেন গ্রহণ করে প্রোটিনে রূপান্তরিত করে অথবা শিম্বজাতীয় কয়েকটি উদ্ভিদ তাদের মূলে অবস্থিত কতগুলি মিথোজীবী ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে প্রত্যক্ষভাবে নাইট্রোজেনকে মৃত্তিকাস্থিত করে।

প্রকৃতিস্থ নাইট্রোজেন পারমাণবিক অবস্থায় অ্যামোনিয়ায় আবদ্ধ হয়। অতঃপর এই অ্যামোনিয়া এবং নাইট্রেট বৃষ্টির জলের মাধ্যমে মাটিতে নেমে আসে এবং সেখানে মিশ্রিত হয়। এই মিশ্রিত অ্যামোনিয়া উচ্চ শ্রেণির উদ্ভিদ দ্বারা অ্যামোনিয়া আয়ন ($NH_4^-$) হিসাবে শোষিত হতে পারে। অন্য পদ্ধতিতে কিছু ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক এবং নীলাভ সবুজ শৈবাল বায়ুস্থিত নাইট্রোজনকে নিঃসারিত করে এবং হাইড্রোজেনের সঙ্গে এর বিক্রিয়ায় অ্যামোনিয়া উৎপন্ন হয়।

মৃত্তিকাস্থিত অ্যামোনিয়া জল ও কয়েকটি রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শে এলে অ্যামোনিয়া ঘটিত লবণে পরিণত হয় বা এই অ্যামোনিয়া মৃত্তিকাস্থিত কয়েকটি ব্যাকটেরিয়ার (নাইট্রোসোমোনাস) প্রভাবে জারি হয়ে নাইট্রেটে পরিণত হয়।

নাইট্রোসোমোনাস

$$2NH_3 + 3O_2 \rightarrow 2NO_2 + 2H_2O + 2H^+$$

(নাইট্রাইট)

অতঃপর এই নাইট্রাইট নাইট্রোব্যাক্টর নামক অপর একটি ব্যাকটেরিয়া প্রভাবে নাইট্রেটে পরিণত হয়—

নাইট্রোব্যাক্টর

$$2NO_3^- + O_2 \longrightarrow 2NO_3^+$$

(নাইট্রেট)

এই দুইটি বিক্রিয়াই অক্সিজেনের উপস্থিতিতে ঘটে থাকে এবং এই ঘটনাকে নাইট্রিফিকেশন (Nitrification) বলে। স্বভোজী উদ্ভিদসমূহ এই নাইট্রেট গ্রহণ করে এবং খাদ্যশৃঙ্খলের সূচনা হয়। আবার যে পদ্ধতিতে নাইট্রেট বিশ্লিষ্ট হয় তাকে ডি-নাইট্রিফিকেশন (Denitrification) বলে। রাইজোবিয়াম নামক একপ্রকার ব্যাকটেরিয়া বসবাস করে। এই ব্যাকটেরিয়াগুলি প্রত্যক্ষভাবে মৃত্তিকাস্থিত নাইট্রোজেন গ্রহণ করে তাকে নাইট্রেটে পরিণত করে উদ্ভিদকে সরবরাহ করে থাকে। সাধারণত নাইট্রোজেন নাইট্রেটে পরিবর্তিত হবার পর উদ্ভিদ দ্বারা শোষিত হয়। প্রাণী এবং উদ্ভিদের মৃত্যুর পর তাদের দেহস্থিত প্রোটিন মাটিতে মিশে যায়। আবার প্রাণীর মলমূত্র বিশ্লেষিত হয়ে অ্যামোনিয়া গঠিত হয়। এই অ্যামোনিয়া মৃত্তিকায় অবস্থিত নাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়ার (নাইট্রোসোমোনাস ও নাইট্রোকক্কাস) সাহায্যে আবার নাইট্রেট লবণে পরিণত হয়। এই নাইট্রেটের কিছুটা উদ্ভিদ আত্মসাৎ করে এবং কিয়দংশ ডিনাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়া (থায়োব্যাসিলাস, মাইক্রোকক্কা) দ্বারা মুক্ত নাইট্রোজেনে পরিণত হয়ে বায়ুমণ্ডলে ফিরে যায়।

এই প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াগুলির ফলে প্রকৃতিস্থ নাইট্রোজেন বায়ুমণ্ডল থেকে মাটিতে, মাটি থেকে উদ্ভিদে, উদ্ভিদ থেকে প্রাণীদেহে এবং সর্বোপরি উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহ থেকে পুনরায় মাটিতে এবং মাটি থেকে বায়ুমণ্ডলে ফিরে আসে। এই স্বতঃনিয়ন্ত্রিত প্রক্রিয়াকে নাইট্রোজেন চক্র বলে।

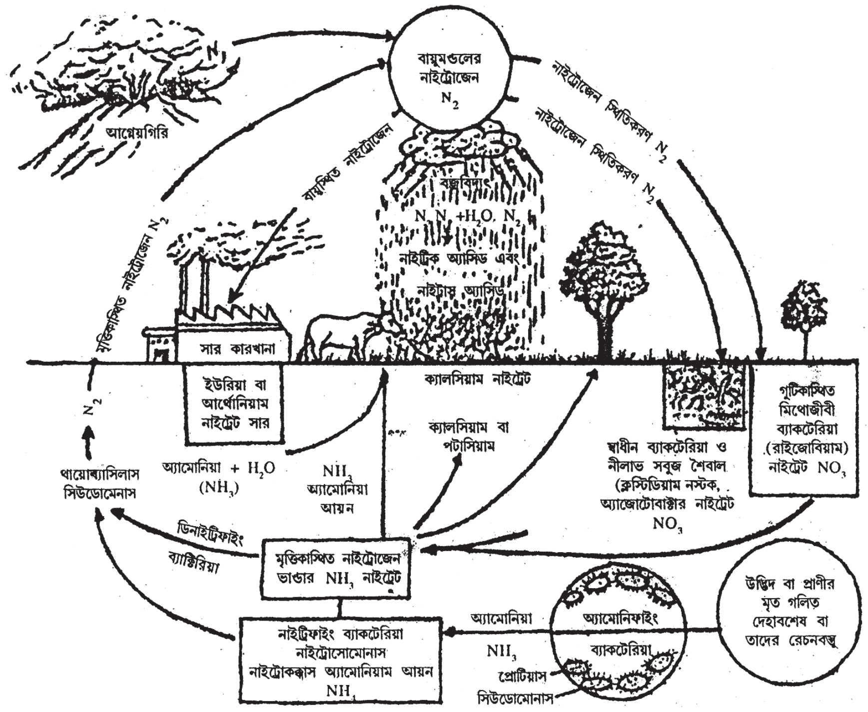


চিত্র : প্রকৃতিতে নাইট্রোজেন চক্র

## ৩.১১ অনুশীলনী

**সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করুন :**

(১) বাস্তুতন্ত্রের শক্তি প্রবাহ

(i) একমুখী (ii) দ্বিমুখী (iii) বহুমুখী (iv) কোনটি নয়

(২) Ecology শব্দটি কে প্রবর্তন করেন?

(i) এ জি ট্যান্সলি (ii) আরনেস্ট হেকেল (iii) ওডাম (iv) ওয়েবস্টার

(৩) বাস্তুতন্ত্রের শক্তি পিরামিড সবসময়—

(i) খাড়া (ii) উল্টানো (iii) কখনো খাড়া কখনো উল্টানো (iv) একটিও নয়

(৪) পরজীবীদের ক্ষেত্রে জীবভর পিরামিড

(i) খাড়া (ii) উল্টানো (iii) কখনো খাড়া কখনো উল্টানো (iv) একটিও নয়

(৫) MAB বলতে বোঝায়

(i) Man and bacteria (ii) Man and Biosphere (iii) Man and biology (iv) Man and Biotic Community

(৬) বাস্তুতন্ত্র তৈরি হয়—

(i) জৈব উপাদান দ্বারা (ii) অজৈব উপাদান দ্বারা (iii) জৈব ও অজৈব উপাদান দ্বারা (iv) স্বভোজী জীব দ্বারা

(৭) বাস্তুতন্ত্রের একটি স্তর থেকে আর একটি স্তরে শক্তির সরবাহ হয়—

(i) ৯০% (ii) ১০০% (iii) ১০% (iv) ১%

(৮) কোনটি সঠিক—

(i) শেয়াল > বাঘ > সিউডোমোনাস > ঘাস > খরগোস

(ii) ঘাস > সিউডোমোনাস > খরগোস > শেয়াল > বাঘ

(iii) ঘাস > শেয়াল > সিউডোমোনাস > খরগোস > বাঘ

(iv) ঘাস > খরগোস > শেয়াল > বাঘ > সিউডোমোনাস

(৯) সমুদ্রের মুখ্য উৎপাদক

(i) জুপ্লাঙ্কটন (ii) ফাইটোপ্লাঙ্কটন (iii) নেকটন (iv) কচুরিপানা

(১০) বাস্তুতন্ত্রে শক্তির উৎস

(i) তাপশক্তি (ii) সৌরশক্তি (iii) ভূতাপ শক্তি (iv) ATP

**অতিসংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্ন :**

(১) বাস্তুতন্ত্র কাকে বলে? এই শব্দটি কে প্রণয়ন করেন?

(২) বায়োম কাকে বলে? উদাহরণ দিন।

(৩) সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্রের মুখ্য উৎপাদকগুলির নাম লিখুন।

(৪) পৌষ্টিক স্তর কাকে বলে?

(৫) সর্বভূক কাদের বলে? উদাহরণ দিন।

**সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্ন :**

(১) বাস্তুতন্ত্রের বিভিন্ন উপাদানগুলি উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা করুন।

(২) খাদ্য শৃঙ্খল ও খাদ্য জাল কাকে বলে উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা করুন।

(৩) বাস্তুতন্ত্রের খাদ্য প্রবাহ তাপগতিবিদ্যার নিয়মানুসারে চলে—আলোচনা করুন।

(৪) বাস্তুতান্ত্রিক পিরামিড কি? বিভিন্ন ধরনের পিরামিড সম্পর্কে আলোচনা করুন।

(৫) নাইট্রোজেন চক্র কাকে বলে, বর্ণনা দিন।

**উত্তর সংকেত**

**নির্বাচন ভিত্তিক প্রশ্ন :**

(১) (i) একমুখী (২) (ii) আরনেস্ট হেকেল (৩) (i) খাড়া

(৪) (ii) উল্টানো (৫) (ii) Man and Biosphere (৬) (iii) জৈব ও অজৈব উপাদান দ্বারা

(৭) (iii) ১০০% (৮) (iv) ঘাস > খরগোস > শেয়াল > বাঘ > পিউডোমোনাস

(৯) (ii) ফাইটোপ্লাস্কটন (১০) (ii) সৌরশক্তি

# একক ৪ ❑ জীববৈচিত্র্য ও তার সংরক্ষণ (Biodiversity and its conservation)

গঠন

৪.০ উদ্দেশ্য

৪.১ প্রস্তাবনা

৪.২ জীব বৈচিত্র্যের প্রকারভেদ (Types of Biodiversity)

৪.৩ বিশ্ব-জীববৈচিত্র্য (Global Biodiversity)

৪.৪ বিভিন্নতার স্থানিক মাপকাঠি (Spatial Scales of Diversity)

৪.৫ ভারতের জীব-ভৌগোলিক শ্রেণিবিন্যাস (Biogeological Classification of India)

৪.৬ জীববৈচিত্র্যের গুরুত্ব (Values of Biodiversity)

৪.৭ জীববৈচিত্র্য-ধন্য অঞ্চল (Biodiversity Hotspots)

৪.৮ বৃহৎ জীববৈচিত্র্যপূর্ণ দেশ (Mega Biodiversity Nation)

৪.৯ জীববৈচিত্র্যের সংকট (Threats to Biodiversity)

৪.১০ ভারতের সংকটাপন্ন ও আঞ্চলিক প্রজাতির জীব (Threatened and Endemic species of India)

৪.১১ জীববৈচিত্র্যের সংরক্ষণ : ইন-সিটু ও এক্স-সিটু (Conservation of Biodiverity: In-Situ & Ex-Situ)

৪.১২ বাস্তুসংস্থান পরিষেবা (Ecosystem Services)

৪.১৩ অনুশীলনী

## ৪.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানতে পারবেন।

- জীববৈচিত্র্য কাকে বলে এবং বিভিন্ন প্রকার জীববৈচিত্র্য।
- বিশ্বজীব বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতর স্থানিক মাপকাঠি।
- আমাদের ভারতবর্ষের জীব-ভৌগোলিক শ্রেণীবিন্যাস।
- জীববৈচিত্র্যের গুরুত্ব এবং সংকট।
- ভারতের সংকটাপন্ন ও আঞ্চলিক প্রজাতির জীবের তালিকা।
- ইন-সিটু ও এক্স-সিটু পদ্ধতিতে জীববৈচিত্র্যের সংরক্ষণ।

## ৪.১ প্রস্তাবনা

১৯৬৮ সালে প্রখ্যাত বিজ্ঞানী 'রেমন্ড-এফ-ডাসম্যান' (Raymond F. Dasmen) তার লেখা বই "A different kind of country" তে সর্বপ্রথম জীববৈচিত্র্য (Biodiversity) শব্দটির ব্যবহার করেন। জীববৈচিত্র্য শব্দটির উদ্ভব হয় "জীবজগতের বৈচিত্র্য থেকে", কথাটি W. G. Robsen, ১৯৮৫ সালে National Forum on Biological Diversity-তে বলেন। কিন্তু উইলসন (E. O. Wilson) ১৯৮৮ সালে একটি পুস্তিকায় জীববৈচিত্র্যের সম্পর্কে বিস্তৃত বর্ণনা করেন। শব্দটির বীজ নিহীত ছিল চার্লস ডারউইনের 'প্রাকৃতিক নির্বাচনবাদ তত্ত্বে' (১৮৫৯)। তিনি বিশ্বাস করতেন রূপভেদ অমূলক বা অকারণ নয়, জীব বিবর্তনের মাধ্যমে নানা রূপভেদ পরিবর্তিত হয়। আনুমানিক পাঁচ কোটিরও বেশি জীবকূল পৃথিবীতে বিদ্যমান। একমাত্র পৃথিবীতেই সৌরজগতের মধ্যে প্রাণের অস্তিত্ব আছে। তার একমাত্র কারণ সূর্য থেকে সঠিক দূরত্ব বজায় থাকার জন্য, যার ফলস্বরূপ গড় তাপমাত্রা ১৫°c এবং বায়ুমণ্ডলের উপস্থিতির ফলে ক্ষতিকারক আলোকরশ্মি যেমন— মহাজাগতিক রশ্মি, অতিবেগুনী রশ্মি প্রভৃতি পৃথিবীতে আসতে পারে না তার ফলে জীবকূল বিনষ্ট হয় না। সর্বসাকুল্যে পর্যাপ্ত সূর্যালোক, জলবায়ু সৃষ্টির সঠিক উপস্থিতির জন্য পৃথিবী প্রাণের বিকাশের জন্য উপযুক্ত হয়ে উঠেছে।

**জীববৈচিত্র্য কী?** পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের সঞ্চার হয় আনুমানিক ৩.৭ শতকোটি বছর আগে। তার পর থেকে নানা অভিযোজন ও বিবর্তনের মাধ্যমে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যধারী জীবের সৃষ্টি হয়েছে। একটি বাস্তুতন্ত্রের মধ্যে বিভিন্ন জীব ও প্রজাতির মধ্যে যে বৈচিত্র্যের পার্থক্য লক্ষ করা যায় তাকে ঐ বাস্তুতন্ত্রের জীববৈচিত্র্য বলা হয়। রিও-ডি-জেনিরোতে (১৯৯২) সালে অনুষ্ঠিত বিশ্বজাতী সম্মেলনে জীব বৈচিত্র্যকে সংজ্ঞায়িত করা হয় এবং বলা হয় ভূ-ভাগ, সমুদ্র ও অন্যান্য জলভাগের বাস্তুতন্ত্রের মধ্যে অবস্থানকারী জীবিত প্রাণী বা উদ্ভিদের যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় তাকে জীববৈচিত্র্য বলা হয়।

## ৪.২ জীব বৈচিত্র্যের প্রকারভেদ (Types of Biodiversity)

জীববৈচিত্র্য প্রধানত তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত। যেমন— (১) প্রজাতিজনিত বৈচিত্র্য (Species Diversity) (২) জিন জনিত পার্থক্যের কারণে সৃষ্টি বৈচিত্র্য (Genetic Diversity) (৩) বাস্তুতন্ত্র জনিত বৈচিত্র্য (Ecosystem Diversity)।

(১) **প্রজাতিজনিত বৈচিত্র্য (Species Diversity) :** জীবের শারীরিক বৈশিষ্ট্যগুলির বা ফেনোটাইপিক চরিত্রগুলির মধ্যে বিভিন্নতাকে প্রজাতিজনিত বৈচিত্র্য বলা হয়। চরিত্রগুলি হল অঙ্গস্থানিক, শারীরবৃত্তীয়, জৈব রাসায়নিক বা স্বভাবগত। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় সমগ্র বিশ্বে মোট প্রায় ৬১০০ ধরনের মাছের প্রজাতি আছে।

(২) **জিনগত বৈচিত্র্য (Genetic Diversity) :** সামান্যতম জিনের সংগঠনের পার্থক্যের কারণে একই প্রজাতির ভিন্ন সদস্যের মধ্যে বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। যেমন একটি প্রজাতির মধ্যে ভ্যারাইটি, উপজাতি এবং strain পরিলক্ষিত হয় যা একে অপরের থেকে সামান্য হলেও আলাদা, আক্ষরিক ভাবে বলা চলে জীনগত বৈচিত্র্য হল একটি জীবের মধ্যে নিউক্লিওটাইড, ক্রোমোজম ও জিনের বিভিন্নতা।

(৩) **বাস্তুতন্ত্র জনিত বৈচিত্র্য (Ecosystem Diversity) :** একটি ভৌগোলিক ক্ষেত্রের মধ্যে বাস্তুতন্ত্রগুলির মধ্যে যে বিভিন্নতা দেখতে পাওয়া যায় তাকে বাস্তুতন্ত্র জনিত বৈচিত্র্য বলা হয়। একটি বাস্তুতন্ত্রের বৈচিত্র্যের পরিবর্তন হলে তা ঐ স্থানে বসবাসকারী জীবের শারীরিক বা জিনগত বৈচিত্র্যেরও পরিবর্তন হয়। তাই বাস্তুতন্ত্রের বৈচিত্র্যে জীববৈচিত্র্যের একটি উল্লেখযোগ্য উপাদানও বলা চলে।

## ৪.৩ বিশ্ব-জীববৈচিত্র্য (Global Biodiversity)

পৃথিবীতে সঠিক কতগুলি প্রজাতি আছে তার কোন সঠিক উত্তর হয় না তবে, প্রায় ১০০-১৩০ লক্ষ প্রজাতি থাকতে পারে তা বিজ্ঞানী মহল অনুমান করেন। বলা যায় এখন পর্যন্ত পৃথিবীতে বসবাসকারী জীবনের মাত্র ৩০% প্রজাতিকে চিহ্নিতকরণ করা সম্ভব হয়েছে।

মোট ১.৫-১.৭৬ মিলিয়ন প্রজাতির মধ্যে ১০,২০,০০৭ প্রজাতির পতঙ্গ শ্রেণি ২,৫০,০০০ গুপ্তবীজি উদ্ভিদ এবং ১,০২,০০০ অমেরুদণ্ডী প্রাণী এবং বাকি প্রজাতি, মেরুদণ্ডী, ব্যাক্তবীজি, ছত্রাক ও আনুবীক্ষণিক জীবের অন্তর্গত।

**বিশ্বজীব বৈচিত্র্য (World Biodiversity Data)**

| ক্রমিক সংখ্যা | গ্রুপ | প্রজাতির সংখ্যা |
|---|---|---|
| ১ | আনুবীক্ষণিক জীব | ১১,৫১২ |
| ২ | ছত্রাক | ৪৬,৯৮৩ |
| ৩ | লাইকেন | ১৭,০০০ |
| ৪ | শৈবাল | ৪০,৮০০ |
| ৫ | ব্রায়োফাইট | ১৪,৫০০ |
| ৬ | টেরিডোফাইট | ১২,০০০ |
| ৭ | ব্যাক্তবীজি | ৬৫০ |
| ৮ | গুপ্তবীজি | ২৫০,০০০ |
| ৯ | পতঙ্গ | ১০,২০,০০৭ |
| ১০ | প্রোটোজোয়া | ৩১,২৫০ |
| ১১ | মাছ | ৩২,১২০ |
| ১২ | উভচর | ৬,৭৭১ |
| ১৩ | সরীসৃপ | ৯,২৩০ |
| ১৪ | পক্ষী | ৯,০২৬ |
| ১৫ | স্তন্যপায়ী | ৫,৫১৬ |

(উৎস : India's 5th National Report to the convention on Biological Diversity, 2014)

## ৪.৪ বিভিন্নতর স্থানিক মাপকাঠি (Spatial Scales of Diversity)

১৯৬০ সালে হুইটেকার (Whittaker) জীববৈচিত্র্যকে, ভৌগোলিক অবস্থানের ভিত্তিতে প্রজাতির বিভিন্নতাকে তিনটি স্তরে ভাগ করেন।

(১) **আলফা-ডাইভারসিটি (α-Diversity) :** একটি ছোট একই রকম ভৌগোলিক স্থানের মধ্যে যতগুলি ভিন্ন প্রজাতি অবস্থান করতে পারে তাকে ওই স্থানের আলফা-ডাইভারসিটি বলা হয়।

(২) **বিটা-ডাইভারসিটি (β-Diversity) :** দুটি ভৌগোলিক স্থানের মধ্যে একে অপরের থেকে যতগুলি ভিন্ন প্রজাতি অবস্থান করে তাকে অপরের স্বাপেক্ষে বিটা-ডাইভারসিটি বলে। বিটা-ডিভারসিটির অর্থ হল কম সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রজাতির অবস্থান।

(৩) **গামা-ডাইভারসিটি (γ-Diversity) :** একটি বৃহৎ ভৌগোলিক ক্ষেত্রের মধ্যে অবস্থানকারি সমগ্র ভিন্ন প্রজাতিকে ঐ ক্ষেত্রের গামা-ডাইভারসিটি বলা হয়। এটি কিছুটা আলফা-ডাইভারসিটির ন্যায়। শুধুমাত্র বৃহৎ ভৌগোলিক ক্ষেত্রের এর গণনা করা হয়।

নিম্নোত চার্টটি দ্বারা আলফা, বিটা এবং গামা ডাইভারসিটি (α, β & γ Diversity) ব্যাখ্যা করা হল

| **ক্রমিক সংখ্যা** | **কাল্পনিক উদ্ভিদ প্রজাতি** | **অরণ্য** | **চারণভূমি** | **জলাভূমি** |
|---|---|---|---|---|
| ১ | AA | + | + | + |
| ২ | Aa | + | - | - |
| ৩ | BB | + | + | - |
| ৪ | Bb | + | - | - |
| ৫ | CC | + | - | + |
| ৬ | Cc | - | + | + |
| ৭ | DD | + | + | - |
| ৮ | Dd | - | + | - |
| ৯ | EE | + | - | - |
| ১০ | Ee | + | - | - |
| ১১ | FF | + | - | - |
| ১২ | Ff | + | + | + |
| আলফা-ডাইভারসিটি | | ১০ | ৬ | ৪ |
| বিটা-ডাইভারসিটি | অরণ্য: চারণভূমি = ৮ | | চারণভূমি: জলাভূমি = ৪ | জলাভূমি: চারণভূমি = ৮ |
| গামা-ডাইভারসিটি ১২ | | | | |

## ৪.৫ ভারতের জীব-ভৌগোলিক শ্রেণিবিন্যাস (Biogeological Classification of India)

জীবমণ্ডলের ভৌগোলিক বণ্টনের মুখ্য আলোচ্য বিষয় হল প্রাণী ও উদ্ভিদের বণ্টন। ভারতবর্ষের প্রকৃতি, ভৌগোলিক অবস্থান, জলবায়ুর উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা প্রাণী ও উদ্ভিদগোষ্ঠীকে ১০টি মুখ্য অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে। এই অঞ্চলগুলিতে বিভিন্ন বাস্তুতন্ত্রের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। যেমন— বনভূমি, তৃণভূমি, জলাশয়, নদী, জলাভূমি ইত্যাদি, যেখানে খুবই নির্দিষ্ট ধরণের প্রাণী ও উদ্ভিদ বসবাস করে। ভারতের জীব-ভৌগোলিক অঞ্চলগুলি হল:

(১) **হিমালয়ের তরাই অঞ্চল :** হিমালয়ে উত্তর পার্বত্য অঞ্চলের বরাফাবৃত শীতল লাদাখ অঞ্চল।

(২) জম্মু ও কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ডের এবং উত্তর-পশ্চিমের রাজ্যগুলির **হিমালয় পার্বত্য** অঞ্চল।

(৩) **স্বল্প শুষ্ক অঞ্চল :** মরুভূমি এবং পশ্চিমঘাট পর্বত মালার মধ্যবর্তী তৃণভূমি অঞ্চল যা মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, গুজরাট পর্যন্ত বিস্তৃত।

(৪) **পশ্চিমঘাট পর্বতমালা :** তাপ্তি নদী থেকে দক্ষিণ ভারতের মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, কেরালা পর্যন্ত বিস্তৃত।

(৫) **উত্তর পূর্বের মরুভূমি অঞ্চল :** ভারতের সমগ্র মরুভূমি অঞ্চল, কচ্ছ, রাজস্থান, দিল্লির কিছু অংশ এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত।

(৬) **ডেকান মালভূমি :** বৃষ্টিপাত খুবই স্বল্প হয় প্রায় 100 mm, ছোটনাগপুর মালভূমি এই অঞ্চলের মধ্যে অবস্থিত।

(৭) **গাঙ্গেয় অববাহিকা :** গঙ্গা নদীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চল এবং বেলাভূমি। উত্তর-পূর্ব ভারতের এই অঞ্চল জীববসতি পূর্ণ হয়, সাধারণত চিরহরিত প্রকৃতির উদ্ভিদ জন্মায় এবং বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 1000 cm। আসাম, ত্রিপুরা, মণিপুর ইত্যাদি এর অন্তর্ভুক্ত।

(৮) **দ্বীপ অঞ্চল :** আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, এখানে ম্যানগ্রোভ জাতীয় উদ্ভিদ দেখতে পাওয়া যায়।

(৯) **উপকূল অঞ্চল :** ভারতের উপকূল বৃহৎ অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত সাধারণত নারকেল গাছ, মৎস চাষ, এবং ম্যানগ্রোভ প্রজাতির গাছের সম্ভার।

## ৪.৬ জীববৈচিত্র্যের গুরুত্ব (Values of Biodiversity)

জীববৈচিত্র্য বলতে পৃথিবীর প্রাণ সম্পদকেই বোঝায়। এই জীববৈচিত্র্যকে ভাল করে বোঝা দরকার কারণ এর উপর পৃথিবীর যে কোন প্রাণীর প্রাণ ধারণ নির্ভর করে। পৃথিবীর প্রত্যেকটি জীব কোন না কোনও ভাবে একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। এই জীববৈচিত্র্য দৈনন্দিন নানাভাবে বিনষ্ট হচ্ছে, যেমন— বৃক্ষছেদন, বনভূমি বিনষ্ট করণ। সর্বোপরি নানাভাবে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে তা বায়ু, মৃত্তিকা, জল বা সামুদ্রিক দূষণই হোক না কেন। পুরোপুরি মানব সম্প্রদায়ের পরিপ্রেক্ষিতে জীববৈচিত্র্যকে লক্ষ্য করলে বহুজীবের ব্যবহারিক উপযোগিতা লক্ষ্য করা যায়। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল :-

● মানুষ বহু দানা শস্য, শাকসব্জী, ফল, ফুল, মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে থাকে। এটি জীববৈচিত্র্যের ব্যবহার্য্য দিক।

● বেশির ভাগ খাদ্য ক্রান্তীয় জঙ্গলের উদ্ভিদ থেকে আসে।

● এখনো পর্যন্ত গরিব এবং আদিবাসীরা পরম্পরাগত ভাবে বনৌষধির উপর নির্ভরশীল।

● আধুনিক বহু ঔষধ নির্মাণ সংস্থা বহু বন্যপ্রাণী এবং উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল, যেমন— সিঙ্কোনা থেকে ম্যালেরিয়ার ঔষধ তৈরি হয়, রাউলফিয়া সার্পেন্টিনা থেকে উচ্চ রক্তচাপের ঔষধ প্রস্তুতিতে কাজে লাগে, কোকো অ্যানাস্থেটিক হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

● বহু আনুবীক্ষণিক প্রাণী আছে যারা খনিজ বের করতে এবং পরিবেশ দূষণ নিবারণ করতে পরে। যেমন— সিউডোমোনাস পুটিডা (*Pseudomonas putida*) (সুপারবাগ) যা অয়েলস্পিলকে কমাতে পারে।

● এছাড়া জীববৈচিত্র্য জঙ্গল পর্যটন, পক্ষিদর্শন, ফোটোগ্রাফি ইত্যাদির জন্য উল্লেখযোগ্য। সমগ্র বিশ্বের ভারসাম্য রক্ষার জন্য জীববৈচিত্র্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

## ৪.৭ জীববৈচিত্র্য-ধন্য অঞ্চল (Biodiversity Hotspots)

জীববৈচিত্র্যের সম্ভার পৃথিবীর সর্বত্র সমভাবে বণ্টিত নয়। গ্রীষ্মমণ্ডলীর দেশগুলিতে জীববৈচিত্র্যের সমাবেশ সবথেকে বেশি। 1988 সালে ব্রিটিশ জীব বিজ্ঞান আর্নেস্ট নোরমান মোয়ারস (Ernest Norman Myers) প্রথম **'জীববৈচিত্র্য-ধন্য অঞ্চল'** (Biodiversity hotspot) শব্দটি ব্যবহার করেন। তিনি পৃথিবীর ১৮টি অতিপ্রজাতি ধন্য অঞ্চল নির্দিষ্ট করেন এবং এদের জীববৈচিত্র্য ধন্য অঞ্চলের মধ্যে থাকতে হলে দুটি মুখ্য বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে।

● কমপক্ষে ০.৫% বা ১৫০০ প্রজাতির স্থানীয় উদ্ভিদ থাকতে হবে।

● কমপক্ষে ৭০% উদ্ভিদ প্রজাতি প্রাথমিক অবস্থান থেকে নষ্ট হয়ে গেছে।

সমগ্র বিশ্বে এইরকম মোট ৩৪টি অঞ্চল রয়েছে। এই অঞ্চলগুলি সমগ্র বিশ্বের প্রাণী উদ্ভিদের প্রায় ৬০% অধিকারী। ভারতে বর্তমানে ৪টি 'Hotspot' আছে। যথা—

(১) **হিমালয় অঞ্চল :** এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত, ভারতের সমগ্র হিমালয়ের অঞ্চল (এবং পাকিস্তান, তিব্বত, নেপাল, ভুটান, চীন ও মায়ানমারের হিমালয় অঞ্চল)

(২) **ইন্দোবার্মা অঞ্চল :** আসাম ছাড়া সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারত এবং আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ (এবং মায়ানমার, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া এবং দক্ষিণ চীন) এই অঞ্চলের অন্তর্গত।

(৩) **সুন্ডাল্যান্ড :** নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ (এবং ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, বোর্ণিও, ফিলিপিনস)।

(৪) **পশ্চিমঘাট পর্বতমালা এবং শ্রীলঙ্কা :** সমগ্র পশ্চিমঘাট পর্বতমালা (এবং শ্রীলঙ্কা) এই অঞ্চলের অন্তর্গত।

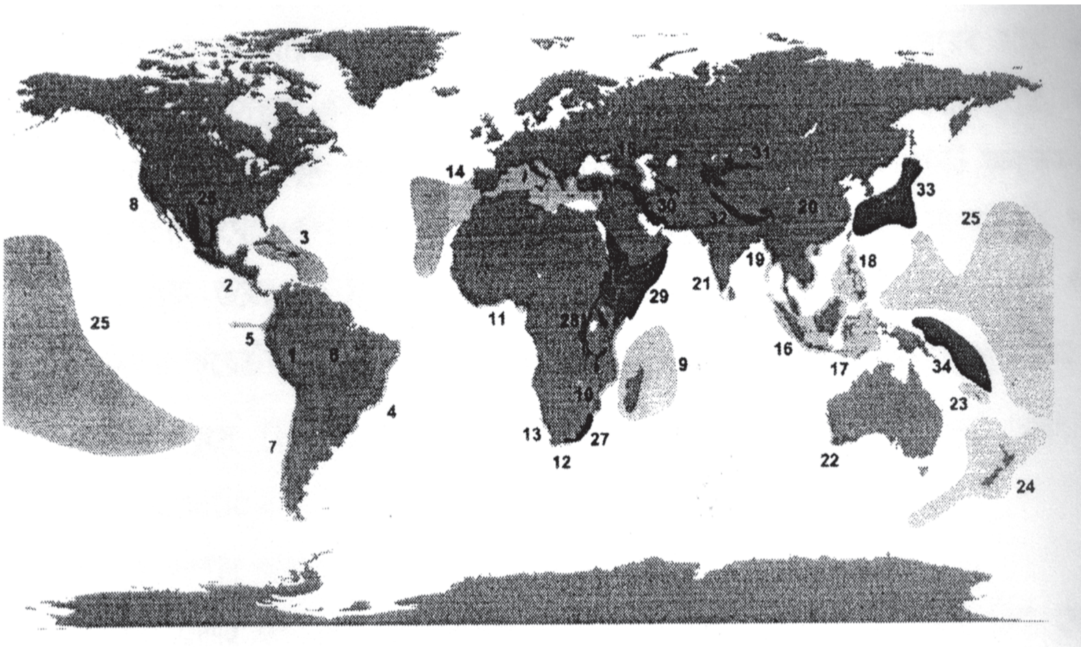

চিত্র : জীববৈচিত্র্য ধন্য অঞ্চল (Biodiversity hotspot in the world)

## ৪.৮ বৃহৎ জীববৈচিত্র্যপূর্ণ দেশ (Mega Biodiversity Nation)

বিশ্বের সবথেকে বেশি জীববৈচিত্র্যপূর্ণ দেশগুলিকে বৃহৎ জীববৈচিত্র্যপূর্ণ দেশ বলা হয় (Mega Biodiversity Nation)। সাধারণ ভাবে মেগা-বায়োডাইভারসিটি দেশগুলি উষ্ণমণ্ডলে অবস্থিত যা মকরক্রান্তি ও কর্কটক্রান্তীয় অঞ্চলের মধ্যে অবস্থান করে। World Conservation Monitoring Center of the United Nation Environmental Program (UNEP-WCMC), ১৯৮৮ সাল থেকে এই বিষয় নিয়ে কাজ করে আসছে। বর্তমানে বিশ্বের 18টি বৃহৎ জীববৈচিত্র্যপূর্ণ অঞ্চল আছে যাদের গড়ে ৫০০০-এর বেশি স্থানিক উদ্ভিদ আছে। দেশগুলি হল—

(১) ব্রাজিল (২) কলম্বিয়া (৩) ইকুয়েডর (৪) যুক্তরাষ্ট্র, (৫) মেক্সিকো (৬) পেরু (৭) ভেনেজুয়েলা (৮) ফিলিপাইন (৯) ভারত (১০) ইন্দোনেশিয়া (১১) মালয়েশিয়া (১২) চীন (১৩) মাদাগাস্কার (১৪) গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্র (১৫) গণতান্ত্রিক দক্ষিণ আফ্রিকা (১৬) অস্ট্রেলিয়া (১৭) পাপুয়া নিউগিনি (১৮) ইরান। এদের মধ্যে ব্রাজিল সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে আছে। আমাদের দেশ ১১তম স্থানাধিকারী। ইউরোপে কোনো Megadiversity দেশ নেই।

## ৪.৯ জীববৈচিত্র্যের সংকট (Threats to Biodiversity)

Mass Extinction বিবর্তনের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এর ফলে জীববৈচিত্র্যের হঠাৎ করে ঘাটতি ঘটে। এছাড়া প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের (যেমন— বন্যা, সুনামি, ভূমিকম্প ইত্যাদি) জীববৈচিত্র্যের হ্রাস লক্ষ্য করা যায় তবে তা অনেকটা আঞ্চলিক, বিশ্বব্যাপী এর প্রভাব পড়ে না। শেষ mass extinction অর্থাৎ ৬৫ মিলিয়ন বছর আগে

ডাইনোসরের বিলুপ্তির পর থেকে মানুষের আবির্ভাবের পর মানুষের ক্রিয়াকলাপের জন্য জীববৈচিত্র্যের হ্রাস ঘটেছে তাকে Holocene বিলুপ্তি (Holocene Extinction) বলা হয়। এই Holocene Extinction-এর প্রধান কারণগুলি হল :—

**(১) জীবের আবার ধ্বংস (Habitat loss) :**

বাসস্থানের আয়তন এবং প্রজাতির সংখ্যা সরাসরি ভাবে একে অপরের সাথে জড়িত। জনসংখ্যার অতিবৃদ্ধি, মনুষ্য বাসস্থান এবং রাস্তা তৈরির জন্য বনভূমি ধ্বংস বৃহৎ জলাধার তৈরি, খনি এবং পরিবেশ দূষণের জন্য জীবের বাসস্থান ধ্বংস হচ্ছে। এই বাসস্থান ধ্বংস জীবের বিলুপ্তির একটি অন্যতম কারণ। কোনো স্থানে একটি প্রজাতির সংখ্যা বেশি পরিমাণে ধ্বংস হলে তার খাদ্যশ্রেণির প্রজাতির সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, ফলস্বরূপ তার পূর্ববর্তী পৌষ্টিক স্তরের প্রাণীর সংখ্যা হ্রাস পায়। উদাহরণ স্বরূপ— কয়োটির সংখ্যা হ্রাস পাবার ফলে দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার কয়োটির খাদ্যশ্রেণি র‍্যাকুন-এর সংখ্যার বৃদ্ধি পায় যার ফলস্বরূপ গান করা পাখির সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। বাসস্থান ধ্বংস (Fragmentation) হলে জিনগত viability হ্রাস ঘটে এবং অবশেষে জিনগত ক্ষয়সাধন (Genetic erosion) ঘটে।

**(২) অতিরিক্ত সম্পদ আহরণ (Over Exploitation) :**

৭০০ কোটি জনসংখ্যা প্রায় অর্ধেক বনভূমি গ্রাস করে ফেলেছে। এই ধ্বংসলীলা শেষ হয়নি। ক্রমবর্ধমান ভাবে মানব সভ্যতা ঢুকে পড়ছে প্রাণীর নীরব বাসস্থানের মধ্যে। এর একটি বড় উদাহরণ হল মহারাষ্ট্রের গিরি জাতীয় উদ্যানের মধ্য দিয়ে তৈরি হয়েছে মিটার গেজ রেললাইন, রাজ্য সড়ক এবং ৩ খানা মন্দির। এর ফলে ভারতের সিংহের একমাত্র বাসস্থানও আজ সুরক্ষিত নয়।

শুধুমাত্র স্থলজ প্রাণী না বর্তমানে সামুদ্রিক প্রাণীর ১৪% হ্রাস পেয়েছে, এর প্রধান কারণ হল পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি, নানাভাবে জল দূষণ এবং অপরিকল্পিত ও যথেচ্ছ মৎস শিকার। এই সমস্ত কিছুর মূলে আছে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা না থাকা এবং প্রাকৃতিক সম্পদের বিকল্প ব্যবহার না করে বা পুনরস্থাপনের চেষ্টা না করে যথেচ্ছ ভাবে তা আহরণ এবং বিনষ্টকরণ।

**(৩) বিদেশী প্রজাতি (Exotic Species) :**

জীববৈচিত্র্য সংকটের আর একটি কারণ হল বিদেশী প্রজাতির আগমন। এই বিদেশী আগাছা আগমনের ফলে চাষ জমি, বনভূমি প্রভৃতির প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্রের পরিবর্তন ঘটে এমনকি খাদ্য শৃঙ্খল পর্যন্ত বিঘ্নিত হয়। এছাড়া এই বিদেশী প্রজাতির আগাছা বা উদ্ভিদ উক্ত স্থানের স্থানীয় উদ্ভিদদের স্থান দখল করে, ফলস্বরূপ বহু উদ্ভিদ বিলুপ্ত হয়ে পড়েছে। শুধু তাই নয় স্থানীয় উদ্ভিদ বা ঘাসের বিলুপ্তির জন্য বহু পতঙ্গ এবং পাখি বিলুপ্তির পথে অগ্রসর হচ্ছে।

বর্তমানে বড় বড় ট্রলারের মাধ্যমে সমুদ্রে মাত্রাতিরিক্ত মৎস্য শিকারের ফলে মৎস্য সম্পদের হ্রাস ঘটছে। এই মৎস্য শিকারের সময় বহু অপ্রয়োজনীয় প্রাণী যারা মাছ ধরার জালে ধরা পড়ে অকারণে তাদের মৃত্যু ঘটে, যেমন— কচ্ছপ, ঝিনুক, শামুক, কিছু সংকটাপন্ন হাঙ্গর প্রজাতি।

বিদেশি প্রজাতির জীব স্থানীয় প্রাণী বা উদ্ভিদের বাসস্থান দখল করে তাদের খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে, আক্রান্ত করে এবং তাদের সাথে মিলিত হয়ে প্রজননও ঘটায়, এর ফলে স্থানীয় প্রজাতির ধ্বংস ও জিনগত পরিবর্তন ঘটে।

**(৪) চোরাশিকার (Poaching) :**

বিশ্ববাজারে বিক্রির জন্য এবং অধিক টাকা উপার্জনের জন্য বেআইনি ভাবে চোরা শিকারীরা, জীবজন্তুর হত্যা করে চলেছে। শুধুমাত্র হাতির দাঁত, গণ্ডারের শিং, সুগন্ধি হিসাবে মৃগনাভী এবং বাঘের চামড়া ইত্যাদির জন্য এই

চোরা শিকারীরা বহু প্রাণীর হত্যা করে বিদেশে রপ্তানী করছে। এছাড়া বাড়িতে পোশার জন্য বিভিন্ন সুন্দর পাখি, প্রাণী যেমন বিদেশে রপ্তানী হচ্ছে তেমনি এদেশেও আসছে অনেক। এছাড়া ঔষধ প্রস্তুত করার জন্য অনেক প্রাণীর দেহের অংশ কাজে লাগে যা আইনিভাবে বা বেআইনিভাবে ঔষধ প্রস্তুতকারীরা কাজে লাগাচ্ছে। তাছাড়া বহু মূল্যবান অর্কিড, ছত্রাক, মস ইত্যাদি নানা ভেষজ ঔষধের কাজে লাগার জন্য বিনষ্ট হচ্ছে দিনের পর দিন।

(৫) **দূষণ (Pollution) :**

এই সকল কারণের উপরে রয়েছে দূষণ। পরিবেশ দূষণের ফলে বহু প্রাণী মারা যাচ্ছে এবং যে সকল প্রজাতি বেশি মাত্রার দূষণ সহ্য করতে পারে না তারা সঙ্কটাপন্ন থেকে বিলুপ্তির পথে এগিয়ে চলেছে। এছাড়া পরিবেশ দূষণের ফলস্বরূপ যে বিশ্ব উষ্ণায়ন ঘটছে তার ফলে বহু জীব প্রজাতি এখন বিলুপ্তির পথে বিশেষ করে মেরু দেশীয় প্রাণী যেমন— মেরুদেশীয় সাদা ভাল্লুক, সিল মাছ, পেঙ্গুইন ইত্যাদি)।

## ৪.১০ ভারতের সংকটাপন্ন ও আঞ্চলিক প্রজাতির জীব (Threatened and Endemic species of India)

জীববৈচিত্র্যের নিরিখে ভারতবর্ষ বিশ্বে ১১ নম্বর স্থানাধিকারী। এমনকি বহু প্রাণী ও উদ্ভিদ আছে যা ভারতবর্ষ ছাড়া বিশ্বে অন্য কোনো স্থানে পাওয়া যায় না।

**আঞ্চলিক প্রজাতি (Endemic Species) :** আঞ্চলিক প্রজাতি তাদেরই বলা হয়ে থাকে যাদের নির্দিষ্ট স্থান ছাড়া বিশ্বে অন্যত্র কোথাও পাওয়া যায় না তাদের ঐ এলাকার আঞ্চলিক প্রজাতি বলে গণ্য হয়ে থাকে। এটি বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। যেমন— (১) স্থানঘটিত আঞ্চলিক প্রজাতি (যেমন— পাহাড়ি, মরুভূমির প্রজাতি) (২) দেশঘটিত আঞ্চলিক প্রজাতি (যেমন— ভারতীয় প্রজাতি) (৩) ভৌগোলিক স্থানঘটিত আঞ্চলিক প্রজাতি (যেমন— হিমালয় অঞ্চলের প্রজাতি)।

ভারতবর্ষের বহু প্রাণী ও উদ্ভিদ বিপন্ন ও সংকটাপন্ন, সেই কারণে IUCN সেই সকল জীবের নাম, পরিচিতি, বাসস্থান ইত্যাদি নথিভুক্ত করেন। Red Data Book নামে এটি পরিচিত। International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN)-এর WCMC এবং Species Survival Commission (SSC) এই নথিটি তৈরি করে।

বিপন্নতার অবস্থাভেদে এই তথ্যটি তৈরি করা হয়। যেমন—

(১) **বিলুপ্ত (Extinct, Ex) :** বিগত ৫০ বছরে এই প্রজাতির কোনো প্রাণী দেখা যায়নি বা দেখতে পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই অর্থাৎ শেষ প্রাণীটিও মারা গেছে, যেমন— ডাইনোসর, তাসমানিয়ার বাঘ (*Thylacinus cynocephalus*), ডোডো পাখি (*Raphus cucullatas*), ম্যামথ ইত্যাদি।

(২) **বন্যের বিলুপ্ত (Extinct in the wild, Ew) :** যে সকল প্রাণী বন্যে আর দেখতে পাওয়া যায় না কিন্তু বন্দি অবস্থায় বা সংরক্ষিত অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। কালো নরম খোলের কচ্ছপ (*Nilssonia nigricans*), পোটসি পাফ মাছ (*Cyprinodon alvarezi*)।

(৩) **গুরুতর সংকটাপন্ন (Critically Endangered, CE) :** যে সমস্ত প্রজাতি বন্যে বিলুপ্ত হবার সম্ভাবনা অনেক বেশি তাদের গুরুতর সংকটাপন্ন স্তরে রাখা হয়েছে। যেমন—কালো গণ্ডার (*Diceros bicornis*), কালো গণ্ডার চাকিতা টিটি বানর (*Callicebus caquetensis*) ইত্যাদি।

(৪) **বিপন্ন (Endangered, Ew) :** বিলুপ্ত হবার কারণগুলির সমাধান না করা গেলে যা অচির ভবিষ্যতে বিলুপ্ত হবে, তাদের বিপন্ন প্রজাতি বলে। যেমন— বাঘ (*Panthera tigris*), ভারতীয় হাতি (*Elephas maximus*), লাল পাণ্ডা (*Ailurus fulgens*), নীল তিমি (*Balaenoptera musculus*), পাহাড়ী কস্তুরি মৃগ (*Moschus leucogaster*), পাইন (*Pinus radiata*) প্রভৃতি।

(৫) **সংকটপ্রবণ (Vulnerable, V) :** বিপন্ন হবার কারণগুলি দূর না হলে এরা অচিরে বিপন্ন হবে। শেষ ১০ বছরে এই প্রজাতির জনসংখ্যা প্রায় ৫০% কমেছে। উদাহরণ— গোখরো সাপ (*Ophiophagus hannah*), সামুদ্রিক অশ্ব (*Hippocampus histrix*), জলহস্তী (*Hippopotamus amphibious*), আফ্রিকার সিংহ (*Panthera leo*) ইত্যাদি।

(৬) **নিকট সংকটাপন্ন (Near Threatened, NT) :** ভবিষ্যতে এই সকল প্রজাতির সংকটাপন্ন অবস্থায় যাবার সম্ভাবনা প্রবল। উদাহরণ : জাগুয়ার (*Panthera onca*), কৃষ্ণসার মৃগ (*Antilope cervicapra*), টাইগার সার্ক (*Galeocerdo cuvier*) ।

(৭) **স্বল্পগুরুত্ব (Least Concern, LC) :** এই সকল প্রজাতিদের সংখ্যা বর্তমানে উল্লেখযোগ্য ভাবে হ্রাস পায়নি বা স্থিতিশীল। যেমন— জিরাফ (*Giraffa camelopardalis*), চিতল হরিণ (*Axis axis*)।

—এছাড়াও কিছু প্রজাতির সম্বন্ধে কোন সম্পূর্ণ তথ্যাদি নেই যার দ্বারা ঐ প্রজাতির বিপন্নতার পরিমাপ করা যায় (Data deficient)

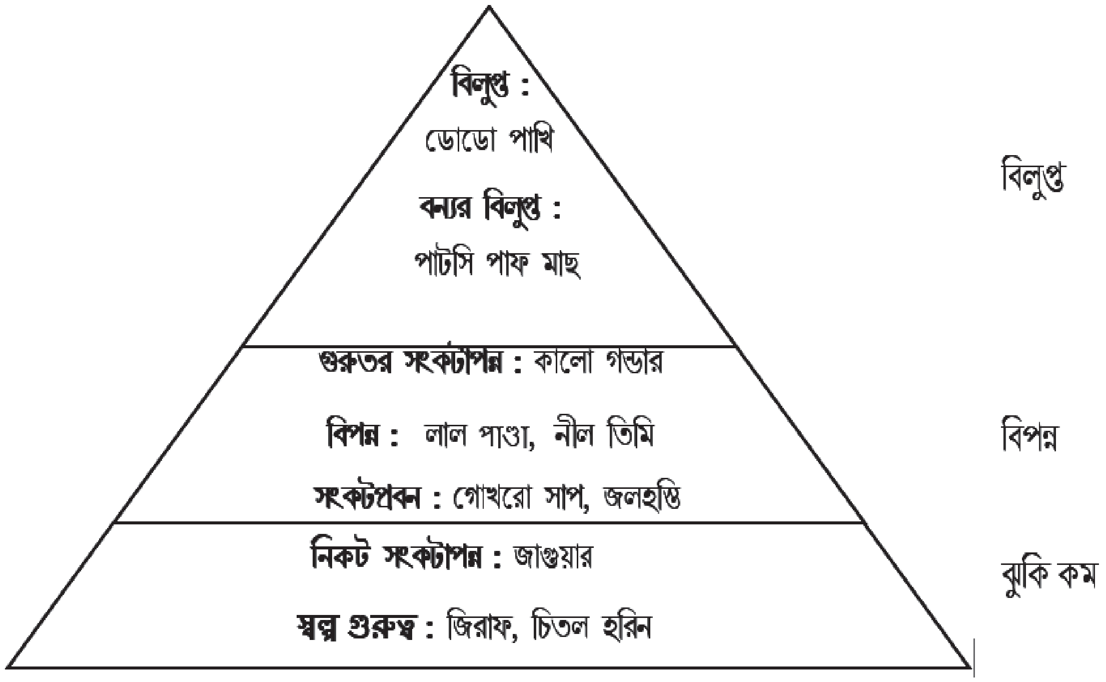


চিত্র : বিপন্নতার স্তর

## ৪.১১ জীববৈচিত্র্যের সংরক্ষণ : ইন-সিটু ও এক্স-সিটু (Conservation of Biodiverity: In-Situ & Ex-Situ)

ভারতে সর্বসাকুল্যে প্রাণী ও উদ্ভিদ প্রজাতির সংখ্যা লক্ষাধিক। বর্তমান পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য এবং জীববৈচিত্র্যের হ্রাস রোধ করার জন্য সংরক্ষণ প্রয়োজন। এই জীববৈচিত্র্যের সংরক্ষণের তাগিদে ভারত সরকার একটি আইন প্রচলন করেন যা বন্যজীব সংরক্ষণ আইন, ১৯৭২ নামে প্রচলিত (Wildlife Protection Act, 1972)। National Biodiversity Action Plan (NBAP), ২০০২-১৬-এর তথ্যানুযায়ী ভারতের মোট ভূ-ভাগে ৪.৯০% স্থান সংরক্ষিত এলাকার অন্তর্গত কিন্তু ভবিষ্যতে তা আরো বৃদ্ধি করে প্রায় ৫.৪৭% করার পরিকল্পনা আছে। এর মোট এলাকা ১,৬১,২২,১৫৭ বর্গ কিলোমিটার এবং সংরক্ষিত এলাকার সংখ্যা ৬৬৮টি (২০১১ সালের তথ্য অনুযায়ী)।

সংরক্ষণ মূলত দুইভাবে করা হয়ে থাকে— (১) ইন সিটু এবং (২) এক্স সিটু সংরক্ষণ

(১) **ইন-সিটু সংরক্ষণ (In-Situ Conservation) :** এই পদ্ধতিতে জীবকে তার নিজের বাসস্থান বা একই রকম বাসস্থানের মধ্যে সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে। এই পদ্ধতিতে যে সকল শর্তাবলী জীবগুলি বিপন্ন হবার জন্য দায়ী তা সংরক্ষিত এলাকাগুলি থেকে নির্মূল করা হয়। উদাহরণ— জীবমণ্ডল সংরক্ষিত অঞ্চল (Biosphere Reserve), জাতীয় উদ্যান (National Park), সংরক্ষিত বনভূমি (Reserve Forest) ইত্যাদি। বর্তমানে ভারতে ১০২টি জাতীয় উদ্যান, ১৮টি জীবমণ্ডল সংরক্ষিত অঞ্চল, ৫১৫টি অভয়ারণ্য এবং ৪৭টি সংরক্ষিত বনভূমি আছে। তবে এই পদ্ধতিতে সংরক্ষণের জন্য বিস্তীর্ণ এলাকার প্রয়োজন।

- **অভয়ারণ্য (Sanctuary) :** এই সংরক্ষিত এলাকাগুলি কেন্দ্র সরকারের আওতায় অন্তর্ভুক্ত। মুখ্য লক্ষ্য হল জীবসংরক্ষণ। এটি কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা সরকারের তত্ত্বাবধানে থাকতে পারে। যদিও শিকার বা চোরাশিকার নিষেধ কিন্তু স্থানীয় জনগণ, ফুল, ফল, জ্বালানির কাঠ ইত্যাদি সংগ্রহ করতে পারে। যেমন— কেদারনাথ (উত্তরপ্রদেশ)।
- **জাতীয় উদ্যান (National Park) :** জাতীয় উদ্যানের এলাকা বিধিবদ্ধ আইন দ্বারা সংরক্ষিত, মানুষের প্রবেশ নিষেধ এবং সাথে সাথে বনজ সম্পদ, যেমন— জ্বালানির কাঠ, ফুল, ফল ইত্যাদি সংগ্রহ করা নিষেধ। তবে উচ্চ নির্দিষ্ট দপ্তরের অনুমতি দ্বারা ছবি তোলা, গবেষণা ও শিক্ষা সংক্রান্ত কাজকর্মে প্রবেশ করা সম্ভব। জাতীয় উদ্যান তুলনামূলক ভাবে অধিক সংরক্ষিত। উদাহরণ— সুন্দরবন (পশ্চিমবঙ্গ, কাজিরাঙ্গা (আসাম), করবেট (উত্তরাখণ্ড), গির (গুজারাট), কানহা (মধ্যপ্রদেশ), কেইবুল লামগাঁও (মণিপুর)

এছাড়াও 'ইন-সিটু' সংরক্ষণের মধ্যে বিভিন্ন সংরক্ষণ প্রকল্প চলে থাকে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—

**ব্যাঘ্র প্রকল্প (Tiger Project) :** সর্বপ্রথম ১৯৭৩-৭৪ সালে এই প্রকল্প শুরু হয়। National Tiger Conservation Authority (NCTA) দ্বারা এই প্রকল্প নিয়ন্ত্রিত হয়। ২০০৮ সালে মোট বাঘের সংখ্যা ছিল ১৪১১টি যা ২০১১ সালে NCTA-এর তথ্য অনুযায়ী বেড়ে দাঁড়ায় ১৭০৬টি এবং ২০১৪ সালে ২২২৬। প্রায় সব জাতীয় উদ্যানে এই প্রকল্প চলছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য— সুন্দরবন, কানহা, করবেট, রণথম্ভর, বান্ধবগড় ইত্যাদি।

এছাড়া গণ্ডার প্রকল্প— জলদাপাড়া (পশ্চিমবঙ্গ), কাজিরাঙ্গা (আসাম), সিংহ প্রকল্প-গির (গুজরাট)।

(২) **'এক্স-সিটু' সংরক্ষণ (Ex-Situ Conservation) :**

কোন কোন বিশেষ কারণে নিজস্ব প্রাকৃতিক পরিবেশ-এর অনুপস্থিতির জন্য অনুরূপ কৃত্রিম পরিবেশের সৃষ্টি করে তাতে তাদের সংরক্ষণ করা হয়, এই পদ্ধতিকে 'এক্স সিটু' সংরক্ষণ বলা হয়। সাধারণত অতি বিপন্ন বা বিলুপ্ত প্রায় প্রাণী বা উদ্ভিদদের সংরক্ষণের জন্য এই 'এক্স সিটু' সংরক্ষণ ব্যবস্থা। এই পদ্ধতির মধ্যে উল্লেখ্য, উদ্ভিদ উদ্যান (Botanical Garden) এবং পশুশালা (Zoological Park), উদ্ভিদ ও প্রাণীর সংরক্ষণ প্রজনন এবং জন সচেতনতা প্রধান উদ্দেশ্য। এছাড়া আরো নানা পদ্ধতি আছে যেমন— স্পার্ম ব্যাঙ্ক, সিড ব্যাঙ্ক, স্পোর ব্যাঙ্ক, জার্ম প্লাজম ব্যাঙ্ক ইত্যাদি ব্যবস্থাতে ভবিষ্যতের নানা দুর্লভ প্রজাতির কোষ ও বীজ সংরক্ষণ করে রাখার অত্যাধুনিক ব্যবস্থা (হিমায়িত বীজ সংরক্ষণ) আছে। এই পদ্ধতিতে জিনগত বৈচিত্র্য রক্ষা করা এবং বিলুপ্তপ্রায় প্রাণীর সংখ্যাও বৃদ্ধি করা সম্ভব। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় বিপন্ন হয়ে পড়া কুমিরের সংখ্যা বর্তমানে এক্স সিটু সংরক্ষণের মাধ্যমে আজ অনেক স্থিতিশীল অবস্থা গ্রহণ করেছে।

## ৪.১২ বাস্তুসংস্থান পরিষেবা (Ecosystem Services)

বাস্তুতন্ত্র নানা ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে, যেমন ব্যবহার্য বস্তু এবং সেবা দ্বারা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে মানুষের চাহিদা পূরণ করে থাকে।

এই ক্রিয়াকলাপ মূলত চারটি ভাগে ভাগ করা যায়—

(১) **নিয়ন্ত্রণমূলক ক্রিয়াকলাপ :** বাস্তুতন্ত্র পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য নানা উপাদানকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—

- সালোক সংশ্লেষের মাধ্যমে বাতাসের গ্যাসীয় উপাদানের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন।
- জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ।
- জল সরবরাহ এবং জলচক্র নিয়ন্ত্রণ।
- ভূমিক্ষয় রোধ, মাটি উর্বরতা নিয়ন্ত্রণ।
- দূষণ নিয়ন্ত্রণ।

(২) **বাসস্থান মূলক ক্রিয়াকলাপ :** বাস্তুতন্ত্র বহু প্রাণী ও উদ্ভিদের বেঁচে থাকার জন্য তার উপযুক্ত প্রাকৃতিক বাসস্থান তৈরি করে। এটি জীববৈচিত্র্য স্থিতিস্থাপন এবং সংরক্ষণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে।

(৩) **উৎপাদন মূলক ক্রিয়াকলাপ:** বাস্তুতন্ত্রে অবস্থানকারী স্ব-ভোজী উদ্ভিদরা সালোকসংশ্লেষের মাধ্যমে সৌরশক্তিকে পরিবর্তন ঘটিয়ে খাদ্যে রূপান্তর ঘটায় এবং তা পরবর্তী খাদকরা খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে থাকে, এছাড়া বাস্তুতন্ত্র সৌন্দর্যায়নের জন্য নানা ফুল অর্কিড, বনৌষধি এবং জিনগত সম্পদ উৎপাদন করে।

(৪) **তথ্যসম্প্রদান মূলক ক্রিয়াকলাপ :** বাস্তুতন্ত্রের সৌন্দর্য্য, চাহিদা এবং বিভিন্নতা মানুষকে উন্নত ও পরিবর্তিত হতে সাহায্য করেছে। এছাড়া বাস্তুতন্ত্র প্রাকৃতিক ভ্রমণ ও চিত্ত বিনোদনে সাহায্য করে। মানুষের মধ্যে শিল্পী সত্তার বিকাশ সাধন করে। এছাড়া নানা শিক্ষামূলক জ্ঞান ও গবেষণার তথ্য বাস্তুতন্ত্র থেকে পাওয়া যায়।

## ৪.১৩ অনুশীলনী

**সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করুন :**

(১) কোন্ মহাদেশে কোনো Mega Diversity দেশ নেই—
(i) এশিয়া (ii) ইউরোপ (iii) আফ্রিকা (iv) আমেরিকা

(২) কোনটি "ইন-সিটু" সংরক্ষণ নয়—
(i) জাতীয় উদ্যান (ii) অভয়ারণ্য (iii) সংরক্ষিত বনভূমি (iv) উদ্ভিদ উদ্যান

(৩) IUCN-এর পুরো কথা—
(i) International Union for Conservation of Nature
(ii) International United Conservation Nations
(iii) Internal Union for Conservation of Nature
(iv) Internal Union for Conversion of Nature

(৪) ডোডো পাখি হল—
(i) বিপন্ন প্রজাতি (ii) বিলুপ্ত প্রাণী (iii) সংকটাপন্ন প্রাণী (iv) বিলুপ্ত প্রায়

(৫) বিশ্বে বিলুপ্ত জীবের পরিমাণ—
(i) ৯৯.৯% (ii) ৫০.৯% (iii) ২৩% (iv) ১০%

**অতিসংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্ন :**

(১) জিন বৈচিত্র্য কি?
(২) আলফা-ডাইভারসিটি কাকে বলে?
(৩) জীববৈচিত্র্য ধন্য অঞ্চল কাকে বলে?
(৪) বিলুপ্তপ্রাণী কাকে বলে? উদাহরণ দিন।
(৫) 'ইন-সিটু' সংরক্ষণ কাকে বলে? উদাহরণ দিন।

**সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :**

(১) জীব বৈচিত্র্য কয় প্রকার?
(২) আলফা, বিটা, ও গামা-ডাইভারসিটি কাকে বলে ব্যাখ্যা দিন।
(৩) ভারতে কয়টি জীববৈচিত্র্য ধন্য অঞ্চল আছে ও কি কি?
(৪) জীববৈচিত্র্যের সংকটের কারণগুলি ব্যাখ্যা করুন।
(৫) বাস্তুতন্ত্রের পরিষেবাগুলি ব্যাখ্যা করুন।

**উত্তর সংকেত**

**নির্বাচন ভিত্তিক প্রশ্ন :**

(১) (ii) ইউরোপ (২) (iv) উদ্ভিদ উদ্যান (৩) (i) International Union for Conservation of Nature
(৪) (ii) বিলুপ্ত প্রাণী (৫) (i) ৯৯.৯%

# একক ৫ ❑ পরিবেশ দূষণ (Environmental Pollution)

গঠন


৫.০ উদ্দেশ্য

৫.১ প্রস্তাবনা

৫.২ বায়ুদূষণ (**Air Pollution**)

৫.২.১ বায়ুদূষণের প্রকারভদে

৫.২.২ বায়ুদূষণের কারণ

৫.২.৩ বায়ুদূষণের ক্ষতিকারক ফলাফল

৫.৩ জলদূষণ (**Water Pollution**)

৫.৩.১ জলদূষণের উৎস

৫.৩.২ বিশুদ্ধ জলের ধর্ম ও গুণাবলি

৫.৩.৩ জলদূষণের ফলে মানবদেহে সৃষ্ট রোগব্যাধি

৫.৩.৪ জলদূষণ নিয়ন্ত্রণ ও দূরীকরণের উপায়

৫.৪ ভূমিদূষণ (**Land Pollution**)

৫.৪.১ মৃত্তিকা (**Soil**)

৫.৪.২ মৃত্তিকার অবনমনের কারণ ও তার প্রতিকার (**Cause of Soil degradation and its prevention**)

৫.৪.৩ বর্জ্য পদার্থজনিত দূষণ (**Pollution due to waste matter**)

৫.৫ শব্দ দূষণ (**Noise Pollution**)

৫.৫.১ শব্দদূষণের বিভিন্ন উৎস (**Different sources of noise pollution**)

৫.৫.২ শব্দের প্রাবল্যমাত্রা (**Intensity**)

৫.৫.৩ জনস্বাস্থ্যের উপর শব্দদূষণের ক্ষতিকর প্রভাব

৫.৫.৪ শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে করণীয়

৫.৬ সামুদ্রিক দূষণ (**Marine Pollution**)

৫.৬.১ সামুদ্রিক দূষণের উৎস

**৫.৬.২ সামুদ্রিক দূষণের প্রভাব (Impact of Marine Pollution)**

**৫.৬.৩ সামুদ্রিক দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ**

**৫.৭ তাপীয় দূষণ (Thermal Pollution)**

**৫.৭.১ তাপীয় প্রভাব (Effects of Thermal Pollution)**

**৫.৭.২ তাপীয় দূষণের প্রতিকার**

**৫.৮ কঠিন বর্জ্য পদার্থ ও তার পরিচালন ব্যবস্থা (Solid Waste Management)**

**৫.৮.১ কঠিন বর্জ্য পদার্থের প্রকারভেদ (Types of Solid Waste)**

**৫.৮.২ কঠিন বর্জ্য পদার্থের পরিচালন ব্যবস্থা (Solid Waste Management)**

**৫.৯ পরিবেশ বিপর্যয় (Environmental Disaster)**

**৫.৯.১ বিপর্যয়ের ব্যবস্থাপনা (Disaster Management)**

**৫.৯.২ বন্যা (Flood)**

**৫.৯.৩ ভূমিকম্প (Earthquake)**

**৫.৯.৪ ঘূর্ণাবর্ত (Cyclone)**

**৫.৯.৫ ভূমিধস (Landslide)**

**৫.১০ অনুশীলনী**

## ৫.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানতে পারবেন।

- পরিবেশ দূষণ কাকে বলে এবং দূষণজনিত অবক্ষয়।
- বায়ুদূষণের সংজ্ঞা, প্রকারভেদ, কারণ, ফলাফল।
- জলদূষণের সংজ্ঞা, উৎস, ফলাফল ও দূষণ দূরীকরণের উপায়।
- আর্সেনিক দূষণ।
- ভূমিদূষণ ও শব্দদূষণের বিভিন্ন উৎস, মানবদেহে শব্দদূষণের ক্ষতিকর প্রভাব।
- সামুদ্রিক দূষণের উৎস, প্রভাব, নিয়ন্ত্রণ।
- কঠিন বর্জ্য পদার্থ ও তার পরিচালন ব্যবস্থা, এবং বিভিন্নপ্রকার পরিবেশের বিপর্যয় সম্পর্কে।

## ৫.১ প্রস্তাবনা

পরিবেশ বলতে সাধারণভাবে আমরা বুঝি বিভিন্ন সজীব ও জড় উপাদানের সমন্বয় এবং পারস্পরিক নির্ভরশীলতায় গঠিত এক সুস্থ স্বাভাবিক প্রকৃতি, যা জীবনের উৎস ও বৃদ্ধির সহায়ক। প্রকৃতির নিজস্ব গতিময়তার কারণে পরিবেশ সদা পরিবর্তনশীল। অর্থাৎ পরিবেশের উপাদানগুলির আনুপাতিক হার, অবস্থান, বিশুদ্ধতা বা বিভিন্ন উপাদানের পারস্পরিক সম্পর্ক— কিছুই স্থির নয়। এই পরিবর্তনকে আমরা তখনই দূষণ বলে থাকি, যদি পরিবর্তনটি জীবনের অস্তিত্ব বা বৃদ্ধির পক্ষে কোনও ভাবে ক্ষতিকর হয়ে ওঠে। সহজ ভাষায় বলতে গেলে, পরিবেশ দূষণ হলো পরিবেশের কোনও নেতিবাচক পরিবর্তন যা জীব ও জড় উপাদানগুলির স্বাভাবিক সাম্য বা তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক দ্বারা গঠিত সামগ্রিক প্রকৃতির গুণগত মানের অবনতি ঘটায়। এই সামগ্রিক অবনতিকে আমরা ব্যাখ্যা করি পরিবেশের অবক্ষয়রূপে।

সৃষ্টির সূচনা থেকে প্রকৃতি তার নিজস্ব নিয়মে ক্রমপরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তনের অঙ্গ হিসাবে পৃথিবীর জড় ও জীবজগতের বিবর্তন ঘটে এসেছে। জীবজগতে নতুন প্রজাতির সৃষ্টি তার বিবর্তন এবং ক্ষেত্রবিশেষে অবলুপ্তি তার সবই প্রকৃতির সূত্র মেনে হয়ে এসেছে। বিভিন্ন জীবগোষ্ঠী এবং জীবজড়ের পারস্পরিক সম্পর্কের মাধ্যমে তাদের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণের কাজটিও প্রকৃতিই করেছে। প্রকৃতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বিজ্ঞানের বাস্তুতন্ত্রের নিয়মভঙ্গ ও তার দ্বারা সংগঠিত প্রাকৃতিক অবক্ষয়ের প্রধান কারক হলো মানুষের অপরিণামদর্শী স্বার্থচিন্তা যার জন্য আজ পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানগুলি ক্ষতিগ্রস্ত এবং অন্যান্য জীবগোষ্ঠীর মতো এর ফলভোগ করতে হবে মানবজাতিকেও। পৃথিবীর জনসংখ্যার অত্যধিক বৃদ্ধির ফলে বাস্তুতন্ত্রের উদ্ভিদ-প্রাণীর পারস্পরিক ভারসাম্যে ক্ষতি হয়। মানুষ নিজের অর্থনৈতিক লাভ, সামাজিক উন্নতির জন্য বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত জ্ঞানের যে ব্যাপক ব্যবহার করতে শুরু করে তার জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশরক্ষা সংক্রান্ত সতর্কতা কখনই নেওয়া হয়নি। অতি দ্রুতহারে বর্ধিত জনসংখ্যার চাপে চাহিদা সৃষ্টি হয় বসতি, চাষআবাদের স্থান ইত্যাদির। এই সকল প্রয়োজনে অরণ্যের বিনাশ, বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনজনিত কারণে জল, মাটি, বায়ুর স্বাভাবিক গুণগত মানের অবক্ষয় এবং ক্ষেত্রবিশেষে শখ বা লাভের জন্য যথেচ্ছ পরিমাণ প্রাণী ও উদ্ভিদ ধ্বংস করার ফলে আজ পরিবেশে প্রাণের অস্তিত্ব সত্যই বিপন্ন। পরিবেশের সকল সম্পদ যেমন ভৌত (বস্তুগত) উপাদান, আবহাওয়া ও বায়ুমণ্ডল এবং বাস্তুতন্ত্রের অরণ্য ও জলজ প্রাণ সম্পদ ইত্যাদির যথাযথ বিশুদ্ধিকরণ ও সংরক্ষণের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা মানুষের সর্বপ্রথম ও প্রধান কর্তব্য। আমাদের মনে রাখতে হবে আমরা একইসাথে পরিবেশের উপাদান এবং উপাদানের নিয়ন্ত্রক।

## ৫.২ বায়ুদূষণ (Air Pollution)

বায়ু পরিবেশের এমন এক উপাদান যার বিশুদ্ধতা জীবের অস্তিত্ব রক্ষায় অপরিহার্য। আমাদের পরিবেশের প্রধানতম উপাদান বায়ু যার মধ্যে থেকে শ্বাসগ্রহণ করে আমরা প্রতি মুহূর্তে বেঁচে থাকার রসদ সংগ্রহ করি। বায়ু উদ্ভিদ ও প্রাণী নির্বিশেষে সকল জীবের জীবনের উৎস। বায়বিক উপাদানের বিনিময়ের মাধ্যমে সৃষ্ট পারস্পরিক নির্ভরশীলতার দ্বারা বাস্তুতন্ত্রের কাঠামো গড়ে ওঠে। কোন স্থানের বায়ুর স্বাভাবিক উপাদানের কোন প্রকার পরিবর্তন তাই সমগ্র পৃথিবীর পক্ষেই বিপদজনক হয়ে উঠতে পারে। এই অংশে আমরা বায়ুদূষণের সংজ্ঞা, কারণ, ফলাফল ও সম্ভাব্য প্রতিকার পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করবো।

**সংজ্ঞা :** পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের কোন স্তরে বিভিন্ন ভৌত, রাসায়নিক ও জৈব পদার্থের অনুপ্রবেশ বা বায়ুর স্বাভাবিক উপাদানগুলির পারস্পরিক অনুপাতের পরিবর্তন যা প্রাণী বা উদ্ভিদের জীবনমাত্রায় কোনও ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে তাকে আমরা বায়ুদূষণ বলে থাকি।

বায়ু জীবজগতকে ঘিরে থাকা এক মিশ্র, চলমান ও সদা পরিবর্তনশীল গ্যাসীয় পদার্থ। বায়ুদূষণ তাই সর্বদা সামগ্রিক অবক্ষয়ের সূচক যা পরিবেশের অন্যসকল উপাদানগুলিকে সর্বাধিক প্রভাবিত করে এবং দ্রুত একস্থান হতে অন্যস্থানে ছড়িয়ে পড়ে। তাই এটি এক আন্তর্জাতিক পরিবেশ সমস্যারূপে চিহ্নিত হয়েছে। বায়ুদূষণের ফলে ওজোন স্তরে ক্ষয় সৃষ্টি, গ্লোবাল ওয়ার্মিং ও গ্রীনহাউস এফেক্ট মানবজাতির অস্তিত্বের পক্ষে এক অশনিসংকেত হয়ে দেখা দিচ্ছে। বায়ুদূষণের নানা প্রভাবের ফলে সৃষ্টি হওয়া বিভিন্ন অসুখ সংক্রমণ ও তৎজনিত মৃত্যুর হার আক্ষরিক অর্থেই উদ্বেগজনক।

বায়ুদূষণ প্রধানতঃ বায়ুমণ্ডলের নীচের স্তরগুলি অর্থাৎ সমমণ্ডলের (Homosphere) স্তরগুলিতে আবদ্ধ। ভূপৃষ্ঠ সংলগ্ন জীবজন্তুকে ঘিরে থাকা ক্ষুব্ধমণ্ডলে (Troposphere) বায়ুদূষণে প্রভাব সর্বাত্মক এবং স্বাভাবিকভাবে ক্ষুব্ধমণ্ডল দূষণের ফল জীবকুলের অস্তিত্বের পক্ষে মারাত্মক।

### ৫.২.১ বায়ুদূষণের প্রকারভদে

দূষক পদার্থের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে বায়ুদূষণকে চারটি শ্রেণিতে ভাগ করা সম্ভব।

(১) **গ্যাসীয় দূষণ :** বায়ুতে কোনও বিষাক্ত বা ক্ষতিকর গ্যাসের মিশে যাওয়ার ফলে এই প্রকার বায়ুদূষণ ঘটে। কয়েকটি প্রধান দূষক গ্যাস হলো কার্বন মনোক্সাইড (CO), সালফার ডাই-অক্সাইড ($SO_2$), নাইট্রোজেনের বিভিন্ন অক্সাইড ($N_2O$, NO, $NO_2$ ইত্যাদি), এছাড়া বিভিন্ন হাইড্রোকার্বন ইত্যাদি। ক্ষেত্রবিশেষে অন্যকিছু বিষাক্ত গ্যাস যেমন অ্যামোনিয়া ($NH_3$), হাইড্রোজেন সালফাইড, ক্লোরিন ইত্যাদি কোনও ভাবে বায়ুতে মিশে পরিবেশকে প্রচণ্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। আবার কোনও কারণে বায়ুর গ্যাসীয় উপাদানগুলির স্বাভাবিক অনুপাতে পরিবর্তন ঘটার ফলে বায়ুদূষণ সৃষ্টি হয়ে থাকে। যেমন কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাসটি বায়ুর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, কারণ এটি প্রাথমিক খাদক অর্থাৎ সবুজ উদ্ভিদের খাদ্য উৎপাদনের কাজে একটি অন্যতম প্রধান পদার্থ রূপে ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে পৃথিবীতে প্রাণী বিশেষতঃ মানুষের সংখ্যা অত্যাধিক বেড়ে যাওয়ার ফলে উদ্ভিদ প্রাণীর সংখ্যার স্বাভাবিক অনুপাত ব্যহত হয়েছে এবং অত্যাধিক প্রাণীর শ্বাসকার্যের ফলে নির্গত এবং কয়লাজাত পদার্থ দহনের ফলে বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ অত্যাধিক বেড়ে গেছে। এর ফলে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের গড় উত্তাপ নিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে যা পৃথিবীর আবহাওয়ায় একটি মারাত্মক দূষণ এবং সমস্ত পৃথিবীর বিজ্ঞানীকুল এই ''গ্লোবাল ওয়ার্মিং'' সমস্যায় অত্যন্ত উদ্বিগ্ন।

(২) **ভাসমান কঠিন কণাজনিত দূষণ :** বায়ুতে বিভিন্ন জৈব কণা যেমন ফুলের পরাগ জীবাণু ইত্যাদি এবং কিছু সূক্ষ্ম ধূলিকণা মিশে থাকে যা প্রকৃতিজাত এবং স্বাভাবিক। এর উপরন্তু মানুষের দ্বারা বিভিন্ন ভাবে নানা ধাতব পদার্থ বা রাসায়নিক দ্রব্যের সূক্ষ্ম কণা বা কয়লার গুঁড়ো বায়ুতে মিশছে যা শ্বাসের সঙ্গে শরীরে ঢুকে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর দেহে নানা অসুখের সূচনা করে।

(৩) **ভাসমান তরল কণাজনিত বায়ুদূষণ :** বায়ুতে কোনও রাসায়নিক তরলপদার্থের সূক্ষ্ম কণা ভাসমান অবস্থায় থেকেও দূষণ সৃষ্টি করতে পারে। যেমন বাতাসে উপস্থিত অধাতব অক্সাইডগুলি জলীয় বাষ্পের সাথে প্রক্রিয়া করে

বিভিন্ন অ্যাসিডকণা উৎপন্ন করে। এছাড়া বিভিন্ন কারখানায় অত্যধিক অ্যাসিড ব্যবহারের ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকার বাতাসে অ্যাসিড ধোঁয়াশার প্রাদুর্ভাব ঘটে। বাতাসে এইসব অ্যাসিড এলাকার ঘরবাড়ী ও সৌধের উপরিস্তরকে প্রবলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। বলাবাহুল্য যে বাতাসে এই ধরনের অ্যাসিডকণার উপস্থিতি এলাকার মানুষের শরীরে দীর্ঘমেয়াদী থাকে, এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে প্রাণঘাতী রোগ সৃষ্টি করে থাকে।

(৪) **তেজস্ক্রিয় পদার্থ জনিত বায়ুদূষণ :** পরিবেশে তেজস্ক্রিয় পদার্থের উপস্থিতির কিছু স্বাভাবিক উৎস আছে। যেমন উল্কাপাত ইত্যাদির মাধ্যমে বাইরে থেকে পৃথিবীর আবহমণ্ডলে মেশা, পরিবেশে উপস্থিত কিছু বিশেষ ধাতু বা ধাতব যৌগ থেকে নিঃসৃত আণবিক দূষণের পরিমানে নগণ্য। পারমাণবিক গবেষণাগার, কারখানা বা চিকিৎসাকেন্দ্র বা সুরক্ষা পরীক্ষায় ব্যবহৃত X-ray, তেজস্ক্রিয় (রেডিয়াম) ডায়ালযুক্ত ঘড়ি, লেসার টর্চ প্রভৃতি থেকে আণবিক বিকিরণ এবং বিশেষতঃ পারমাণবিক অস্ত্রের পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণের ফলে পরিবেশে তেজস্ক্রিয় দূষণের প্রাদুর্ভাব ঘটে।

তেজস্ক্রিয় দূষণের ফলে মানবদেহে প্রাথমিক প্রতিক্রিয়াগুলো বমি, দুর্বলতা, রক্ত-পায়খানা, সংক্রামক অসুখে ভোগা ইত্যাদি দেখা যায়। পরবর্তী পর্যায়ে বিভিন্ন প্রকার চর্মরোগ যেমন চামড়ায় ফোস্কা পড়া, ফেটে যাওয়া, রক্তপড়া, চুল উঠে যাওয়া ইত্যাদি ঘটে। তেজস্ক্রিয়তার দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতিকর প্রভাবে, নানা মারাত্মক রোগ সৃষ্টি হয় যেমন লিউকিমিয়া, ক্যান্সার, ছানি ও অন্য চোখের রোগ, থাইরয়েডের অসুখ ইত্যাদি।

উদাহরণস্বরূপ ষ্ট্রনসিয়াম, সিজিয়াম, কার্বন ($C_{14}$) ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষতিকর তেজস্ক্রিয় দূষক পদার্থ (বা তা থেকে উৎপন্ন বিভিন্ন রশ্মিসমূহ, যেমন— গামা রশ্মি, আলফা রশ্মি, বিটা রশ্মি, X-ray রশ্মি ইত্যাদি)।

### ৫.২.২ বায়ুদূষণের কারণ

(১) **প্রাকৃতিক কারণ :** বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং প্রাকৃতিক পরিবর্তনের ফলে বায়ুদূষণ ঘটে থাকে, যদিও তার পরিমাণ এবং ক্ষতিকারকতা মানুষের দ্বারা কৃত দূষণের তুলনায় নগণ্য। বায়ুদূষণের কয়েকটি প্রধান প্রাকৃতিক কারণ হল,

(ক) দাবানল, আগ্নেয়গিরি থেকে অগ্ন্যুৎপাতের ফলে সৃষ্ট সালফার ডাই-অক্সাইড গ্যাস ও সালফার, ম্যাঙ্গানীজ, ক্লোরিন, ব্রোমিন প্রভৃতি ধাতু বা অধাতব কণাজাতীয় পদার্থ।

(খ) জলাভূমি অঞ্চলে বা জীবদেহের পচনের ফলে সৃষ্ট মিথেন ($CH_4$) গ্যাস।

(গ) কয়লা ও পেট্রোলিয়াম খনিজাত গ্যাস, যেমন— মিথেন ($CH_4$), কার্বন মনোক্সাইড (CO)

(ঘ) উল্কাপাতের ফলে ধাতু কণা

(ঙ) মহাজাগতিক ভারি ধূলিকণা,

(চ) গ্রহগুলির আবর্তন ও পারস্পরিক দূরত্বের হ্রাস বৃদ্ধির ফলে সংঘটিত নানা আলোক রাসায়নিক বিক্রিয়া জাত বায়ুদূষণ।

(ছ) বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্ঘটনার ফলে সৃষ্ট ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, অ্যালার্জি, ফানজাই ইত্যাদি।

বিজ্ঞানীরা অবশ্য এই সকল প্রাকৃতিক উপায়ে সৃষ্ট বায়ুদূষণ থেকে অনেক বেশী উদ্বেগজনক বলে মনে করেন, মানুষের দ্বারা সৃষ্ট বিভিন্ন কৃত্রিম বায়ুদূষণকে, কেননা যদিও এই সব দূষণগুলির নিয়ন্ত্রণ সম্ভব, তবুও শুধুমাত্র

মানুষের অবিবেচনার ফলে এই দূষণের পরিমাণ নিরন্তর দ্রুতহারে বেড়েই চলেছে এবং এর ক্ষতিকারতা প্রত্যেক ক্ষেত্রেই অত্যন্ত ব্যাপক। মানব সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে বিগত কয়েক শতাব্দীতে বিভিন্নভাবে বায়ুদূষণ ঘটেছে যার প্রভাবে পরিবেশের অন্য উপাদানগুলিও নানাভাবে দূষিত বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কয়েকটি প্রধান দূষণকারক সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করা হলো।

(২) **যানবাহন সৃষ্ট বায়ুদূষণ :** মানুষের ব্যবহৃত বিভিন্ন আধুনিক পরিবহন মাধ্যম থেকে নিঃসৃত ধোঁয়া পরিবেশকে দূষিত করে। স্থলপথে যাত্রীবাহী যান বা মালগাড়ি হিসাবে ব্যবহৃত বাস, ট্রেন, মোটরগাড়ি, টেম্পো, লরি, ট্রাক ইত্যাদি জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত শুদ্ধ বা অশুদ্ধ পেট্রোল, ডিজেল ইত্যাদির সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ দহনের ফলে বিভিন্ন বিষাক্ত গ্যাস যেমন কার্বন মনোক্সাইড (CO), নাইট্রোজেনের বিভিন্ন অক্সাইড, সালফার ডাই-অক্সাইড ($SO_2$) লেড-অক্সাইড প্রভৃতি বাতাসে মিশে যায়। এছাড়া দহন না হওয়া কিছু হাইড্রোকার্বন জাতীয় যৌগ, পলিনিউক্লিয়ার হাইড্রোকার্বন বা কার্বন কণা এবং লেড বায়ুতে ভাসমান অবস্থায় মিশে যায়। এদের মধ্যে লেডযুক্ত পেট্রোল থেকে সৃষ্ট লেড কণা ও লেড-অক্সাইড গ্যাস প্রচণ্ড বিষাক্ত যা শরীরে চিরস্থায়ী ব্যাধি সৃষ্টি করে।

স্বভাবতই শহরাঞ্চলে যানবাহন এবং মালগাড়ির অত্যাধিক ব্যবহারের ফলে এই জাতীয় বায়ুদূষণের পরিমাণ অত্যাধিক। একটি পরিসংখ্যান অনুসারে ভারতের বড় শহরগুলিতে মোট বায়ু দূষণের অর্ধেক ভাগ সৃষ্টি হয় পরিবহন সংক্রান্ত অসতর্কতার দরুণ।

এ ছাড়া সামুদ্রিক ও বায়ুযান থেকে নির্গত ধোঁয়া বিশেষত যুদ্ধযান বা অন্য সামরিকযান নিঃসৃত গ্যাসগুলি পরিবেশকে প্রবল মাত্রায় দূষিত করে।

পরিবহনের জন্য রাস্তা, পুল ইত্যাদি তৈরিতে পিচ গলানোর সময় যে ধোঁয়া বেরোয় তাতে বেঞ্জাপাইরিন যৌগ থাকে যার থেকে ক্যানসার রোগ হয়।

(৩) **শিল্পজাত বায়ুদূষণ :** শিল্পাঞ্চলগুলির কলকারখানা থেকে নানা গ্যাস, ধোঁয়া এবং তাতে ভাসমান অতিক্ষুদ্র ধাতব বা অধাতব রাসায়নিক পদার্থের কণা বায়ুতে মিশে যায়। প্রধানতঃ গত শতাব্দীর শিল্পবিপ্লবের পরবর্তী পর্যায়ে শিল্পাঞ্চলের অত্যাধিক প্রসার ও সেখানে প্রয়োজনীয় সতর্কতা ছাড়াই নানা ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার এই দূষণের কারক। প্রাথমিকভাবে এই দূষণ শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট এলাকাকে প্রভাবিত করলেও পরবর্তীকালে বায়ু ও জলের প্রবাহমানতার কারণে অত্যন্ত দ্রুতহারে বিস্তৃত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে।

শিল্পজাত বায়ুদূষণের মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাবের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় কয়েকটি বিশেষ দুর্ঘটনার বিবরণ থেকে যা এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো।

**ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনা—** শিল্প কারখানায় দুর্ঘটনার ফলে সর্বাত্মক বায়ুদূষণের ঘটনাটি ঘটেছিলো ভারতবর্ষের ভূপাল শহরে 1984 সালের ৩রা ডিসেম্বর তারিখে। ঐদিন কীটনাশক দ্রব্য প্রস্তুতকারী ইউনিয়ন কার্বাইড কারখানায় মিক প্ল্যান্ট থেকে মিক (MIC) বা মিথাইল আইসো-সায়ানেট নামক অতি বিষাক্ত ও উদ্বায়ী গ্যাস মুক্ত পরিবেশের বায়ুতে মিশে গিয়ে ব্যাপক জীবনহানি ঘটায়। সরকারি রিপোর্ট অনুসারে ২৩০০ মানুষ এতে মারা পড়ে। দুলক্ষ মানুষ পঙ্গু হয়ে যায়। অসংখ্য জীবজন্তু (বিশেষতঃ গবাদি পশু) ও গাছপালা ধ্বংস হয়ে যায়।

দুর্ঘটনার দিন মিক গ্যাস ট্যাঙ্কের সংলগ্ন ফ্রিজ খারাপ হয়ে গ্যাসের উষ্ণতা 0°C থেকে বাড়িয়ে দেয়। অতঃপর কোনোভাবে গ্যাসটি জলের সংস্পর্শে আসে যার ফলে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অত্যাধিক তাপ ও চাপ তৈরি হলে ট্যাঙ্কের সেফটি ভালব খুলে ঐ বিষাক্ত গ্যাস বাতাসে ছড়িয়ে যায়। নিরাপত্তা ব্যবস্থাগুলি স্বাভাবিকভাবে চালু না থাকায় গ্যাসটি

দাহ্য হলেও পুড়িয়ে দেওয়া বা অন্য ট্যাঙ্কে স্থানান্তর করা সম্ভব হয়নি। দুর্ভাগ্যজনকভাবে কারখানার পাশের বস্তি অঞ্চলে থাকা হাজার হাজার মানুষ সতর্ক হবার সামান্যতম সুযোগটুকুও পাননি এবং অসহায়ভাবে মারা যান।

1952 সালে লন্ডনের সৃষ্ট বিষাক্ত সালফার ডাই-অক্সাইড ধোঁয়াশার ফলে তাৎক্ষণিকভাবে প্রায় 4 হাজার মানুষ মারা যায় এবং পরবর্তী কয়েক মাসে আর 8 হাজার মানুষ মারা যায়। 1979 সালে সোভিয়েত রাশিয়ায় একটি জৈব অস্ত্র গবেষণাগারে অ্যানথ্রেক্স যৌগ নিঃসরণের ফলে কয়েকশো মানুষ মারা যান।

(৪) **গৃহজাত বায়ুদূষণ :** মানুষের বাসগৃহ ও কর্মপ্রতিষ্ঠানে রন্ধন, বা উত্তাপ সৃষ্টির জন্য ব্যবহৃত জ্বালানীর অসম্পূর্ণ দহনের ফলে কার্বন মনোক্সাইড বা অবিশুদ্ধ জ্বালানী দহনের ফলে অন্যান্য ধাতব বা অধাতব অক্সাইড উৎপন্ন হয় যার অধিকাংশই বিষাক্ত। অত্যাধিক মাত্রায় উৎপন্ন কার্বন ডাই-অক্সাইড হলো পরিবেশের অবক্ষয় ঘটায়। এছাড়া জমা আবর্জনার পচন, নর্দমা ইত্যাদি থেকে অজৈব গ্যাস, জীবাণু ও ভাইরাস ইত্যাদির সৃষ্টি হয়। জমা জঞ্জাল পুড়িয়ে ফেলতে গিয়েও কিছু ক্ষতিকর গ্যাস তৈরি হয়। যেমন প্লাস্টিক দহন।

পৃথিবীর কিছু অংশে ভূপৃষ্ঠ থেকে রেডিও অ্যাকটিভ বিকিরণ ঘটে থাকে যার থেকে রেডন (Rn) গ্যাস উৎপন্ন হয়। গৃহ বা অন্য আবদ্ধ স্থানে এই গ্যাস বিকিরিত হতে না পারার ফলে মাটি সংলগ্ন একটি বিষাক্ত গ্যাস স্তর তৈরি হয়। রেডন গ্যাসের কারণে সাম্প্রতিককালে আমেরিকায় দুহাজার লোকের মৃত্যু ঘটেছে।

বাড়ি তৈরির কাজে ব্যবহৃত প্লাইউড ও কার্পেন্টিং পদার্থ থেকে ফরম্যালডিহাইড গ্যাস এবং রঙ, বার্নিশ ও রঙের দ্রাবক ইত্যাদি শুকানোর সময় তা থেকে বিভিন্ন জৈব যৌগের গ্যাস উৎপন্ন হয়। রঙ থেকে সীসা বা লেড অক্সাইড বায়ুতে মিশে যায়। ফায়ারপ্লেস বা রান্নার স্টোভ, উনুন, বার্নারে ব্যবহৃত কাঠ, কয়লা, কেরোসিন ইত্যাদি দহনে উৎপন্ন ধোঁয়া, গ্যাস এবং কঠিন কণা জাতীয় দূষণ শ্বাসকষ্ট তৈরি করে।

ধূমপানের ফলে কার্বন মনোঅক্সাইড এবং কিছু নিকোটিন যৌগ উৎপন্ন হয়, যা ধূমপায়ী এবং আশেপাশের সকল ব্যক্তির শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর।

**প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বায়ু দূষক :** বিভিন্ন প্রাকৃতিক বা মানুষের দ্বারা কৃত বায়ুদূষণ যার সম্বন্ধে জানলাম সেগুলি হলো উৎস থেকে সরাসরি সৃষ্ট বায়ুদূষণ। যাকে আমরা প্রাথমিক বা প্রত্যক্ষ বায়ুদূষক বলে থাকি। এই ধরনের কিছু দূষক পদার্থ বায়ুমণ্ডল বা পরিবেশের অন্য উপাদানের সংস্পর্শে এসে কোন বিক্রিয়ার ফলে আরও বেশি ক্ষতিকর দূষক তৈরি করে। যাদের পরোক্ষ দূষণ বলা যায়। উদাহরণ স্বরূপ বাড়ির রান্নাঘর, যানবাহন ও কলকারখানা নিঃসৃত ধোঁয়া ও রাসায়নিক পদার্থগুলি সূর্যের আলোর সংস্পর্শে আলোক রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে এক বিষাক্ত ধোঁয়াশা সৃষ্টি করে। যার মধ্যে বিভিন্ন অ্যালডিহাইড ও কিটোন যৌগ, পার অক্সি অ্যাসিটাইল নাইট্রেট ইত্যাদি বায়ুদূষক মিশ্রিত থাকে। কিছু দূষক প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ উভয় ভাবেই সৃষ্টি হতে পারে। বিভিন্ন ধাতুর কণা বাতাসের অক্সিজেনর সংস্পর্শে উপযুক্ত তাপ ও চাপ পেলে বিষাক্ত অক্সাইড বা জলের সংস্পর্শে অ্যাসিড বাষ্প তৈরি করে। যেমন আগ্রায় যমুনা তীরবর্তী পেট্রোলিয়াম শোধনাগার নিঃসৃত সালফার ডাই-অক্সাইড ঐ অংশের বায়ুতে অত্যধিক পরিমাণে মিশে যায় এবং পরে জলীয় বাষ্পের সাথে যুক্ত হলে সালফিউরিক অ্যাসিড ($H_2SO_4$) তৈরি করে যা তাজমহলের মার্বেল পাথরকে অনেকাংশে ক্ষয়প্রাপ্ত করে তুলেছে।

**বনাঞ্চলে হ্রাস :** নির্বিচারে নগরায়ন এবং শিল্পায়নের প্রয়োজনে অতি দ্রুত হারে বনাঞ্চল ধ্বংস করার ফলে প্রকৃতিতে সবুজ উদ্ভিদের অনুপাত প্রাণীর তুলনায় অত্যন্ত কমে গেছে। সবুজ উদ্ভিদ, যা সালোকসংশ্লেষ কালে বায়ুর কার্বন ডাই-অক্সাইড হ্রাস করে বিশুদ্ধ অক্সিজেন উৎপন্ন করে পরিবেশকে নির্মল রাখতো তা আজ বিলুপ্ত প্রায়।

বর্ধিত জনসংখ্যার চাহিদা পূরণে বসতিঅঞ্চল, শিল্পাঞ্চল ও কৃষিজমির পরিমাণ অত্যাধিক বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে বনভূমি, পাহাড়ি বাগিচা ইত্যাদি পুড়িয়ে বা কেটে জায়গা করা হচ্ছে। আবার কৃষি জমির ফসলের অবশেষ পুড়িয়েও গ্যাস উৎপন্ন হচ্ছে। প্রতিবছর ক্রান্তীয় বনাঞ্চলের প্রায় ৩ কোটি বনভূমি এভাবে নষ্ট হচ্ছে। অর্থাৎ কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের শোষক সবুজ উদ্ভিদ অন্তর্হিত হচ্ছে এবং অপরপক্ষে একই সাথে উৎপন্ন কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ অস্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া পূর্বে আলোচিত উপায়ে প্রচুর দূষক গ্যাস বিশেষতঃ কার্বন মনোক্সাইড ও কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রধান শহরগুলি ঘনবসতির কারণে দূষণের পরিমাণ বিপদসীমা ছাড়িয়ে প্রচণ্ডভাবে বেড়ে গেছে।

**সূক্ষ্ম কঠিন কণাজাত কিছু বিশেষ প্রকার বায়ুদূষণ :** বায়ুমণ্ডলে সর্বদাই নানা প্রকার সূক্ষ্ম কঠিন কণার অস্তিত্ব বর্তমান। যদি কিছু সূক্ষ্ম কণার বেশি মাত্রায় উপস্থিতি পরিবেশের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে তবে তা বায়ুদূষণ রূপে চিহ্নিত হয়।

(১) **ধুলো—** বিভিন্ন বস্তুর প্রক্রিয়াকরণের সময় তার সূক্ষ্ম কণা বায়ুতে মিশে যায়, যা বায়ুর প্রবাহমানতার ফলে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে আরও সূক্ষ্মকণা রূপে বায়ুতে থেকে যায়। যেমন, কাঠ বা কয়লার গুঁড়ো, ছাই, বালি, সিমেন্ট ইত্যাদি। এইসব কঠিন কণার মাপ সাধারণতঃ 0.1 থেকে 75 মাইক্রন পর্যন্ত হয়।

(২) **বাষ্প—** রাসায়নিক শিল্প ও খনিজ শিল্প থেকে উদ্ভুত বাষ্পের ঘনীভবনের ফলে সূক্ষ্ম কঠিন বস্তুকণায় রূপান্তর। কণার মাপ 0.03 মাইক্রন থেকে 0.3 মাইক্রন।

(৩) **মিস্ট—** বিভিন্ন রাসায়নিক শিল্প বা প্রক্রিয়াজাত কারণে উৎপন্ন বাষ্পের ঘনীভবনের ফলে সূক্ষ্ম তরল কণার সৃষ্টি যা বায়ুতে ভাসমান অবস্থায় থাকে। কণার মাপ 0.5 মাইক্রন থেকে 3 মাইক্রন পর্যন্ত হতে পারে।

(৪) **ধোঁয়া—** কার্বনজাত বস্তুর অসম্পূর্ণ দহনের ফলে উৎপন্ন কঠিন কণা যুক্ত বায়ু। কণার মাপ 0.05 মাইক্রন থেকে 1 মাইক্রন পর্যন্ত হতে পারে।

### ৫.২.৩ বায়ুদূষণের ক্ষতিকারক ফলাফল

পূর্বে আলোচিত বিভিন্ন উৎস থেকে সৃষ্ট বায়ুদূষক পদার্থগুলি ক্রমাক্রমে বায়ুমণ্ডলে মিশে বায়ুর স্বাভাবিক মিশ্রণের অনুপাতকে প্রভাবিত করছে। বায়ু দূষিত হলে সেই বায়ুতে শ্বাস নেওয়ার সময় ক্ষতিকর গ্যাসীয় পদার্থ ও কার্বন কণাগুলি মানুষ ও অন্য প্রাণীর দেহে মিশে যাচ্ছে। ক্ষেত্রবিশেষের ফলে মৃত্যু হওয়ায়ও অসম্ভব নয়। বায়ুতে উপস্থিত বিভিন্ন সূক্ষ্ম কঠিন কণা নিঃশ্বাসের মাধ্যমে ফুসফুসে জমা হলে তার ফলে বিভিন্ন রোগ দেখা দিতে পারে। যেমন বালিকণা জমে সিলিকোসিস, কয়লার গুঁড়ো থেকে অ্যানথ্রাকোসিস, অ্যাসবেসটস্ থেকে অ্যাসবেসটোসিস্ ইত্যাদি। বায়ুদূষণের ফলে উদ্ভিদের ফলন ও বৃদ্ধিতেও নানা ক্ষতি ঘটে। এছাড়া বাড়ি বা সৌধের বাইরে দেওয়ালে ক্ষয়ক্ষতি ঘটে। কয়েকটি প্রধান দূষকের ক্ষতিকর প্রভাব এখানে ব্যাখ্যা করা হলো।

**কার্বন মনোক্সাইড (CO)—** গ্যাসটি একটি বিষাক্ত পদার্থ। এটি বায়ুতে মিশে গেলে মাথাযন্ত্রণা, শ্বাসকষ্ট, বমিভাব, ক্লান্তি ইত্যাদি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এটি হৃদযন্ত্রের পক্ষে ক্ষতিকর এবং রক্তে অক্সিজেনের পরিবহন ক্ষমতা কমিয়ে দেয়। বায়ুতে অধিক মাত্রায় কার্বন মনোক্সাইডের উপস্থিতি মৃত্যুর কারণ হতে পারে।

**সালফার ডাই-অক্সাইড ($SO_2$)—** বিষাক্ত ধোঁয়া সৃষ্টি করে। বায়ুতে মিশে মানুষের শরীরের সংস্পর্শে এলে চোখ জ্বালা করে, শ্বাসনালীতে প্রদাহ হয়, নাক, গলা ও ফুসফুসের ক্ষতি করে। ব্রংকাইটিস, হাঁপানি থেকে ক্যান্সার পর্যন্ত ঘটতে পারে।

বায়ুর অক্সিজেন ও জলীয় বাষ্পের সাথে মিশে সালফিউরিক অ্যাসিড ($H_2SO_3$) তৈরি করে যা অ্যাসিড বাষ্প ও অ্যাসিড বৃষ্টি ঘটায়। অ্যাসিড বৃষ্টির ফলে ফসলের ক্ষতি হয়, বনাঞ্চলের সবুজ উদ্ভিদের পাতার ক্লোরোফিল (যা তার খাদ্য উপাদানের আধার) নষ্ট করে উদ্ভিদের ক্ষতি করে এর ফলে রবিশষ্য ও ফলের চাষ প্রচণ্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, বিষাক্ত ধোঁয়াশা সৃষ্টি করে এটি বহু মানুষের প্রাণহানি ঘটাতে পারে এবং বাড়ি, সৌধ ইত্যাদির বহির্গাত্রে ক্ষয় সৃষ্টি করতে পারে।

**নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড ($NO_2$)—** বাতাসে অধিক পরিমাণ নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড উপস্থিত থাকলে ফুসফুস ও হৃৎযন্ত্রের অসুখ দেখা দেয়। শ্বাসনালী এবং স্বরনালীতে জ্বালা করে ও ক্ষয় ঘটে। নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস, স্নায়ুজাত রোগ দেখা দেয়। ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি সংক্রামক রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা কমে যায়। এই গ্যাসের বাতাসে মাত্র 0.05 শতাংশ উপস্থিতিই মানুষের মৃত্যুর কারণ হতে পারে। অপরপক্ষে উদ্ভিদের উপরেও এর ক্ষতিকর প্রভাব অত্যন্ত প্রকট। যদিও উদ্ভিদের খাদ্য উৎপাদনের বা অর্থাৎ সালোকসংশ্লেষ পদ্ধতির জন্য নাইট্রোজেন ঘটিত যৌগ প্রয়োজন কিন্তু তাদের ক্ষেত্রেও বাতাসে $NO_2$ বা নাইট্রোজেনের অন্যান্য অক্সাইডগুলি যেমন $N_2O$ বা নাইট্রোজেনের অক্সাইডগুলি যেমন $N_2O$, NO, $N_2O_5$ ইত্যাদির উপস্থিতি ক্ষতিকারক হয়ে দেখা দেয়। এর ফলে উদ্ভিদের পাতার সবুজ রঙ বা ক্লোরোফিল কণা নষ্ট হয়, ফলে সালোকসংশ্লেষের হার কমে উদ্ভিদের বৃদ্ধি ব্যবহৃত হয়। চারাগাছ বা লতাজাতীয় উদ্ভিদ শুকিয়ে যায়।

**হাইড্রোজেন সালফাইড ($H_2S$)—** বাতাসে এই গ্যাসের উপস্থিতি শিল্প কারখানায় দূষণ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা না থাকার ফল। এই গ্যাসের কারণে শরীরে তাৎক্ষণিকভাবে স্নায়ুর রোগ (যেমন মাথা ধরা) হয় শরীরের উন্মুক্ত অংশে, চোখ ও শ্বাসনালীতে জ্বালা করে, ক্ষুধামন্দ, হজম না হওয়া, গা বমি ভাব, শ্বাসকষ্ট দেখা যায়।

**ওজোন ($O_3$)—** বাতাসে ওজোন গ্যাসের উপস্থিতির ফলে মাথা যন্ত্রণা চোখের রোগ ইত্যাদি তাৎক্ষণিক সমস্যা দেখা দেয়। এই গ্যাসের উপস্থিতি দীর্ঘস্থায়ী ও অধিক পরিমাণ হলে (যা একান্তই প্রকৃতিবিরুদ্ধ) তা শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট করে এবং ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস, ফুসফুসে রক্তক্ষরণ ও ক্যানসার জাতীয় রোগের সূত্রপাত ঘটাতে পারে। সবুজ উদ্ভিদের পাতা ক্লেরোসিস রোগে হলুদ হয়ে যায়।

**ক্লোরিন ($Cl_2$)—** অ্যাসিড বা ধাতু নিষ্কাষণ প্রভৃতি শিল্পজাত ক্লোরিন বা ধাতব ক্লোরাইড গ্যাসগুলির বাতাসে উপস্থিতি শ্বাসকষ্ট এবং চোখের রোগ বৃদ্ধি করে।

**হাইড্রোকার্বন যৌগ—** বেঞ্জিনের জাতীয় যৌগ বাতাসে বেশী মাত্রায় উপস্থিত থাকলে শ্লেষা বৃদ্ধি করে শ্বাসনালী রুদ্ধ করে দেওয়া, ফুসফুসের ক্ষতি, ক্যানসার রোগ প্রভৃতি ঘটে। ইথিলিন বা অ্যাসিটিলিনের প্রভাবে উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষের হার কমে যায় ফলস্বরূপ ফসল উৎপাদন, বৃক্ষের বৃদ্ধির ব্যাহত হয়।

(১) কলকারখানা, শিল্প ক্ষেত্রে এবং জনজীবনে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি এবং যানবাহন থেকে নির্গত গ্যাসকে সরাসরি বাতাসে ছাড়ার আগে যান্ত্রিক উপায়ে পরিশুদ্ধ করা। যানবাহন ও রান্নাঘরে জ্বালানীর দহনে সৃষ্ট গ্যাসে কার্বন ডাই-অক্সাইড ছাড়া যে বিষাক্ত পদার্থগুলি নানাভাবে সৃষ্ট হয় তার দূরীকরণে ব্যবস্থা নিতে হবে। এই পদার্থগুলি ফিল্টার সাইক্লোন সেপারেটর (ধুলোময়লা অপসারণের জন্য), ক্যাটালাইটিক কনভার্টার (যানবাহন থেকে নির্গত কার্বন মনোক্সাইড ও হাইড্রোকার্বন যৌগগুলির জারণের অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতিকর দূষকে রূপান্তরিত করার জন্য), ইলেকট্রোস্ট্যাটিক প্রেসিপিটার (অত্যন্ত সূক্ষ্ম বস্তুকণা পৃথক করার জন্য বিশেষত তামা, দস্তা শিল্পে ব্যবহৃত হয়) প্রভৃতি যন্ত্র ব্যবহার করে পৃথক করা হয়।

(২) উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে এমন পদ্ধতি অবলম্বন করা হবে যার ফলে দূষিত পদার্থের উৎপাদন কমে যাবে। ফলে যানবাহন, যন্ত্রপাতি, কলকারখানা থেকে গ্যাস বা কঠিন দূষণকারী কণার নিঃসারণ নিয়ন্ত্রিত হয়।

(৩) দহনের জন্য ব্যবহারের পূর্বে জ্বালানীর বিশুদ্ধকরণ করতে হবে, যার ফলে লেড ও ক্ষতিকর ধাতব অক্সাইড প্রভৃতি বিষাক্ত ধাতুজাত রাসায়নিক দূষণ উৎপাদন কমবে।

(৪) জীবাশ্ম জ্বালানীর ব্যবহার কম করতে হবে। ধাতুনিষ্কাশন চুল্লী নির্গত গ্যাস ও ধোঁয়াকে পরিস্রুত করে বাতাসে ধোঁয়াশা বিশেষত সালফার ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ কমাতে হবে।

(৫) যথেষ্ট পরিমাণে গাছ লাগিয়ে বনসৃজন করতে হবে যার ফলে পরিবেশে অতিরিক্ত কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ হ্রাস পায়।

(৬) অপ্রচলিত বা চিরাচরিত শক্তির উৎস সন্ধান ও তার সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে কয়লা, পেট্রোলিয়াম দহনের পরিমাণ কমাতে হবে।

(৭) কাঠের চোরাচালান ব্যবসা বন্ধ করতে হবে এবং বিকল্প বস্তু নির্মিত আসবাবের ব্যবহার শুরু করতে হবে।

(৮) জৈব আবর্জনার সঠিক রূপান্তর ঘটাতে হবে যাতে মিথেন গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধি না পায়।

(৯) ক্লোরোফ্লুরোকার্বনের ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করতে হবে।

(১০) তেজস্ক্রিয় দূষণ রোধের জন্য পারমাণবিক গবেষণারগুলিতে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। X-ray মেশিন, রেডিওথেরাপির সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ পোশাক ও অন্যান্য তেজস্ক্রিয়তা রোধক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

## ৫.৩ জলদূষণ (Water Pollution)

বিশুদ্ধ জল হল দুই পরমাণু হাইড্রোজেন ও এক পরমাণু অক্সিজেন দ্বারা গঠিত একটি যৌগ ($H_2O$)। পৃথিবী পৃষ্ঠে স্বাভাবিকভাবে পাওয়া জলে বিভিন্ন জৈব, অজৈব পদার্থ, নানা ভৌত ও রাসায়নিক কণা এবং নানা জীবাণু ইত্যাদি ভাসমান বা দ্রবীভূত অবস্থায় থাকতে পারে। যদি এই ধরনের কোন উপস্থিতির ফলে জলের গুণগত মানের বিশেষভাবে অবনতি ঘটে এবং ঐ জল কৃষিকাজ ও পানীয় হিসাবে ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ে তবে আমরা একে জলের দূষণ বলে চিহ্নিত করে থাকি।

**সংজ্ঞা :** জলের মধ্যে কোন অবাঞ্ছিত পদার্থ মিশে যাবার ফলে যদি জলের ভৌতধর্ম বা রাসায়নিক ধর্ম বা জৈব বৈশিষ্ট্য ও গুণমানের এমন কোন পরিবর্তন হয় যার ফলে জলজ উদ্ভিদ বা প্রাণী বা মানুষের ক্ষতির সম্ভাবনা ঘটে তবে সেই পরিবর্তনকে জলদূষণ বলা হয়।

### ৫.৩.১ জলদূষণের উৎস

(১) মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ফলে তার দ্বারা ব্যবহৃত ভূপৃষ্ঠ সংলগ্ন জলের উৎসগুলি দূষিত হয়। ঘরবাড়ির দৈনন্দিন আবর্জনা মাটিতে ফেলার ফলে মাটির ভৌম জলস্তর দূষিত হয় এবং জলে নানা রাসায়নিক ও রোগসৃষ্টিকারী জীবাণু মিশে যায়। মাটির ভৌমজল থেকে ঐ দূষণ পার্শ্ববর্তী ছোট ছোট জলাধার যেমন পুকুর, কুয়ো

ইত্যাদির জলকে দূষিত করে। ফলে জলে বিভিন্ন রঙ ও দুর্গন্ধ তৈরি হয়। প্রাথমিক ভাবে জল ঘোলাটে হয়ে ওঠে, পরে দূষণের পরিমাণ ও প্রকৃতি অনুসারে লালচে, সবুজ বা কালো হয়ে যায়। সাধারণভাবে জৈব অ্যামাইনোর উপস্থিতিতে জলে আঁশটে গন্ধ, জৈব হিউমাসের উপস্থিতিতে সোঁদা গন্ধ, হাইড্রোজেন সালফাইড বা ফসফরাস যুক্ত জলে পচা ডিমের গন্ধ থাকে।

(২) শিল্প কারখানাগুলির পরিত্যক্ত আবর্জনা ও উদ্বৃত্ত রাসায়নিক পদার্থ সাধারণত নর্দমা দিয়ে সংলগ্ন কোন জলের উৎসে স্থানান্তর করা হয়, যেমন সমুদ্র, নদী, খাল ইত্যাদি। ঐ সব আবর্জনার মধ্যে বিভিন্ন ধাতু যেমন সীসা, তামা, দস্তা ক্যাডমিয়াম বা বিভিন্ন ধাতব যৌগ, জৈব পদার্থ এবং অজৈব সালফার, ফসফরাস, ফ্লুওরিন ঘটিত যৌগ থাকে। এগুলি জলকে দূষিত করে। বিভিন্ন শিল্পের ক্ষেত্রে ক্ষতিকর শিল্পজাত বর্জ্য পদার্থগুলির মধ্যে প্রধান কয়েকটি হলো—

(ক) পরমাণু শক্তিকেন্দ্রে ফ্লোরাইড যৌগ,

(খ) গ্যাস ও কোক শিল্পজাত অ্যামোনিয়া, ফেনল সায়ানাইড, সালফাইড যৌগ,

(গ) রং ও ব্যাটারী শিল্পজাত সীসা ও সীসার অক্সাইড,

(ঘ) মদ ও অন্য রাসায়নিক শিল্পজাত অজৈব অ্যাসিড, ফেনল যৌগ এবং জৈব অ্যাসিড,

(ঙ) তৈল শোধনাগার, পেট্রো রসায়ন শিল্প ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে ব্যবহৃত হাইড্রোকার্বন যৌগ, তেল, চর্বি, গ্রিজ ইত্যাদি,

(চ) চর্মশিল্পে ব্যবহৃত ট্যানিক অ্যাসিড, ফেনল, সালফাইড ও ক্রোমিয়াম যৌগ,

(ছ) সার শিল্পের উপজাত ফসফেট ও ক্লোরাইড যৌগ ইত্যাদি।

(৩) শহর ও গ্রামের সাধারণ শৌচব্যবস্থায় প্রত্যেক নর্দমা উন্মুক্ত হয় কোন বৃহৎ জলাশয় যেমন খাল, নদী, সমুদ্র ইত্যাদিতে এবং তার পূর্বে দূষিত জলের শোধনের কোনও উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। এছাড়া বৃষ্টির জল আস্তাকুঁড়, খাটাল, শ্মশান, ভাগাড়ের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে জলাধার গুলিতে গিয়ে পড়লে তা দূষণ সৃষ্টি করে।

(৪) গৃহস্থলীর কাজে সাবান ও ডিটারজেন্ট দিয়ে জামাকাপড়, বাসনপত্র ধোয়া হয়, যার ফলে বর্জ্য জলে স্থায়ীভাবে কিছু ক্ষতিকর রাসায়নিক পদর্থের অনুপ্রবেশ ঘটে যার পরিশোধন বেশ কঠিন।

(৫) জৈব আবর্জনা যেমন গাছের পাতা, মৃত প্রাণীর দেহাবশেষ, ক্ষুদ্র জলজ উদ্ভিদ, কীটপতঙ্গ পচনের ফলে পচনশীল সূক্ষ্ম জৈব কণা, রোগজীবাণু, ভাইরাস, ব্যাকটিরিয়া প্রভৃতির উদ্ভব ঘটে।

(৬) দুর্ঘটনা বা যুদ্ধবিগ্রহের ফলে খনিজ তেল ও তেলের উপজাত দ্রব্যাদি সমুদ্রে পড়লে তা প্রাণঘাতী দূষণ সৃষ্টি করে। জাহাজ ডুবি, দুটি জাহাজের মধ্যে বা কোন জাহাজের সাথে চোরাপাহাড়, ডুবোপাথর, হিমশৈলের ধাক্কা, ট্যাঙ্কার থেকে ছিদ্রপথে তেল চুঁইয়ে পড়া, সমুদ্রে ট্যাঙ্কার সাফ করা, সমুদ্রগর্ভের তৈলক্ষেত্র থেকে তেল উত্তোলনের সময় দুর্ঘটনা, সমুদ্র তলদেশের তেলের পাইলাইনগুলি থেকে তেল পড়া ইত্যাদি ভাবে সমুদ্রে তেল মিশতে পারে। বর্তমানকালে ইরাক-ইরান-কুয়েত সংলগ্ন সমুদ্রে যুদ্ধ লাগার ফলে তেল ঢেলে শত্রুপক্ষের ক্ষতি করার চেষ্টায় সমুদ্রের হাজার হাজার প্রাণী মারা গেছে। সমুদ্রের উপরিতলে ভাসমান তেলের আস্তরণ তৈরি হচ্ছে, যার ফলে জলের উদ্ভিদ ও প্রাণীর শ্বাসকার্য ও জীবনধারণে সমস্যা হচ্ছে। ঐ তেল জলবাহিত হয়ে বিরাট এলাকায় সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্র এবং উপকূলবর্তী অঞ্চলের জীবনযাত্রাকে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে।

(৭) পারমাণবিক অস্ত্র, বোমা ইত্যাদি সমুদ্রতলে পরীক্ষামূলকভাবে বিস্ফোরণ করার ফলে প্রবল হারে সামুদ্রিক প্রাণীর মৃত্যু ও দীর্ঘস্থায়ী রাসায়নিক দূষণের সৃষ্টি হয়।

(৮) তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি থেকে নির্গত গরম জলে বিভিন্ন ধাতব যৌগ মিশে জলাশয়ের উষ্ণতা বৃদ্ধি করে এবং জলের ভৌত, রাসায়নিক ও জৈব ধর্মের পরিবর্তন ঘটায়।

(৯) অ্যাসিড বৃষ্টির ফলে জলে অম্ল ধর্ম দেখা দেয়। ফলে শুধু পানীয় হিসাবেই নয় স্নান এবং কৃষিকার্যে ব্যবহারের পক্ষেও ঐ জল দূষিত বলে গণ্য হয়।

প্রধানতঃ বাতাসে $SO_2$ ও $NO_2$ গ্যাসের দূষণ থেকে অ্যাসিড বৃষ্টির সৃষ্টি হয়।

$$2SO_2 + O_2 = 2SO_3$$

$$H_2O + SO_3 = H_2SO_4$$

$$H_2O + NO_2 = H_2NO_3$$

বাতাসের জলীয় বাষ্পের সাথে দ্রবীভূত অবস্থায় এই অ্যাসিড অণুগুলি থাকে যা বেশি ঘনীভূত অবস্থায় শিশির ও বৃষ্টির জলে দ্রবীভূত হয়ে পৃথিবীতে এসে পড়ে।

(১০) কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহৃত অতিরিক্ত পরিমাণ সার, বিষাক্ত কীটনাশক পদার্থ ও আগাছানাশক ওষুধ ইত্যাদি থেকে নাইট্রেট, ফসফেট, পটাশের নানা যৌগ তৈরি হয়। এছাড়া জলের প্রবাহমানতার দরুণ ক্ষয়প্রাপ্ত মাটির কণার সাথে পেট্রোলিয়াম যৌগ মিশে জল দূষণ ঘটায়।

### ৫.৩.২ **বিশুদ্ধ জলের ধর্ম ও গুণাবলি**

জলের বিশুদ্ধতা এবং গুণাগুণ নির্ভর করে তার সকল ভৌত, রাসায়নিক ধর্ম এবং জৈব প্রকৃতির উপর। কতগুলি ভৌতধর্ম যা জলের বিশুদ্ধতা বিচারে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ তা এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

(১) **দ্রবীভূত বা ভাসমান পদার্থ :** জলে নানাধরনের পদার্থ ভাসমান বা দ্রবীভূত অবস্থায় থাকতে পারে। ভাসমান সূক্ষ্ম বস্তুকণা, জৈব পদার্থ (যেমন তন্তু, তুলা, শৈবাল, জীবাণু ইত্যাদি) অথবা অজৈব পদার্থ (যেমন মাটি, পাথর, ইট ইত্যাদি) দূষণ হিসাবে উপস্থিত থাকতে পারে। কিছু পদার্থ সরাসরি দূষণ হিসাবে কাজ করে যেমন ব্যাকটিরিয়া জীবাণু ইত্যাদি, আবার কিছু পদার্থ অন্য কোন পদার্থের সাথে বিক্রিয়া করলে উৎপন্ন যৌগটি দূষক পদার্থ হয়। জৈব পদ্ধতিতে জৈব দূষণ থেকে ক্ষতিকর পদার্থ উৎপন্ন হয়। জলে ভাসমান কণাজাতীয় দূষণকে ফিল্টার পদ্ধতিতে শোধন করা হয়।

(২) **ধাতব আধানের উপস্থিতি :** উৎস অনুসারে বর্জ্য জলে নানা ধরনের ধাতুর তড়িৎযুক্ত পরমাণু উপস্থিত থাকে। সাধারণতঃ আমরা ক্ষতিকর তড়িৎ আধান রূপে চিহ্নিত করে থাকি মার্কারী, আর্সেনিক, অ্যান্টিমনি, ক্রোমিয়াম, ক্যাডমিয়াম, বেরিয়াম, কোবাল্ট প্রভৃতি ধাতুর আনয়কে, যা অল্পমাত্রাতেই বিষাক্ত হয়ে পড়ে। এছাড়া স্বল্প ক্ষতিকর ধাতু হিসাবে আছে— সোডিয়াম, আয়রন, ম্যাঙ্গানিজ, অ্যালুমিনিয়াম, জিঙ্ক ইত্যাদি।

ধাতব তড়িৎ আধানের মূল উৎস হল নানা রাসায়নিক শিল্প, তড়িৎ প্রলেপন এবং ধাতব দ্রব্যের ফিনিশিং-এর জন্য। জলে কোন ধাতুর আধান আছে, তা জানা থাকলে রাসায়নিক পদ্ধতি ব্যবহার করে ধাতুটিকে অন্য কোন পদার্থের সাথে বিক্রিয়া করে অদ্রাব্য অধঃক্ষেপ উৎপন্ন করে পৃথক করে নেওয়া সম্ভব।

(২) ক্ষারতা— ক্ষারতার মাপক মাত্রা হলো pH, বিশুদ্ধ জলের pH প্রায় সাত। এর কম pH যুক্ত জলকে আম্লিক এবং এর থেকে বেশি pH যুক্ত জলকে ক্ষারীয় বলা হয়। আম্লিক ও ক্ষারীয় উভয় প্রকার জল ক্ষতিকর। তাই জলের pH সর্বদা সাতের কাছাকাছি হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন।

(৩) বর্ণ ও গন্ধ— বিশুদ্ধ জল বর্ণহীন এবং গন্ধহীন। কেবলমাত্র দ্রবীভূত বা ভাসমান কণার জন্য জলে বর্ণ বা গন্ধ দেখা দিতে পারে। বিভিন্ন রাসায়নিক শিল্পের (প্রধানত কাপড় বা অন্য দ্রব্যে রঙ করা) উৎবৃত্ত বর্জ্য জলে রঙিন দূষক কণার উপস্থিতি থাকে। যা আমাদের শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক। বর্ণ ও গন্ধ জলে দূষণের পরিচায়ক।

(৪) তাপমাত্রা — জলে উপস্থিত নানা জৈব ও অজৈব পদার্থ জলের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। জলের তাপমাত্রার উপর ঐ জলে বসবাসকারী উদ্ভিদ-প্রাণী ও জীবাণুদের জীবন নির্ভর করে। সাধারণত ভূতলস্থিত জল ও শিল্পের বর্জ্য জলে তাপমাত্রা বেশি থাকে যা কোনও ভাবে জলাশয়ে মিশলে জলাশয়ের তাপমাতার তারতম্য সৃষ্টি করে।

(৫) দ্রবীভূত অক্সিজেন (Dissolved Oxygen)— পরিমাণ যেহেতু জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণী জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনকে শ্বাসগ্রহণের কাজে ব্যবহার করে, তাই জলে উপস্থিত অক্সিজেনের পরিমাণ ঐ সব প্রাণীদের জীবনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এই পরিমাণকে প্রকাশ করা হয় DO মাত্রা রূপে। জলজ উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষ এবং বায়ুর অক্সিজেন হল জলে উপস্থিত অক্সিজেনের উৎস।

**জৈব অক্সিজেন চাহিদা (Biological Oxygen Demand — BOD) :**

জৈব অক্সিজেনের চাহিদা (Bilogocial Oxygen Demand) বা সংক্ষেপে BOD বলতে জলে উপস্থিত জৈব পদার্থ যেমন জলজ ব্যাকটিরিয়া এবং অন্যান্য অণুজীবীদের স্বাভাবিক কাজকর্ম ও বাড়বৃদ্ধির জন্য জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের চাহিদা বা ক্রমহ্রাসমান অবস্থাকে বোঝানো হয়। এটি ‘‘মিলিগ্রাম প্রতি লিটার’’ এককে প্রকাশ করা হয়।

শিল্প-কারখানা বা পৌর এলাকায় ব্যবহৃত বর্জ্য জলে উপস্থিত জৈব পদার্থগুলি কিছু অতি ক্ষুদ্র জলচর প্রাণীর খাদ্য। ঐ সব জৈব বস্তুকে জৈব ক্ষয়িষ্ণু (biodegradable) বলে। যেমন শর্করা, প্রোটিন, স্নেহজাতীয় পদার্থ, অ্যালকোহল, অ্যালডিহাইড, এস্টার ইত্যাদি এবং উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহাবশেষ। জল এই সকল জৈব পদার্থ দ্বারা দূষিত হলে সেই দূষিত পদার্থকে রাসায়নিকভাবে বিয়োজিত করার জন্য প্রয়োজন ব্যাকটিরিয়া ও অণুজীবী প্রাণী। আমরা সাধারণভাবে জানি যে জল যত বেশী পরিমাণ দূষিত হবে, ততই সেই জলে উপস্থিত ব্যাকটিরিয়া ও জীবাণুরা সংখ্যায় বাড়বে এবং নিজেদের বেঁচে থাকার প্রয়োজনে জলে উপস্থিত দূষিত পদার্থকে পচিয়ে পুষ্টিসঞ্চয় করতে চাইবে। এর জন্য জলে উপস্থিত অক্সিজেন বেশি পরিমাণে ব্যবহৃত হতে থাকবে। ফলে দূষিত জলে জীবাণুর সংখ্যা যত বাড়বে দ্রবীভূত অক্সিজেনর পরিমাণ তত কমবে। জৈব পদার্থের জীবাণুঘটিত ক্ষয় হয় দুই প্রকারে—

(১) সবাত প্রক্রিয়ায় কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জল উৎপন্ন হয় অক্সিজেন দ্বারা দূষক জৈব পদার্থের জারণ ঘটে।

(২) অবাত প্রক্রিয়া হলো বিজারণ পদ্ধতি যার দ্বারা হইড্রোকার্বন, কার্বন ডাই-অক্সাইড, অ্যামোনিয়া, হাইড্রোজেন সালফাইড প্রভৃতি উৎপন্ন হয়।

অর্থাৎ জলে উপস্থিত জৈবক্ষয়িষ্ণু দূষক জৈবিক পদার্থের পরিমাণ ওই জলে উপস্থিত আণুবীক্ষণিক প্রাণীদের অক্সিজেন চাহিদা থেকে পরিমাপ করা হয়। অর্থাৎ জৈব অক্সিজেন চাহিদা দ্বারা আমরা জলের জৈব দূষণের মাত্রা

নির্ণয় করি এবং প্রতি লিটার বর্জ্য জলে উপস্থিত জৈব পদার্থের সবাত জৈব ক্ষয়ের জন্য যত মিলিগ্রাম অক্সিজেন প্রয়োজন তাকে ওই জলের BOD মাত্রা বলা হয়। পরীক্ষামূলক ভাবে ওই মান নির্ণয়ের জন্য কোন জলের নমুনাকে পাঁচদিন 20°C তাপমাত্রায় রেখে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ কতটা কমেছে তা পরিমাপ করা হয়।

**রাসায়নিক অক্সিজেন চাহিদা (Chemical Oxygen Demand) :**

কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রে ব্যবহৃত জলে প্রায়ই বিভিন্ন জটিল জৈব যৌগের দূষণ ঘটে যা দ্রুত জৈব ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না এবং এদের পরিমাণ BOD দ্বারা মাপা সম্ভব। এগুলি সাধারণভাবে যথেষ্ট স্থায়ী জৈব যৌগ যা সহজে বিয়োজিত হয় না এবং বহু বছর জলে অবিকৃত অবস্থায় থেকে যায়। কেবলমাত্র বিশেষ ধরনের কোন জীবাণুর উপস্থিতিতে ধীর গতিতে বিয়োজিত হয়। এগুলি স্থায়ী এবং অত্যন্ত ক্ষতিকর দূষণ।

উদাহরণস্বরূপ ক্লোরিনযুক্ত যৌগ, ফিনল এবং ফিনল জাতীয় জটিল হাইড্রোকার্বন, কিছু সাবান জাতীয় যৌগ, কীটনাশক পদার্থের মধ্যে অবস্থিত জৈব যৌগ। এই ধরনের পদার্থের মোট পরিমাপকে বলা COD হয়।

জৈব উপায়ে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না এমন রাসায়নিক পদার্থের জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেনকে ওই জলের রাসায়নিক অক্সিজেন চাহিদা বলা হয় এবং মিলিগ্রাম প্রতি লিটার এককে প্রকাশ করা হয়।

### ৫.৩.৩ জলদূষণের ফলে মানবদেহে সৃষ্ট রোগব্যাধি

জলবাহিত ব্যাধি হলো কোনও মাইক্রোঅর্গানিসম্-এর সংক্রমণ যা প্রধানতঃ পানীয় জল বা খাদ্য প্রস্তুতির কাজে ব্যবহৃত জলের দূষণের ফল। পৃথিবীতে গড়ে প্রতি বছর জলবাহিত রোগের কারণে প্রায় ২ মিলিয়ন মানুষের মৃত্যু ঘটেছে (WHO-এর তথ্যানুসারে) অবিশুদ্ধ জলপান, শৌচালয়ের অপরিচ্ছিন্নতা বা অস্বাস্থ্যকর উপায়ে জলের ব্যবহার থেকে। জলবাহিত রোগগুলির সংক্রমণ প্রধান কারণ হয় প্রোট্রোজোয়া বা ভাইরাস বা জীবাণু (ব্যাকটিরিয়া) বা আন্ত্রিক পরজীবী (intestinal parasites) প্রভৃতির সংক্রমণ। নিচের তালিকায় প্রধান কয়েকটি জলবাহিত রোগ, তাদের ধারক বাহক এবং রোগের উপসর্গ ও প্রকোপের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল।

**ব্যাকটিরিয়া ঘটিত রোগ :**

দূষিত জল থেকে ব্যাকটিরিয়া সংক্রমণে নানান ধরনের রোগ হতে পারে। যেমন পানীয় ও খাদ্য প্রস্তুতে ব্যবহৃত জলের দূষণ থেকে বিভিন্ন রোগ দেখা দেয়। যেমন—

(i) **কলেরা :** জলদূষণের থেকে সৃষ্টি হওয়া এই রোগ প্রায়শঃই ভারতের নানা গ্রাম বা মফঃস্বল এলাকায় মহামারী আকারে দেখা দেয়। এর ফলে রোগী দিনে ৩০-৫০ বার জলের মতো পায়খানা ও বমি করে। ফলে শরীর থেকে অতিরিক্ত পরিমাণ জল বেরিয়ে গিয়ে অত্যধিক দুর্বলতা, মাথা ঘোরা প্রভৃতি উপসর্গও দেখা দেয়। এটি একটি সংক্রামক রোগ, এর প্রতিরোধের জন্য টীকা নেওয়া প্রয়োজন।

(ii) **টাইফয়েড :** দূষিত জল পান করলে এই প্রকার জ্বর দেখা দেয়। এই রোগ ব্যাকটিরিয়া বাহিত এবং খাবার বা জলে মাছি বসার ফলে এটি ছড়ায়। এই রোগের ফলে প্রচণ্ড জ্বর, শরীরে ব্যাথা, মাথাযন্ত্রণা ও পেটের অসুখ দেখা যায়।

**ভাইরাস ঘটিত রোগ :**

জলের দূষণ থেকে বিভিন্ন ভাবে মানবদেহে নানা ভাইরাস ঘটিত রোগ হয়ে থাকে যেমন, হেপাটাইটিস্ A ও B, পোলিও, ভাইরাস ঘটিত নানা ধরনের জানা ও অজানা জ্বর ও প্রাসঙ্গিক রোগ ব্যধি।

(ii) **হেপাটাইটিস্ B—** এটি খাদ্য ও জলে ভাইরাস সংক্রামণের ফলে ঘটে থাকে। শিশুরা দ্রুত এই রোগে আক্রান্ত হয়। এই রোগে মুখ-চোখ ও শরীরের চামড়ায় হলুদ রঙের আভা দেখা যায়। পেটে ব্যথা, বমি ভাব ও হজমের সমস্যা হয়। এই রোগের সঠিক চিকিৎসা না হলে লিভারে ক্যান্সার হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

(iii) **পোলিও—** এই রোগ শিশুদের দেহে দ্রুত সংক্রান্ত হয়। এর থেকে অঙ্গ বিকৃতি এবং প্যারালিসিস্ হবার আশঙ্কা তৈরি হয়। জন্মের পর বেশ কয়েকবার প্রতিরোধক টীকা গ্রহণ করলে এই রোগের সম্ভাবনা নির্মূল হয়।

**রাসায়নিক দূষণ ঘটিত রোগ :**

জলে উপস্থিত বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ থেকে নানা ধরনের রোগ হতে পারে যেমন—

(i) আর্সেনিক যৌগ থেকে শরীরের বিভিন্ন অংশে নানা মারাত্মক রোগ হতে পারে। পরে আমরা এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করবো।

(ii) জলে উপস্থিত নানা ধাতব যৌগ থেকে চর্মরোগ ও পেটের অসুখ হতে পারে।

(iii) জলশোধনের জন্য ব্যবহৃত রাসায়নিকের অপরিমিত ব্যবহার এবং জল থেকে সেগুলি পৃথকীকরণ না করতে পারার ফলে জল দূষিত হয়। যেমন ক্লোরিন, ফ্লুরিন ঘটিত যৌগ মিশ্রিত পরিশোধক। এই ধরনের দূষিত জল ব্যবহার করার ফলে চর্মরোগ থেকে শুরু করে যকৃৎ ফুসফুস বা হৃদযন্ত্রের সমস্যা বা প্যারালিসিস এবং হাড়ের গঠনে বিকৃতি ঘটতে পারে। বিশেষতঃ মায়ের শরীরে দূষণের সংক্রমণ ঘটার ফলে তার শিশু বিকৃত অঙ্গ নিয়ে জন্মগ্রহণ করতে পারে।

| রোগ | সংক্রামণ স্থান | বাহক জীবাণু | জলে উপস্থিতির কারণ | রোগের উপসর্গ |
|---|---|---|---|---|
| ১) অ্যামিবিয়াসিস্ | হাত থেকে মুখ পর্যন্ত | প্রোটোজোয়া | অপরিশোধিত পানীয় জল, খাল বা নদীনালা, বদ্ধ জলে মাছির বসবাস | তলপেটে ব্যথা, ক্লান্তি, ওজন কমে যাওয়া, বার বার বমি-পায়খানা, গ্যাসের ব্যথা; জ্বরভাব |
| ২) জিয়ারডিয়া | ” | ” | অপরিশোধিত জলের সংস্পর্শ, জীবাণু নাশক ব্যবহার না করা, ভাঙ্গা পাইপের ফুটোর মধ্যে দিয়ে দূষিত ভৌমজলের প্রবেশ, মানুষ ও জীবজন্তুর একই উৎস থেকে জল খাওয়া বা স্নান। | ডায়রিয়া, তলপেটে অস্বস্তি, গ্যাসের উপদ্রব। |
| ৩) ক্রিপ্টোস্পোরি-ডিওসিস্ | মুখ ও গলা | ” | ফিল্টারের জালি বা ভেতরের পাত্রটি জীবাণুমুক্ত না করার ফলে সেখানে এই প্রোটোজোয়া জন্ম নেয়, অন্য জীবজন্তুর শরীর ও বর্জ্য থেকে বিল ইত্যাদিতে গিয়ে মেশে। | ফ্লু, বারবার বমি ও পাতলা পায়খানা, শরীরের ওজন কমে যাওয়া, হজম শক্তি নষ্ট হওয়া, স্টমাকের বৃদ্ধি, গ্যাস হবার প্রবণতা। |
| ৪) স্কিস্টোসোমিয়াসিস্ | মুখ | প্যারাসাইট | প্রবাহমান দূষিত জলে আঁশ শামুকের খোল ইত্যাদিতে এই প্রকার প্যারাসাইট্ অবস্থান করে। | গায়ের চামড়ায় জ্বালা, চুলকানি জ্বর ভাব, সর্দি-কাশি এবং পেশিসঞ্চালনে সমস্যা। |
| ৫) ম্যালেরিয়া | রক্ত | প্রোটোজোয়া | স্ত্রী অ্যানোফিলিস মশা এই রোগ বহন করে। খোলা জায়গায় পরিষ্কার জলে এই মশা প্রচুর পরিমাণে বংশবিস্তার করে। | কাঁপুনি দিয়ে দ্রুত জ্বর আসা, ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে যাওয়া, দুর্বলতা ওজন হ্রাস। |

**আর্সেনিক দূষণ :**

অতিরিক্ত আর্সেনিকের উপস্থিতির কারণে জলে সৃষ্ট দূষণকে আর্সেনিক দূষণ বলে।

আর্সেনিক একটি অধাতব মৌল যা ধাতুর সঙ্গে বিক্রিয়া করে বিভিন্ন বিষাক্ত ধাতব যৌগ তৈরি করে যেমন আর্সিনেট্স, আর্সিন গ্যাস, আর্সিনাইটস্, আর্সেন অক্সাইড ইত্যাদি যা জলে বা মাটিতে উপস্থিতি সমস্ত পরিবেশকে দূষিত করে। আর্সেনিক ব্যবহার— আর্সেনিক ঘটিত যৌগগুলি বিষাক্ত ও ক্ষতিকর হলেও তা বিভিন্ন প্রয়োজনে প্রায়ই ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যেমন—

(১) কৃষিক্ষেত্রে কীটনাশক হিসাবে, (২) রঙ, ওষুধ, সাবান, ব্যাটারী ইত্যাদি নির্মাণে এবং ইলেকট্রনিক শিল্পে, (৩) কাঠকে পচন এবং কীটের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য রাসায়নিক উপাদান হিসাবে, (৪) গবাদি পশুর দেহে কীট ইত্যাদির সংক্রমণ রোধ করার জন্য।

সাম্প্রতিক কালে মাটিতে গভীর নলকূপ খোঁড়ার ব্যাপকতার জন্য মাটির গভীর স্তরে অবস্থিত আর্সনিক বিষাক্ত যৌগে পরিণত হয়ে পানীয় জলে মিশে যাচ্ছে। বিজ্ঞানীদের ধারণা অনুসারে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভারত, বাংলাদেশ, মায়ানমার, চীন, শ্রীলঙ্কা, তাইওয়ান, রাশিয়া ইত্যাদি দেশের মাটির গভীর স্তরে আর্সেনিকের অস্তিত্ব আছে। নলকূপ খোঁড়ার ফলে ওই আর্সেনিকের সাথে জল, বায়ুর অক্সিজেনের বিক্রিয়া ঘটে এক বিষাক্ত জলে দ্রাব্য পদার্থ সৃষ্টি হয়। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে আর্সেনিক আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ১০ লক্ষের বেশি।

আর্সেনিক দূষণের ফলে মানুষ ও গবাদি পশুর শরীরে নানান মারাত্মক ব্যাধির সৃষ্টি হয় যেমন— আর্সেনিক দূষণের ফলে মানবদেহে সৃষ্ট রোগকে আর্সেনিকোসিস্ বলে। এর উপসর্গগুলি হলো—

(১) চামড়া, নখ, চুলে আর্সেনিক জমে হাতে পায়ে কালো দাগ, অ্যালার্জি, ফুসকুড়ি, চুলকানি হয়। নখে সাদা খাঁজ সৃষ্টি হয়।

(২) গায়ে এবং মুখে নীলচে ছোপ দেখা যায়। পায়ে কালো রঙের ঘা তৈরি হয়।

(৩) ফুসফুসের রোগ, হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিস হয়।

(৪) যকৃত ও মূত্রনালীতে রোগ দেখা দেয়।

(৫) উদ্ভিদের কোষ আর্সেনিক আক্রান্ত হয়ে নষ্ট হয়ে যায়।

(৬) জীবজন্তুর দেহে আর্সেনিকের প্রভাবে চর্মরোগ, যকৃত বা ফুসফুসের রোগ হয়।

(৭) সার্বিক আর্সেনিক দূষণের ফলে মাটি, ভৌমজলস্তর এবং বায়ু দূষিত হয়।

### ৫.৩.৪ জলদূষণ নিয়ন্ত্রণ ও দূরীকরণের উপায়

জলদূষণের উৎস ও বিভিন্ন ক্ষতিকর প্রভাবগুলি সম্বন্ধে আমরা পূর্বে জেনেছি। এখানে আমরা জলদূষণ প্রতিরোধ পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করবো।

**জলদূষণ নিয়ন্ত্রণ** — জলদূষণ প্রতিরোধে প্রকার কর্তব্য হলো জলে দূষণের অনুপ্রবেশকে বন্ধ করা ও পর্যাপ্ত সাবধানতা অবলম্বনে দূষণের নিয়ন্ত্রণ। জল দূষণ নিয়ন্ত্রণের কয়েকটি উপায় হলো—

(১) জলের প্রধান প্রধান আধার অর্থাৎ নদী, পুকুর, খাল-বিল, হ্রদ এবং সমুদ্রে সরাসরি আবর্জনা বা শিল্পে ব্যবহৃত জল ফেলা বন্ধ করা।

(২) কোনও নদী, পুকুর বা সমুদ্রে জল ফেলার আগে জলকে উপযুক্ত পদ্ধতিতে পরিশোধিত করা।

(৩) পুকুর বা নদীর পাড়ে জামাকাপড় বা বাসনপত্র ডিটারজেন্ট দিয়ে ধোয়া এবং গবাদী পশুর স্নান করানো বন্ধ করা।

(৪) চাষ আবাদের কাজে অতিরিক্ত পরিমাণ সার ও কীটনাশক পদার্থের প্রয়োগ বন্ধ করা।

(৫) সমুদ্রের জলে তেল ছড়িয়ে পড়া বন্ধ করা।

(৬) আবর্জনা দিয়ে পুকুর বা জলাশয় ভরাট করা এবং এইভাবে বসবাসযোগ্য পৌর এলাকা বা শিল্পাঞ্চলের জন্য জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করার প্রক্রিয়া বন্ধ করা।

(৭) পরিবেশ বিদ্যা, দূষণের প্রকৃতি ও প্রভাব ইত্যাদি বিষয়ে জনসচেতনা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

(৮) জলদূষণ সংক্রান্ত আইন প্রবর্তন ও তার সঠিক প্রয়োগে দূষণ রোধ করার ব্যবস্থা নেওয়া। জলদূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রথম ১৯৭৪ সালে প্রতিরোধ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়ন হয় যা ১৯৭৮ সালে সংশোধিত হয়। পরবর্তীকালে ১৯৭৭, ১৯৮৮ এবং ১৯৯১ সালে জল দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধে সেস্ আইন প্রণয়ন করা হয়। যদিও সাধারণ লোকের মধ্যে এই আইনের ধারা এবং তার প্রয়োগ বিষয়ে সচেতনতার অভাব আছে।

জলদূষণ নিয়ন্ত্রণ আইনের প্রধান উদ্দেশ্য হলো—

(i) জলদূষণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ।

(ii) জলের গুণগত মান বজায় রাখা।

(iii) জলদূষণ আইন কার্যকরী করার ক্ষেত্রে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদকে পূর্ণ অধিকার দান।

**বর্জ্য জলের শোধন ও দূষণ দূরীকরণ :** শিল্প ও পৌর কার্যে ব্যবহৃত বর্জ্য জলের পরিশোধনের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলো হলো—

(i) ভাসমান কঠিন পদার্থ (ভৌত, রাসায়নিক, জৈব) দূরীকরণ এর জন্য অধঃক্ষেপন, পরিস্রাবণ, অভিস্রাবণ, ভাসন, পাতন ইত্যাদি ভৌত পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হয়।

(ii) জৈব ক্ষয়িষ্ণু পদার্থ দূরীকরণ-এর জন্যও বিশেষ জৈব পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হয়।

(iii) বিভিন্ন জৈব বা অজৈব পদার্থ যেমন, নাইট্রোজেন, ফসফরাস ইত্যাদির যৌগ ঘটিত দূষণ, যা সহজ পদ্ধতিগুলির সাহায্যে দূর করা যায় না তার জন্য রাসায়নিক পদ্ধতির প্রয়োগ। প্রধানতঃ এক্ষেত্রে অক্সিজেনের জারণ-বিজারণ পদ্ধতি ও রাসায়নিক ব্যবহার করা হয়।

**দূষিত জল পরিশোধন পদ্ধতি :** জাতীয় ও রাজ্য পরিবেশনীতি অনুসারে জলদূষণের মান নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত আবশ্যক। তাই শিল্প কারখানা ও পৌর এলাকায় ব্যবহৃত জল পরিশোধন না করে কোনও জলাধারে যেমন পুকুর, নদী, সমুদ্র ইত্যাদিতে ফেলা পরিবেশ বিরুদ্ধ কাজ। সেজন্য শিল্পক্ষেত্রের বর্জ্য জল এবং পৌর এলাকায় ব্যবহৃত জল বিভিন্ন পদ্ধতিতে পরিশোধন করা প্রয়োজন। দূষিত জল পরিশোধনের কয়েকটি পদ্ধতি এখানে আলোচনা করা হল।

**পরিস্রাবণ—** এই পদ্ধতিতে জলে ভাসমান (অদ্রাব্য) কঠিন কণাজাতীয় দূষণ দূর করা হয়। দূষিত জলকে বিভিন্ন তারজালির মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত করা হয়। প্রথমে বড়ো আকারের ছিদ্রযুক্ত জালি ও পরে অপেক্ষাকৃত ছোট ছিদ্রযুক্ত জালির মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত করার ফলে বিভিন্ন আকারের দূষিত কঠিন ভাসমান কণা পৃথক হয়ে যায়।

**অধঃক্ষেপণ—** জলে ভাসমান সূক্ষ্ম আকারের কঠিন কণাজাতীয় দূষণ দূর করার জন্য দূষিত জলকে একটি বৃহৎ জলাধারের মধ্যে দিয়ে খুবই ধীর গতিতে প্রবাহিত করা হয়। এর ফলে কঠিন কণাজাতীয় দূষণ জলাধারের তলায় অধঃক্ষিপ্ত হয়।

**ট্রিকলিং ফিলটার—** এটি দ্রাব্য বা অদ্রাব্য জৈব দূষক দূরীকরণের এক পুরাতন এবং উপযোগী পদ্ধতি। এখানে একটি দীর্ঘ চোঙাকৃতি পাত্রে অজস্র নুড়িপাথরের স্তরের মধ্যে দিয়ে জলকে উপর থেকে নীচে প্রবাহিত করা হয়। নুড়ির মধ্যে দিয়ে বায়ুচলাচলের জন্য উপরও নীচের স্তরে তাপমাত্রায় যথেষ্ট ফারাক সৃষ্টি করা হয়ে থাকে। ফলতঃ নুড়িগুলির উপরে জৈব স্তর গঠন হয় যা অত্যন্ত ঘন হলে তাকে পৃথক করে নেওয়া হয়। স্তরটির মধ্যে প্রবাহিত হওয়ার পর জল অন্য একটি জলাধারে সঞ্চয় করা হয়। নুড়িগুলির উপর সঞ্চিত জৈব স্তরের মধ্যে থাকা ছত্রাক, শৈবাল, ভূমি প্রভৃতি প্রাণী জলে উপস্থিত জৈব দূষণকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে জলকে বিশুদ্ধ করে।

**সক্রিয় গাদ পদ্ধতি—** এই পদ্ধতিতে বর্জ্য জলের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে জীবাণুকণার উপস্থিতি বায়ুর বুদবুদের স্রোত প্রবাহিত করা হয়। ফলে জীবাণুদের বসবাসের উপযুক্ত পরিবেশ গঠিত হয়। ওই সব জীবাণু জলে উপস্থিত জৈব দূষণকে গ্রহণ করে বেঁচে থাকে। এইভাবে জৈবক্ষয়ের মাধ্যমে জলের জৈবদূষক পদার্থ দূর করে এবং উপজাত পদার্থরূপে কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হয়।

**জারণ—** জলে উপস্থিত বেশ কিছু অধাতব যৌগ যেমন নাইট্রোজেন বা ফসফরাস যৌগ, যার অধিকাংশ বিষাক্ত দুষক পদার্থ তা অক্সিজেনের উপস্থিতিতে জারণ পদ্ধতি দ্বারা দূর করা হয়। প্রয়োজনীয়তা অনুসারে অক্সিজেন সরবরাহের জন্য নিয়ন্ত্রিত উপায়ে বায়ু সঞ্চালন করা হয়ে থাকে। এই পদ্ধতিতে বিষাক্ত দূষক পদার্থকে অদ্রাব্য অধঃক্ষেপ পরিণত করে পৃথক করা হয় অথবা এমন কোন দ্রাব্য পদার্থে পরিণত করা হয়।

এছাড়া শিল্পক্ষেত্রের বর্জ্য জলে নানা অম্ল বা ক্ষার জাতীয় পদার্থ থাকে। ওই ধরনের বর্জ্য জলমুক্ত পরিবেশে উন্মুক্ত করার আগে বিশেষ পদ্ধতিতে প্রশমন করা উচিত।

সারণী-১ : পানীয় জলের গুণ মান নির্ণয় : নির্ধারিত জাতীয় মাত্রা

| জলের বৈশিষ্ট্য/দ্রবীভূত পদার্থ | ISI বা ভারতীয় জাতীয় মান অনুসারে সর্বোচ্চ অনুমোদন যোগ্য দূষণের সীমা |
|---|---|
| (১) ক্ষারতা (pH মাত্রা) | 5.0 – 9.2 |
| (২) দ্রাব্য অক্সিজেন (DO) | 3.0 ppm |
| (৩) ক্লোরাইড যৌগ | 1000 মিলিগ্রাম প্রতি লিটারে |
| (৪) সালফেট যৌগ | 400 মিলিগ্রাম প্রতি লিটারে |
| (৫) সায়ানাইড যৌগ | 0.05 মিলিগ্রাম প্রতি লিটারে |
| (৬) আর্সেনিক যৌগ | 0.05 মিলিগ্রাম প্রতি লিটারে |
| (৭) লেড যৌগ | 0.05 মিলিগ্রাম প্রতি লিটারে |
| (৮) ক্রোমিয়াম যৌগ | 0.05 মিলিগ্রাম প্রতি লিটারে |
| (৯) ফ্লুওরাইড যৌগ | 1.50 মিলিগ্রাম প্রতি লিটারে |

লোকালয়ের পানীয় জলের প্রধান উৎসগুলি এই দূষণ সীমা যাতে অতিক্রম করে না যায় সেদিকে জনসাধারণ ও প্রশাসন সবারই খেয়াল রাখা উচিত। প্রতি মাসে অন্তত একবার উন্মুক্ত ক্ষুদ্র জলাশয় যেমন পুকুর, কূয়া, নলকূপ ইত্যাদি শোধন করানো প্রয়োজন।

**পানীয় জলবাহিত রোগ প্রতিরোধের পদ্ধতি :** সাধারণ ফিলটার ব্যবহার করে শুধুমাত্র ভারী অদ্রাব্য বস্তুকণা ও কঠিন পদার্থ ছাড়া অন্য কোন দূষণ পরিশোধন করা সম্ভব নয়। অতিবেগুনী রশ্মির ব্যবহার এবং অক্সিজেন কণার পরিচলনের দ্বারা শোধন করা জল অপেক্ষাকৃত বেশী নিরাপদ। সব থেকে ভালো হল পানীয় জল ফুটিয়ে খাওয়া।

(১) পানীয় জল 10-20 মিনিট ফুটিয়ে তারপর ঠাণ্ডা করে খাওয়া উচিত। এছাড়া পানীয় জল পরিশোধনের জন্য লিটার প্রতি ১টা করে হ্যালোজেন ট্যাবলেট দিয়ে আধঘণ্টা পর সেই জল পান করা যায়। জল রাখার এবং খাবার বাসনপত্র জীবাণুমুক্ত এবং পরিচ্ছন্ন রাখা প্রয়োজন। স্যাঁতসেতে বা নোংরা জায়গায় খাবার জল খোলা রাখা উচিত নয়।

(২) পাতকুয়ো পরিশোধনের জন্য ৩০০-৫০০ গ্রাম ব্লিচিং পাউডার ঢেলে তার কমপক্ষে ১২ ঘণ্টা পর সেই পাতকুয়ো থেকে উপরের বেশ কিছুটা জল প্রথমে ফেলে দিয়ে বাকি জল প্রয়োজনমত ব্যবহার করা যাবে।

(৩) গভীর নলকূপ বা টিউবওয়েলের ক্ষেত্রে তার সাথে যুক্ত পাম্প মেশিনটি প্রথমে খুলে নিয়ে নলের মধ্যে ৩-৪ চামচ ব্লিচিং পাউডার ঢেলে যন্ত্রটি আবার আগের মতো লাগিয়ে দিতে হবে। এক্ষেত্রেও কমপক্ষে বারো ঘণ্টা পর প্রথমে উপরিতলে বেশ কিছুটা জল বের করে ফেলে দিয়ে তারপর বাকি জল ব্যবহার করা যাবে।

## ৫.৪ ভূমিদূষণ (Land Pollution)

ভূ-পৃষ্ঠের তিনের-এক ভাগেরও কম (প্রায় 20%) অংশ নিয়ে স্থলভাগ গঠিত। এই স্থলভাগের উপরেই মানুষ ও অন্যান্য স্থলবাসী জীবের বাসস্থান। ভূমির গুণগত মানের ওপর এদের বেঁচে থাকা নির্ভর করে। মানুষের বেশির ভাগ কাজকর্ম, যেমন— কৃষি, খনন, শিল্প প্রভৃতি ভূমি কেন্দ্রিক, সভ্যতার অগ্রগতি এবং প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে মানুষ ভূমির ওপর আঘাত হেনেছে। মানুষের প্রয়োজনে অনেক বনাঞ্চল ধ্বংস হয়েছে; অনেক জীব প্রজাতি বিলুপ্ত হয়েছে; এবং ভূ-সম্পদের যথেষ্ট অবনমন বা ক্ষতি ঘটেছে। পৃথিবীতে জীবনের অস্তিত্ব রক্ষার ক্ষেত্রে আজকের দিনে ভূমির অবনমন বা ভূমি দূষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ দুর্ভাবনার বিষয়।

যদিও পৃথিবীতে সামগ্রিক ভাবে কর্ষিত জমির পরিমাণ বেশ কম, দক্ষিণ এশিয়ায় এর শতকরা পরিমাণ (45%) পৃথিবীর মধ্যে সর্বোচ্চ। যুক্তরাষ্ট্র (25%), আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র (21%), জার্মানী (35%), ফ্রান্স (35%) এবং অন্যান্য উন্নত দেশগুলিতে এই হার মাঝারি। আবার সাহারাবর্তী (Sub-Saharan) আফ্রিকা (7%) ও অস্ট্রেলিয়ার (6%) মোট জমির খুব সামান্য অংশই কৃষিজমি।

**সারণি-২ : ভূ-পৃষ্ঠে জমি বণ্টনের প্রকৃতি (বিলিয়ন হেক্টর এককে, 1 বিলিয়ন 1=100 কোটি)**

| ভূ-পৃষ্ঠের মোট জমি | কৃষিযোগ্য জমি | স্থায়ী তৃণভূমি ও পশুচারণ ভূমি | বনাঞ্চল বৃক্ষভূমি | অন্যান্য জমি (নিষ্ফলা ও অকৃষি যোগ্য জমি) |
|---|---|---|---|---|
| 13.00 | 1.44 | 3.66 | 3.89 | 4.31 |
| (100%) | (11%) | (26%) | (30%) | (33%) |

একথা সহজেই বোঝা যে পৃথিবীর মোট জমির পরিমাণ স্থির এবং অফুরন্ত নয়। ভূমি প্রকৃতিরই অঙ্গ; এর যথেচ্ছ অপব্যবহারের ফলে ভূমি ক্ষয় ও দূষণ সংঘটিত হচ্ছে। ভূমিতে খাদ্য উৎপাদিত হয়, গড়ে ওঠে আশ্রয় স্থল— এমনকি ভোগ্য পণ্যের যোগানের জন্যও মানুষ ভূমির উপর নির্ভর করে। মানুষ ভূমিকে প্রাকৃতিক সম্পদ অপেক্ষা ভোগ্যবস্তুর যোগানদার হিসাবে বেশি ভেবেছে। তাই প্রাকৃতিক ব্যবস্থাগুলি (natural systems) মানুষের লোভজনিত অত্যাধিক ব্যবহারের ফলে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

ভূমিকে কোন রসায়নাগারে কৃত্রিম উপায়ে তৈরি করা সম্ভব নয়। তাই ভূমিক্ষয় ও ভূমি দূষণ হতে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায় হল ভূমি সংরক্ষণ ও ভূমিকে দূষিত হতে না দেওয়া।

### ৫.৪.১ মৃত্তিকা (Soil)

ভূতলের পাতলা আবরণ মৃত্তিকা (আপেলের খোসার মত পাতলা মাত্র 30-40 মিটার পুরু) জীবজগতের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মৃত্তিকা জল ধরে রাখতে পারে এবং উদ্ভিদ ও অসংখ্য অনুজীবের (microorganisms) বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। বেশিরভাগ উদ্ভিদ তাদের বেঁচে থাকার জন্য মাটি থেকে পুষ্টি পদার্থ সংগ্রহ করে। কাজেই পরিবেশগত ভাবে মৃত্তিকার যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। শিলার আবহবিকারের (Climatic erosion) ফলে উৎপন্ন রেগোলিথ (regolith)-এর ওপর জলবায়ু, উদ্ভিদ, ভূ-সংস্থান ইত্যাদির অন্তক্রিয়ার জন্য মৃত্তিকার উদ্ভব ঘটে। মৃত্তিকার তিনটি স্বতন্ত্র অনুভূমিক (horizontal) তল দেখা যায় যথাক্রমে

A, B ও C অনুভূমিক তল। এদের মধ্যে সবচেয়ে ওপরের A স্তর থেকে ধৌত-প্রক্রিয়ায় (leaching) পদার্থের অপসারণ মধ্যবর্তী B স্তরে A স্তর থেকে চুঁইয়ে আসা পদার্থের সঞ্চয় এবং সবচেয়ে নিচের C স্তরটিতে আদি শিলা (parent rock) দেখা যায়। মৃত্তিকার বৈশিষ্ট্যগুলি, যেমন উর্বরতা মান, বিশেষ ধরনের জলবায়ুগত ও স্বাভাবিক উদ্ভিদ সম্পর্কিত পরিবেশে ধৌত-প্রক্রিয়ায় অপসারিত এবং সঞ্চিত পদার্থের পরিমাণের ওপর নির্ভরশীল।

সকল কৃষিকাজের জন্য মৃত্তিকার উর্বরতামান বিশেষ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু অত্যাধিক ব্যবহার ও অবিবেচনাপ্রসূত কৃষিপদ্ধতি অবলম্বনের জন্য মৃত্তিকার মানের অবনমন ঘটে। প্রতিবছর শত শত কোটি টন উপরি মৃত্তিকা (top soil) অপসারণের ফলে ভূমির ধারণ ক্ষমতা কমে যাচ্ছে, যা কৃষিকাজের পক্ষে দুশ্চিন্তার বিষয়।

### ৫.৪.২ মৃত্তিকার অবনমনের কারণ ও তার প্রতিকার (Cause of Soil degradation and its prevention)

মৃত্তিকার অবনমন বা ভূমি দূষণের তিনটি প্রধান কারণ হল—

(i) ভূমিক্ষয়, (ii) জমিতে যথেচ্ছ রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার এবং (iii) ভূমিতে লবণাক্ত জলের অধিক্য।

উপরোক্ত তিনটি প্রধান কারণ ছাড়াও ভূমি দূষণের আর একটি অন্যতম কারণ হল বর্জ্য পদার্থের অধিক্য।

**(i) ভূমিক্ষয় (Soil erosion) :** ভূমির উপরিভাগের মৃত্তিকার এক স্থান থেকে অপর স্থানে পরিবাহিত (transportation) হওয়ার ঘটনাকে ভূমিক্ষয় বলা হয়। যদিও ইহা একটি বায়ু ও জল প্রবাহজনিত প্রাকৃতিক ঘটনা, কিন্তু ইহা অতিমাত্রায় ত্বরান্বিত হয় মানব সমাজের বিভিন্ন কার্যাবলীর জন্য। যেমন— চাষ আবাদ, নির্মাণ কার্য, অরণ্যচ্ছেদন, অবাধ গবাধি পশুচারণ এবং জমির উপরিভাগের তৃণরাজি পোড়ানো (burning of grass cover)।

ভূমিক্ষয়ের ফলে মৃত্তিকার উর্বরতা ও জলধারণ ক্ষমতা কমে যায়। মৃত্তিকার উপরিভাগের ক্ষয় জলাভূমিকে ভরাট করে এছাড়াও জলকে ঘোলাটে করে দূষিত করে, ফলে জলজ জীবকুলের জীবন বিপন্ন হয়।

প্রাকৃতিক ভাবে 1 ইঞ্চি (2.5 সে.মি.) মৃত্তিকা তৈরি হতে সাধারণ ভাবে 200-1000 বছর সময় লাগে। কিন্তু ভূমিক্ষয় যদি ভূমি গঠন অপেক্ষা দ্রুততর হতে থাকে তাহলে ইহা একটি প্রাকৃতিক সম্পদের অপূরণীয় ক্ষতি হিসাবে পরিগণিত হবে। যা সুদূর ভবিষ্যতে মানব সমাজের কাছে এক বিপদবার্তা বহন করবে।

এই ভূমিক্ষয় রোধের অন্যতম প্রধান উপায় হল-বিজ্ঞান সম্মত ভাবে ভূমির সংরক্ষণ এবং ব্যবহার।

ভূমি সংরক্ষণ সাধারণত প্রধান দুটি প্রক্রিয়ায় করা হয়ে থাকে।

(a) এলাকা ভিত্তিক ভূমি সুরক্ষা (Area treatment which involves treating the land)

(b) প্রণালী গঠনের মাধ্যমে ভূমি সুরক্ষা (Drainage-line treatment, which involves treating the natural water courses)

**(a) এলাকাভিত্তিক ভূমি সুরক্ষা (Area treatment, which involves treating the land)**

| উদ্দেশ্য (Purpose) | প্রক্রিয়া (Treatment measure) | ফলাফল (Effect) |
|---|---|---|
| (1) বৃষ্টিপাতজনিত ক্ষয় রোধ। | অনাবাদি জমিতে বৃক্ষরোপণ | মৃত্তিকার অপসারণ হ্রাস |
| (2) মাটির জলধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি। | জলধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধির বিভিন্ন প্রক্রিয়া যেমন খাল ও নালা তৈরি এবং বাঁধ দেওয়া। | ভূমির আর্দ্রতা বৃদ্ধি। |
| (3) মৃত্তিকার ন্যূনতম অপসারণ। | পুকুর, বাঁধ ইত্যাদি নির্মাণ করে বৃষ্টিপাতের অতিরিক্ত জল সঞ্চয় করা। | মৃত্তিকার আর্দ্রতা বৃদ্ধি এবং ভূগর্ভে কৈশিক জলের বৃদ্ধি। |
| (4) ভূমিতে ধাপে ধাপে উপত্যকার সৃষ্টি। | বৃষ্টিপাত বা জল প্রবাহের ফলে ভূমির উপরি স্তরের মাটি যাতে সরাসরি বাহিত না হয়ে ধাপে, ধাপে বাহিত হয়। | এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এর ফলে ভূমির ধস রোধ করা যায় এবং ভূমির ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। |

**(b) প্রণালী গঠনের মাধ্যমে ভূমি সুরক্ষা (Drainage-line treatment)**

| উদ্দেশ্য (Purpose) | প্রক্রিয়া (Treatment measure) | ফলাফল (Effect) |
|---|---|---|
| (1) ভূমির ধস ও পলিমাটির অপসারণ রোধ। | উৎপত্তি স্থলেই ধস রোধ করা। | ভূমিক্ষয় রোধ করে এবং ভূগর্ভস্থ জলের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। |
| (2) জল প্রবাহের গতিহ্রাস ও উপরিভাগের স্বচ্ছ জলের অধোগমণ করানো। | নালাগুলিতে ছোট ছোট বাঁধ তৈরি। | জলপ্রবাহের গতি হ্রাস এবং ভূগর্ভস্থ জলের পরিমাণ বৃদ্ধি। |

**(ii) জমিতে যথেচ্ছ রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার (Excess use of fertilizers and pesticides) :**

পৃথিবীতে প্রায় 25% শস্য উৎপাদনে রাসায়নিক সার ব্যবহৃত। গত কয়েক দশক ধরে রাসায়নিক সারের ব্যবহার উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। মাটির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধিতে এবং শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য রাসায়নিক সারের ব্যবহার অনস্বীকার্য। রাসায়নিক সার থেকে প্রাপ্ত তিনটি প্রধান উপাদান পটাশিয়াম, ফসফরাস এবং নাইট্রোজেন যৌগ মাটির পুষ্টি বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। কিন্তু রাসায়নিক সারের অধিক মাত্রায় ব্যবহারের ফলে কৃষিজমির নিজস্ব উর্বর ক্ষমতা দিনে দিনে হ্রাস পাচ্ছে যা ভূমি দূষণের কারণ।

এছাড়া সবচেয়ে বড় সমস্যা হল রাসায়নিক সারের সাথে অধিক মাত্রায় কীটনাশকের ব্যবহার।

**কীটনাশক ব্যবহারের সমস্যা (Problems with pesticide use) :**

যে সমস্ত রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করে অবাঞ্ছিত ছত্রাক, কীটপতঙ্গ ও আগাছা ধ্বংস করা হয় তাকে কীটনাশক বলে।

কীটনাশককে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়, যেমন— পতঙ্গনাশক (insecticides), ছত্রাক নাশক (fungicides), ইঁদুর নাশক (rodenticides) এবং আগাছা নাশক (herbicides)।

কীটনাশক শুধু অবাঞ্ছিত কীটপতঙ্গের ক্ষতি করে না, বৃহত্তর জীব সমাজ (মানব সমাজ) এবং জীব চক্রেরও ক্ষতি করে।

স্থায়ীত্বের দিক দিয়ে কীটনাশক দুই প্রকার— ক্ষণস্থায়ী এবং দীর্ঘস্থায়ী।

ক্ষণস্থায়ী কীটনাশকের কার্যক্ষমতা সাময়িক এবং এর ক্ষমতাও স্বল্প। ফলে ইহা তাৎক্ষণিক অবাঞ্ছিত কীটপতঙ্গ নাশে সহায়তা করে কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী কোনো প্রভাব ফেলে না, ফলে ভূমি দূষণে এর ভূমিকা স্বল্প।

দীর্ঘস্থায়ী কীটনাশক যেমন DDT, সহজে নষ্ট হয় না। ইহা ব্যবহারের ফলে জমিতে এবং জীবদেহে দীর্ঘদিন সঞ্চিত হয়ে থাকে। DDT মূলত মশা নাশক, ইহা ব্যবহারের প্রথম দশকে (1942-1952) মশবাহিত রোগের প্রকোপ থেকে প্রায় 50 লক্ষ জীবন বাঁচিয়েছে। কিন্তু কিছু সময় ব্যবহারের ফলে মশা ও অন্যান্য কীটপতঙ্গের শরীরে DDT-এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে ওঠে (immuned)। ফলে ইহা কীটনাশক রূপে কার্যকর হয় না কিন্তু এর ক্ষতিকর প্রভাব ভূমি অর্থাৎ পরিবেশে এবং মানবদেহে দেখা যায়। কীটপতঙ্গ নাশে ব্যবহৃত এই দীর্ঘস্থায়ী কীটনাশকগুলি ভূমির মধ্যে থেকে যায় এবং মৃত্তিকা কণার সঙ্গে মিশে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বাহিত হয়। যার ফলে বিস্তৃত এলাকার মাটি দূষিত হয়।

কীটনাশক ব্যবহারের আর একটি ক্ষতিকর দিক হল অবাঞ্ছিত কীটপতঙ্গ নাশের সাথে সাথে অনেক উপকারী কীটপতঙ্গ ধ্বংস করে। কীটনাশক ব্যবহারকারী এবং কীটনাশক ব্যবহৃত শস্য গ্রহণকারী উভয়ের কীটনাশকের প্রভাবে স্বাস্থ্যহানি ঘটে। দীর্ঘদিন ধরে স্বল্প পরিমাণ কীটনাশকের ব্যবহারেও ক্যানসার (cancer)-এর মতো মারণ রোগও হতে পারে।

এর ফলে বর্তমানে বেশিরভাগ কৃষক রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের পরিবর্তে অন্যান্য উপায়ে শস্য উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা করছেন। যেমন প্রথাগত চাষের পরিবর্তে দীর্ঘস্থায়ী কৃষিজ উৎপাদন (Sustainable agriculture), জৈবিক কৃষি (Organic agriculture), পরিবর্তন কৃষি (alternative methods) ইত্যাদি।

দীর্ঘস্থায়ী কৃষিজ উৎপাদনের মাধ্যমে বাস্তুতন্ত্র (eco-system) বজায় রেখে অর্থনৈতিক ভাবে কার্যকরী যথার্থ সুরক্ষিত খাদ্য উৎপন্ন করা হয়।

জৈবিক কৃষি পদ্ধতিতে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার না করে জৈব সার (যেমন শস্যের পাতা মূল)-এর মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা হয়। এই পদ্ধতি ব্যবহারের ফলে ভূমিক্ষয় রোধ করা যায় এবং ভূগর্ভস্থ জৈবিক পদার্থও বৃদ্ধি পায়।

পরিবর্ত শস্য কর্ষণের মাধ্যমে জমির উর্বরতা বৃদ্ধির সাথে সাথে ভূমিক্ষয় রোধও করা যায়।

কৃষিজ জমিতে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার কমিয়ে উপরোক্ত পরিবর্ত পদ্ধতি অবলম্বন করে ভূমির দূষণ রোধ এবং উর্বরতা বৃদ্ধি করা সম্ভব।

**(iii) ভূমিতে লবণাত্মক জলের আধিক্য (Excess saline water in soil) :**

বৃষ্টির জল ব্যবহারের পরিবর্তে আমাদের দেশে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভূগর্ভস্থ জল ব্যবহার করে শস্য উৎপাদন হয়। কিন্তু ভূ-গর্ভস্থ জল ব্যবহারে কিছু ক্ষতিকর দিক পরিলক্ষিত হয়েছে। এই জলে লবণের আধিক্য দেখা যায়। ফলস্বরূপ উষ্ণ জলবায়ু অঞ্চলে ভূমির উপরিভাগের জল বাষ্পায়িত হয়ে গেলে ভূমির উপরিভাগে লবণের আধিক্য দেখা যায়।

যা থেকে উদ্ভিদের বৃদ্ধি হ্রাস পায় এবং শস্য উৎপাদন ক্ষমতা কমে যায়। একই জমিতে দীর্ঘদিন ভূ-গর্ভস্থ জল ব্যবহারের ফলে ভূমি লবণাক্ত ও অনুর্বর হয়ে ওঠে।

এরকম ভূমিদূষণ থেকে ভূমিকে রক্ষা করার জন্য প্রথাগত চাষের পরিবর্তে দীর্ঘস্থায়ী কৃষিজ পদ্ধতিতে চাষাবাদ করতে হবে।

### ৫.৪.৩ বর্জ্য পদার্থজনিত দূষণ (Pollution due to waste matter)

বর্তমান সভ্যতার অন্যতম সমস্যা হল বিভিন্ন কল-কারখানা, শিল্পাঞ্চল ও গৃহস্থালীর উচ্ছিষ্ট বর্জ্য পদার্থ। এই বর্জ্যপদার্থের সর্বশেষ গন্তব্য হল মৃত্তিকা। বিভিন্ন রাসায়নিক ও জৈবিক পদার্থের মিশ্রণে সৃষ্ট এই বর্জ্য পদার্থ ভূমিকে বিষাক্ত ও দূষিত করে তুলছে। বেশির ভাগ বর্জ্য পদার্থ পচনক্ষম বা দহন যোগ্য নয়, ফলে বছরের পর বছর মাটির মধ্যে থেকে ইহা ভূমির সাথে সাথে পরিবেশকেও দূষিত করছে।

## ৫.৫ শব্দ দূষণ (Noise Pollution)

শব্দ প্রাণীজগতের অস্তিত্ব ও ভাব বিনিময়ের মাধ্যম, শব্দ ছাড়া আমরা কথা বলতে পারি না। পরস্পর যোগাযোগের ভাষা যুগিয়েছে শব্দ। শব্দহীন এই পৃথিবী আমরা কল্পনা করতে পারি না। শব্দ এক অমূল্য সম্পদ।

কিন্তু বেসুরো, উচ্চগ্রামের একটানা শব্দ আমাদের বিরক্তি উৎপাদন করে, এক অস্বস্তিকর, যন্ত্রণাময় অবস্থার সৃষ্টি করে। শ্রোতার কাছে অনভিপ্রেত, অস্বস্তিকর বিরক্ত উৎপাদক শব্দকে কোলাহল বা শ্রুতিকটু কলরব (noise) বলা হয়।

কোনো অনাকাঙ্খিত শব্দ যদি আমাদের পারস্পরিক যোগাযোগে বিঘ্ন ঘটায়, শারীরিক বা মানসিকভাবে স্বাস্থ্যহানিকর হয় তবে শব্দ দূষণ হয়েছে বলা হয়। শব্দদূষণ শব্দশক্তির অপচয় হিসাবে গণ্য করা যায়।

সাধারণত শব্দের প্রাবল্যমাত্রা এবং স্থিতিকাল বা পুনঃপুনঃ সংঘটনের উপর শব্দদূষণের মাত্রা নির্ভর করে। একটানা হাতুড়ি মারার শব্দ, মোটর গাড়ির এয়ার হর্ন একটানা জোরে বাজানোর আওয়াজ, জলের পাম্প বা জেনারেটর চালানোর শব্দ এসব শব্দদূষণ ও যন্ত্রণাসৃষ্টির উদাহরণ।

শব্দদূষণ, জল, বায়ু দূষণের মতো ক্ষতিকারক না হলেও, ইহা প্রকৃতি পরিবেশের গুণগত মানকে নিম্নমুখী করে।

শব্দের প্রাবল্যের মাত্রা 'ডেসিবেল' (decibel) একককে মাপা হয়। New Delhi-based National Physical Laboratory-এর এক গবেষণায় দেখা গেছে শব্দদূষণের অন্যতম প্রধান কারণ পটকা বাজি ফাটানো যেখানে শব্দের মাত্রা (125°dB) নির্দিষ্ট মাত্রার চেয়ে বেশি মাত্রায় থাকে। Enrironment (Protection) (Second amendment) Rules, 1999-এর অনুমোদিত শব্দের প্রাবল্য মাত্রা হল 65 ডেসিবেল (dB)।

### ৫.৫.১ শব্দদূষণের বিভিন্ন উৎস (Different sources of noise pollution)

শব্দদূষণের বিভিন্ন উৎস সমূহকে প্রধানতঃ তিনটি শ্রেণিতে বিন্যস্ত করা যায় :

(i) পরিবহন জনিত, (ii) শিল্পজাত ও (iii) গৃহাভ্যন্তরীন ও পারিপার্শ্বিক কার্যকলাপ কৃত শব্দদূষণ।

(i) **পরিবহন (Transportation) জনিত শব্দদূষণ :** ভূতল, বিমান ও রেলপথে পরিবহন সৃষ্ট শব্দ, শব্দদূষণের প্রধান কারণ।

বর্তমান সভ্যতার অগ্রগতির সাথে, সাথে প্রকট থেকে প্রকটতর হয়ে উঠেছে যানবাহনের নিরন্তর বৃদ্ধি।

এই যানবাহনের নিরবিচ্ছিন্নভাবে সংঘটিত শব্দ, শব্দদূষণকে বর্দ্ধিত করে চলছে।

শহরাঞ্চলে যানবাহনের আধিক্য বেশি হওয়ায়, এই অঞ্চলের মানুষেরা তাড়াতাড়ি শব্দদূষণে আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

(ii) **শিল্পজাত (Industrial) শব্দূষণ :** বিভিন্ন শিল্পে ব্যবহৃত মেশিন চলবার শব্দ এবং এসব শিল্পে সংঘটিত নানাবিধ প্রক্রিয়া দূষণের সমস্যা সৃষ্টি করে। এই ধরনের দূষণের শিকার কর্মরত শ্রমিকেরা এবং শিল্পসংলগ্ন এলাকার মানুষেরা।

(iii) **গৃহাভ্যন্তরীন (Indoor) ও পারিপার্শ্বিক (Out door) শব্দূষণ :** ঘরের ভিতরে ব্যবহৃত বিভিন্ন মেশিন ও ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম যেমন জেনারেটর, জলের পাম্প, ওয়াশিং মেশিনের একটানা আওয়াজ, টি.ভি., রেডিও, টেপ রেকর্ডারের উচ্চগ্রামে চালানোর শব্দ, পারিপার্শ্বিকে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত মাইকের উচ্চ আওয়াজ শব্দদূষণ সৃষ্টিকারক।

### ৫.৫.২ শব্দের প্রাবল্যমাত্রা (Intensity)

শব্দের প্রাবল্যমাত্রা প্রকাশ করা হয় 'বেল' বা 'ডেসিবেল' এককে (1 বেল = 10 ডেসিবেল)। দূরাভাষের আবিষ্কর্তা আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেলের নামানুসারে এই এককের নামকরণ। ডেসিবেলের সংজ্ঞা গাণিতিকভাবে প্রকাশ করা যায় নীচের সমীকরণটির মাধ্যমে—

$$\text{ডেসিবেল (dB)} = 10 \log_{10} \frac{\text{নির্ণীত শব্দপ্রাবল্য (I)}}{\text{প্রামাণ্যের শব্দপ্রাবল্য } (I_0)}$$

কোনও বিশেষ শব্দের প্রাবল্য যদি প্রামাণ্য শব্দের 10 গুণ হয় (অর্থাৎ $\frac{I}{I_0} = 10$) তবে ঐ বিশেষ শব্দের প্রাবল্য মাত্রা 10 ডিসেবেল হবে (কারণ, $\log_{10} 10 = 1$ সুতরাং $10 \times \log_{10} 10 = 10 \times 1 = 10$)। আবার বিশেষ কোনো শব্দের প্রাবল্য প্রামাণ্য শব্দ প্রাবল্যের 100 গুণ হলে ওই বিশেষ শব্দের প্রাবল্যমাত্রা হবে 20 ডেসিবেল (কারণ, $\log_{10} 10 = 2$ সুতরাং $10 \times \log_{10} 10 = 10 \times 2 = 20$)। অর্থাৎ 20 ডেসিবেল শব্দের প্রাবল্যমাত্রা 10 ডেসিবেল শব্দের প্রাবল্যমাত্রার দ্বিগুণ নয়, 10 গুণ। অনুরূপে 30 ডেসিবেলের শব্দ প্রাবল্যমাত্রা 20 ডেসিবেলের 10 গুণ, 40 ডেসিবেলের প্রাবল্যমাত্রা 30 ডেসিবেলের 10 গুণ — এভাবে পর্যায়ক্রমে বাড়বে।

মানুষের শ্রবণযন্ত্রের শব্দের তীব্রতা গ্রহণ করার সীমা যদিও খুব বিস্তৃত, তবু 70 ডেসিবেল থেকে বেশি তীব্র শব্দ মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর নানারকম শারীরিক ও মানসিক ক্ষতির কারণ হয়— বিশেষ করে অনির্দিষ্টকাল ধরে যদি তা চলতে থাকে।

**সারণি-৩ : শব্দ তীব্রতা, শব্দের উৎস এবং উচ্চমাত্রার শব্দের ক্ষতিকর প্রভাব**

| ডেসিবেল মাত্রা | শব্দের উৎস ও তার ক্ষতিকর প্রভাব |
|---|---|
| 0 | মানুষের শ্রুতিগোচর শব্দের নিম্নতম মাত্রা। |
| 10 | গাছের পাতা নড়ার শব্দ। |
| 20 | বেতার স্টুডিওর অভ্যন্তরের শব্দ। |
| 30 | পাঠাগারের অভ্যন্তরের শব্দ। |
| 40 | গৃহের অভ্যন্তরের শব্দ। |
| 50 | 300 মিটার দূর থেকে শ্রুত হাল্কা যানবাহনের শব্দ। |
| 60 | সাধারণ কথাবার্তা। |
| 70 | রেডিও, লাউড স্পিকারের শব্দ, এই মাত্রা ক্ষতিকারক। |
| 80 | মোটর গাড়ির এয়ার হর্ন। |
| 90 | পাতাল রেল যাওয়ার শব্দ। এই মাত্রা স্থায়ী ক্ষতিারক। |
| 100 | ড্রিল মেশিনের শব্দ, অর্কেস্ট্রার শব্দ। ইহা খুব ক্ষতিকর। |
| 110 | রক মিউজিকের শব্দ। |
| 120 | শক্তিশালী বাজি পটকার শব্দ। |
| 146 | বিমান ওঠা,নামার শব্দ। ইহা খুব যন্ত্রণা দায়ক। |

কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ নির্ধারিত নিরাপদ শব্দ মাত্রা নীচের সারণিতে দেখানো হল :

**সারণি ৪ : কোনো নগরীতে নির্ধারিত নিরাপদ ও শব্দ প্রাবল্যমাত্রা**

| বিশেষ এলাকা | নির্ধারিত নিরাপদ শব্দ প্রাবল্যমাত্রা (ডেসিবেল) | |
|---|---|---|
| | দিনে | রাত্রে |
| (i) বসবাস এলাকা | 55 | 45 |
| (ii) নিঃশব্দ অঞ্চল (হাসপাতাল, স্কুল, কলেজ এসবের 100 মিঃ দূরত্ব পর্যন্ত। | 50 | 40 |
| (iii) বাণিজ্য এলাকা | 65 | 55 |
| (iv) শিল্পাঞ্চল | 75 | 65 |

### ৫.৫.৩ জনস্বাস্থ্যের উপর শব্দদূষণের ক্ষতিকর প্রভাব

শব্দদূষণ আমাদের শারীরিক এবং মানসিক উভয় প্রকার ক্ষতিই করতে পারে। সাধারণত শব্দ প্রাবল্যমাত্রা এবং শব্দের স্থিতিকালের উপর ক্ষতির মাত্রা নির্ভর করে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) নির্দেশিত শব্দের নিরাপদ প্রাবল্যমাত্রা হল 45 ডেসিবেল।

80 ডেসিবেল আওয়াজের শব্দ আমাদের ক্রুদ্ধ করে তুলতে পারে, 85 ডেসিবেল আওয়াজের শব্দ আমাদের কানের ক্ষতি করতে শুরু করে। 88 ডেসিবেলের শব্দ একটানা হতে থাকলে আমাদের শ্রবণক্ষমতা কমে আসতে থাকে, 135 ডেসিবেলের আওয়াজ যন্ত্রণাদায়ক এবং 150-160 ডেসিবেল আওয়াজ আমাদের শ্রবণ মুহূর্তেই চিরতরে বধির করে দিতে পারে।

শব্দদূষণের ফলে শ্রবণক্ষমতা হ্রাস হওয়া ছাড়া বহু শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি হতে পারে।

শব্দদূষণের ফলে মানুষের মানসিক চাপ বৃদ্ধি পায়, তাঁরা উগ্র মেজাজ, স্নায়ুবিক রোগ, শ্বাসকষ্ট, মাইগ্রেন, মাথাধারায় আক্রান্ত হতে পারেন। তাঁদের কর্মদক্ষতা হ্রাস পেতে পারে, রক্তচাপ, রক্তে চিনির মাত্রা বৃদ্ধি পেতে পারে। উচ্চগ্রামের একটানা শব্দ হৃদ রোগীদের পক্ষে মারাত্মক হতে পারে। প্রসূতি নারী দীর্ঘকালীন শব্দযন্ত্রণার মধ্যে থাকলে বিকলাঙ্গ বা কম ওজনের সন্তান প্রসব করতে পারেন। এধরনের শিশু জড়বুদ্ধিসম্পন্ন হবারও সম্ভাবনা থাকে।

### ৫.৫.৪ শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে করণীয়

আধুনিক সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে বিপরীত প্রক্রিয়া হিসাবে বিভিন্ন প্রকার দূষণ আমাদের অনুষঙ্গ হয়ে পড়েছে। 'শব্দদূষণ' তাদের মধ্যে একটি, এই দূষণ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা সম্ভব নয়, তবে উপযুক্ত কিছু বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে শব্দের প্রাবল্যমাত্রা এবং দূষণমাত্রা কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে প্রধানত চার ধরনের পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে :

(i) উৎসেই শব্দের প্রাবল্যমাত্রা কমিয়ে আনা, (ii) উচ্চগ্রামে শব্দ আসার পথটাই বন্ধ করে দেওয়া, (iii) শব্দ উৎস থেকে শ্রোতার কাছে পৌঁছাবার পথের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করে এবং মাঝপথে শব্দ শোষক কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং (iv) শ্রোতার জন্যে কিছু সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা, যাতে উচ্চ প্রাবল্যের শব্দ হ্রাস পেয়ে শ্রোতার কানে প্রবেশ করে।

সর্বোপরি জনগণের মধ্যে শব্দদূষণের ক্ষয়ক্ষতি সম্বন্ধে সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে।

যেমন রেডিও, টি.ভি., টেপরেকর্ডার, মাইক্রোফোন উচ্চগ্রামে বাজানো বন্ধ করতে হবে। মোটরযানে কর্কশ আওয়াজের এয়ারহর্ন বাজানো পুরোপুরি বন্ধ করতে হবে। কলকারখানায় যন্ত্রপাতির সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ এবং উপযুক্ত প্রযুক্তির সাহায্যে শব্দ প্রাবল্য কমিয়ে আনবার ব্যবস্থা করা ইত্যাদি ব্যবস্থার মাধ্যমে শব্দদূষণ কিছুটা নিয়ন্ত্রণ সম্ভব।

একটানা নিরবচ্ছিন্ন প্রবল শব্দই সাধারণত শব্দদূষণ ঘটায়, তাই অনেকক্ষেত্রে একটানা শব্দকে ভেঙ্গে দিতে পারলেও শব্দদূষণ মাত্রা কিছুটা কমানো যায়।

শব্দ উৎস থেকে উৎসারিত প্রবল আওয়াজ শ্রোতার কানে পৌঁছাবার আগেই মাঝপথের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করে এবং মাঝ পথে শব্দ শোষকের দ্বারা প্রাবল্যমাত্রা কিছুটা কমানো যায়। যেমন শব্দ কোনো শিল্প-উদ্ভুত হলে ওই শিল্পাঞ্চলের চারিদিকে ঘন সংবদ্ধ নির্বাচিত গাছপালা লাগিয়ে শব্দ প্রাবল্য কমানো যেতে পারে। শহরে বিজ্ঞাপনের জন্য যে হোর্ডিং ব্যবহৃত হয় সেগুলি শব্দ শোষক পদার্থ নির্মিত হলে রাস্তায় চলা যানবাহনজাত শব্দের প্রাবল্য

কিছুটা কমানো যায়। হাসপাতাল ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ঘিরে গাছপালার ঘন আবেষ্টনী তৈরি করা প্রয়োজন। বড় ও ব্যস্ত রাস্তার ধারে বাড়ি করা বা কেনা উচিত নয় আর তা থাকলে বাড়ির জানালা ও দরজায় ভারী পর্দা লাগাবার ব্যবস্থা করতে পারলে ভালো। এছাড়া শ্রোতার জন্য ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা করা যেতে পারে। যেমন শব্দ প্রবণ পরিবেশে কাজ করলে কানে ইয়ার প্লাগ, ইয়ার মাফ ও নয়েজ হেলমেট ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে। উপরোক্ত যন্ত্রগুলি শব্দ শোষকের কাজ করে। এই ধরনের যন্ত্রের অভাবে স্বাস্থ্যহানিকর নয় এমন তেলে ভেজানো বা মোম মাখানো তুলো কানে দিয়ে শব্দ প্রবণ এলাকায় কাজ করা যেতে পারে।

উপযুক্ত নগর পরিকল্পনার মাধ্যমে উচ্চ শব্দ উৎস যেমন কলকারখানা, কোলাহলপূর্ণ ব্যবসাবাণিজ্যের এলাকা বসতি এলাকা থেকে দূরে স্থাপন করা দরকার। রাস্তাঘাটের রক্ষণাবেক্ষণ ও সুষ্ঠু পরিকল্পিত ট্রাফিক ব্যবস্থার মাধ্যমে যানবাহন জনিত শব্দদূষণ অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। বিমানবন্দর, রেলস্টেশন বা রেল পরিবহন ব্যবস্থা জনবসতি এলাকা থেকে দূরে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

সর্বোপরি সার্বিক সুষ্ঠু পরিকল্পনা মাফিক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ, যথাযথ আইন প্রণয়ন এবং সেগুলির কঠোর প্রয়োগ, ব্যাপক জনসচেতনতা গড়ে তোলা এবং নিরবচ্ছিন্ন গঠনমূলক গণ আন্দোলনের মাধ্যমেই শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ সম্ভব।

## ৫.৬ সামুদ্রিক দূষণ (Marine Pollution)

মানুষের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে কোন পদার্থ সমুদ্রের মধ্যে ফেলার ফলে সমুদ্রের জলের শুদ্ধতা বিনষ্ট হয় এবং এর প্রভাবে সমুদ্রের বসবাসকারী জীবের ক্ষতি সাধন হয়, এমনকি মৃত্যুও ঘটে থাকে। শুধুমাত্র সামুদ্রিক প্রাণী নয় মানুষও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। একে সামুদ্রিক দূষণ বলে।

### ৫.৬.১ সামুদ্রিক দূষণের উৎস

বিভিন্ন ভাবে সমুদ্রের প্রাকৃতিক পরিবেশ দূষিত হয়ে চলেছে, তার প্রধান কারণগুলি হল—

(১) প্রায় ৪০% বর্জ্য পদার্থ যেমন প্লাস্টিক, পলিমারজাত দ্রব্য যা সহজে বিনষ্ট হয় না তা সমুদ্রের তলদেশে ফেলা হচ্ছে।

(২) শহর এবং মহানগরীর উপকূলবর্তী অঞ্চলের হোটেল, বাড়ি ইত্যাদি থেকে উৎপন্ন তরল বর্জ্য পদার্থ যার উপাদান হিসাবে উপস্থিত সাবান, কীটনাশক, রান্নাঘরে ব্যবহৃত তেল ইত্যাদি যা সরাসরি পাইপলাইন এবং পরে বড় বড় ড্রেনের মাধ্যমে গিয়ে পড়ছে সমুদ্রে।

(৩) সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত কারখানাগুলি বিষাক্ত তেজষ্ক্রিয় পদার্থ ভারি মৌল (Cr, As, Cd, Cu, Pb) সমুদ্রে নিক্ষেপ করে থাকে, যার ফলে সমুদ্রের শুদ্ধতা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

(৪) জাহাজের থেকে বেরোনোর তেল বা খনিজ তেল তোলার খনিগুলি থেকে তেল বেরিয়ে সমুদ্রের উপরিপৃষ্ঠে ছড়িয়ে যায়, যার প্রভাবে সমুদ্রে বসবাসকারী প্রাণীদের মধ্যে অক্সিজেন ঘাটতি ঘটে।

(৫) চাষাবাদের জন্য ব্যবহৃত সার, কীটনাশক, জলে ধুয়ে প্রথমে নদীতে এবং পরে সমুদ্রে এসে মিশে। এছাড়াও নদীর পাশাপাশি শহরগুলি থেকে বর্জ্য পদার্থ নিয়ে এসে সমুদ্রে নিক্ষেপ হয় যা সমুদ্রের প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট করে চলেছে।

এই সকল কারণগুলি ব্যাতীত বিশ্ব-উষ্ণায়ন, জলবায়ু পরিবর্তন বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি ইত্যাদি ও সমুদ্রের প্রাকৃতিক পরিবেশকে প্রভাবিত করে।

### ৫.৬.২ সামুদ্রিক দূষণের প্রভাব (Impact of Marine Pollution)

- অতিরিক্ত জৈব্য পদার্থ সমুদ্রের মধ্যে ফেলার ফলে ফাইটোপ্লাঙ্কটন এর অতিবৃদ্ধি হয় যার ফলে বিশাল এলাকা জুড়ে সমুদ্র পৃষ্ঠের রং পরিবর্তন হয় একে ‘‘রেড টাইড’’ ও বলে।
- বিষাক্ত পদার্থ সমুদ্রে নিক্ষেপের ফলে তা খাদ্য শৃঙ্খল এর মধ্যে প্রবেশ করে এবং পরবর্তীকালে বৃহৎ প্রাণী গোষ্ঠী, মানুষকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।
- মাছ ধরার জাল, প্লাস্টিক এবং বিভিন্ন পলিমার জাতীয় কঠিন বর্জ্য পদার্থ সমুদ্রে পড়ার ফলে খাদ্যের সাথে বা তাতে আটকা পড়ে প্রচুর প্রাণী এবং পরিযায়ী পাখি মারা যাচ্ছে। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ বর্তমান কালে বহু তিমি মাছের মৃত্যু হচ্ছে যাদের পেটের ভিতর থেকে পাওয়া যাচ্ছে কেজি কেজি প্লাস্টিক।
- মাইক্রোপ্লাস্টিক আজ সামুদ্রিক লবণের মধ্যেও পাওয়া যাচ্ছে।
- সমুদ্রের দূষণের ফলে সামুদ্রিক মাছ ও খাবারগুলির স্বাদ খারাপ হচ্ছে যার ফলে বাজার মূল্য কমে আসছে।
- অয়েল স্পিল শুধুমাত্র সামুদ্রিক প্রাণী না বিভিন্ন পরিযায়ী পাখিদেরও ক্ষতি করে।
- আমরা জানি সমুদ্রে প্রচুর পরিমাণে বাতাসের কার্বন ডাই-অক্সাইডকে জলে দ্রবীভূত করে যা কার্বনিক অ্যাসিডে পরিবর্তিত হয়। তাই বাতাসের কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ অতিরিক্ত বৃদ্ধির কারণে সমুদ্রের জলের অম্লত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে যার ফল হিসাবে সামুদ্রিক প্রবাল এবং শামুক, ঝিনুকের ক্যালসিয়াম গঠিত আবরণ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

### ৫.৬.৩ সামুদ্রিক দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ

সামুদ্রিক দূষণ প্রতিকারের একমাত্র উপায় হল দূষিত পদার্থের পরিমাণ হ্রাস করা। তাই তরল বর্জ্য পরিশোধন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গৃহস্থলি, কারখানা, হোটেল ইত্যাদির থেকে উৎপন্ন তরল বর্জ্য পদার্থ পরিশোধনের পর সেই তরলকে নদী বা সমুদ্রে ছাড়তে হবে।

- কঠিন বর্জ্য পদার্থ, প্লাস্টিক, জাহাজের ভগ্নাবশেষ, মাছ ধরা জাল ইত্যাদি সমুদ্রে ফেলা চলবে না এবং তা সমুদ্রের থেকে তুলে ‘ল্যান্ডফিল’-এ ফেলতে হবে।
- সমুদ্রের ভাসমান তেল অপসারণ করতে হবে তা জৈবিক উপায়ে (*Pscudomonas putida*) বা রাসায়নিক ব্যবহার করে।
- সমুদ্র সৈকত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, প্লাস্টিক মুক্ত রাখতে হবে।
- সমুদ্রের উপকূলে সবরকম অবিজ্ঞানসম্মত নির্মাণমূলক কাজকর্ম বন্ধ করতে হবে।
- সমুদ্রের খাদ্য স্বল্প মাত্রার গ্রহণ করতে হবে যাতে অধিক মৎস শিকার না হয় এবং সামুদ্রিক জীব বৈচিত্র্যের হ্রাস না ঘটে।
- প্রযুক্তিগত উন্নতি ঘটাতে হবে যাতে সমুদ্রকে দূষণ মুক্ত করা যায়।

## ৫.৭ তাপীয় দূষণ (Thermal Pollution)

জলাশয়, নদী বা সমুদ্রের মধ্যে উত্তপ্ত বর্জ্য পদার্থ মেশার ফলে জলের স্বাভাবিক তাপমাত্রা অতিরিক্ত বৃদ্ধি পায় তবে তাকে তাপীয় দূষণ বলে।

সাধারণত কলকারখানা থেকে নির্গত উত্তপ্ত দূষিত জল বাইরে নদী নালাতে ফেলা হয়, এছাড়া বিভিন্ন তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে প্রচুর পরিমাণে উত্তপ্ত জল বাইরের নদী নালাতে ফেলায় জলের স্বাভাবিক তাপমাত্রা অতিরিক্ত মাত্রায় বৃদ্ধি পায়। যে কোন যান্ত্রিক কাজকর্মের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ৪০% তাপ কাজে লাগে বাকি ৬০% তাপ নষ্ট হয় এবং সেই তাপ পরিবেশে বেরিয়ে তাপীয় দূষণ ঘটায়।

### ৫.৭.১ তাপীয় প্রভাব (Effects of Thermal Pollution)

তাপীয় দূষণের প্রভাবে—

(১) জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ হ্রাস পায়।

(২) উত্তপ্ত বর্জ্য পদার্থ জলে পড়ার সাথে সাথে তার আশেপাশের তাপমাত্রা অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাবার ফলে সকল প্রাণীর মৃত্যু ঘটে।

(৩) তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে প্রাণীর জৈবিক ক্রিয়াকলাপ ব্যাহত হয়, প্রজনন ও ডিম পাড়াও ব্যাহত হয়।

(৪) তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে জলে দূষিত পদার্থ অনেক বেশি পরিমাণে দ্রবীভূত হয়।

(৫) তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে যে সকল প্রাণী বা অনুজীব তাপমাত্রা সহ্য করতে পারে শুধু তারাই বেঁচে থাকে বাকিরা মারা যায় ফলে স্বাভাবিক বাস্তুতন্ত্র বিঘ্নিত হয়।

### ৫.৭.২ তাপীয় দূষণের প্রতিকার

তাপীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বৃহৎ গভীর জলাশয় তৈরি করে তার মধ্যে প্রথমে উত্তপ্ত জল ফেলে তা ঠাণ্ডা হতে দিয়ে আবার ব্যবহার করা যেতে পারে। Cooling Tower-এর ব্যবহার করেও উত্তপ্ত গরম জল ঠাণ্ডা করে তা পুনরায় পরিশোধন করে ব্যবহার করা যেতে পারে।

এছাড়া জনগণ তাদের ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি সুব্যবহার অর্থাৎ অপ্রয়োজনীয় সময় যন্ত্রাংশ বন্ধ রাখলে তাপ উৎপন্ন কম হবে। ব্যবহৃত সম্পদের স্বল্প উৎপাদন করলে উৎপন্ন তাপের পরিমাণ স্বল্প হবে, কারখানা বা তাপ উৎপাদন ক্ষেত্রের চারিপার্শ্বে বৃক্ষরোপণের দ্বারা তাপীয় দূষণ নিবারণ সম্ভব।

## ৫.৮ কঠিন বর্জ্য পদার্থ ও তার পরিচালন ব্যবস্থা (Solid Waste Management)

**বর্জ্য পদার্থ কী?** কার্যসিদ্ধি হবার পর বা ব্যবহার করার পর কোন বস্তু বা পদার্থ যখন আর ব্যবহার্য থাকে না এবং তাকে ফেলে দেওয়া হয় বা ফেলে দেওয়া হবে বলে ঠিক করা হয়। সেই বস্তু বা পদার্থকে জৈব পদার্থ বলে।

**কঠিন বর্জ্য পদার্থ—** অব্যবহৃত কঠিন বস্তু সামগ্রি যা আমরা দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে অবস্থিত বস্তু হিসাবে বর্জন করে থাকি, তাই কঠিন বর্জ্য পদার্থ। এই কঠিন বর্জ্য পদার্থ গৃহস্থলি, শিল্পক্ষেত্রে, খনির কাজ বা কৃষি

কাজের থেকে উৎপন্ন হয়ে থাকে। বর্জ্য পদার্থ জৈব যেমন— বর্জ্য খাদ্যাবশেষ, মাছ, মাংসের দেহাবশেষ। দাহ্য যেমন— কাঠ, কাগজ, রাবার; অদাহ্য— যেমন—কাঁচ, ধাতব বস্তু, পাথর ইত্যাদি।

### ৫.৮.১ কঠিন বর্জ্য পদার্থের প্রকারভেদ (Types of Solid Waste) :

উৎপত্তির উপর ভিত্তি করে কঠিন বর্জ্য পদার্থকে ৩টি ভাগে ভাগ করা যায়।

(১) পৌর কঠিন বর্জ্য পদার্থ (Municipal solid waste) : গৃহস্থলি থেকে উৎপন্ন বর্জ্য পদার্থ যেমন— আসবাবপত্রের ভগ্নাবশেষ, নির্মাণ কাজে উৎপন্ন বর্জ্য, কীটনাশক, রং, সাবান, ব্যাটারি, প্লাস্টিকের তৈরি বর্জ্য, তেজস্ক্রিয় পদার্থ ইত্যাদি, পৌর কঠিন বর্জ্য পদার্থের পরিচালন এবং নিয়ন্ত্রণ হয় সরকারের তৈরি Municipal Solid Waste Rules, 2000 আইন দ্বারা।

(২) শিল্পক্ষেত্র ও বিপজ্জনক বর্জ্য পদার্থ : শিল্পক্ষেত্রে ব্যবহৃত কাঁচামাল ও পড়ে থাকা বর্জ্য পদার্থ এবং বিপজ্জনক বর্জ্য এই ভাগের মধ্যে অন্তর্গত। Hazardus Waste Rules, 1989 দ্বারা এই ধরনের বর্জ্য নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

(৩) চিকিৎসাজাত বর্জ্য পদার্থ : হসপিটাল, নার্সিংহোম থেকে চিকিৎসার জন্য উৎপন্ন নানা কঠিন বর্জ্য পদার্থ যেমন— তুলা, সিরিঞ্জ, ছুঁচ, ঔষধের বোতল, ক্যাথেটার, অপারেশনে বাদ দেওয়া নানা অঙ্গ ইত্যাদি। Biomedical Waste Rules, 1998 দ্বারা ইহা নিয়ন্ত্রিত হয়।

### ৫.৮.২ কঠিন বর্জ্য পদার্থের পরিচালন ব্যবস্থা (Solid Waste Management) :

কঠিন বর্জ্য পদার্থ শহরাঞ্চল, শিল্পক্ষেত্র থেকে নির্দিষ্ট সময়ের পর তার নির্ধারিত জায়গাতে বার্জ্যের নিষ্পত্তি ঘটানো হয়। সুতরাং বর্জ্য পদার্থের পরিচালন ব্যবস্থার প্রধান তিনটি ধাপ-বর্জ্য পদার্থ সংগ্রহ, পরিবহন ও নির্দিষ্ট স্থানে তার নিষ্পত্তি করন।

- **বর্জ পদার্থের সংগ্রহ পদ্ধতি :** সাধারণত শহরাঞ্চল থেকে পৌরসভার গাড়ি বাড়ি বাড়ি থেকে বর্জ্য পদার্থ সংগ্রহ করে বা রাস্তার ধারে বিভিন্ন নির্দিষ্ট স্থানে বর্জ্য ফেলার জায়গা রাখা হয় তবে দুই ক্ষেত্রেই মিশ্রবর্জ্য ফেলা হয়। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে পৌরকর্মীদের বর্জ্য আলাদা করে নিষ্পত্তির দায়িত্ব দেওয়া হয়। সাধারণত পচনশীল বস্তু এবং পুনঃনবীকরণ যোগ্য বস্তু আলাদা করা হয়ে থাকে।
- **বর্জ্য পদার্থ পরিবহন :** বর্জ্য পদার্থের পরিবহনের জন্য বিভিন্ন ধরনের গাড়ির ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ছোট গাড়ি ব্যবহার করে বাড়ি বাড়ি থেকে বর্জ্য সংগ্রহ করা হয় এবং বড় গাড়িতে, ট্রাক বা চাকা যুক্ত গাড়িতে করে নির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতাল জাত বর্জ্য পদার্থের জন্য বিশেষ চাকা যুক্ত গাড়ি ব্যবহৃত হয়।
- **কঠিন বর্জ্য পদার্থের নিষ্পত্তিকরণ :** কঠিন বর্জ্য পদার্থের নিষ্পত্তিকরণ নানাভাবে করা হয়ে থাকে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—

(১) স্যানিটারি ল্যান্ডফিল্ড (২) ভস্মিভূত করা (৩) বর্জ্য পদার্থ পচিয়ে জৈবসার তৈরি করা।

**(১) স্যানিটারি ল্যান্ডফিল্ড :**

এই পদ্ধতিতে একটি নির্দিষ্ট স্থানকে পুকুরের ন্যায় খনন করা হয় এবং অভেদ্য আবরণ দ্বারা আবৃত করা হয় যাতে কোন দূষিত পদার্থ, তরল ভূগর্ভে চলে যেতে না পারে। প্রথমে আবর্জনার জৈব অংশ আলাদা করে একটি স্তরে ছড়িয়ে দেওয়া হয় এবং স্তরের উচ্চতা ২ মিটারের মতো থাকে। পরে প্রায় ২০ সে.মি.-এর মতো মাটির প্রলেপ

দেওয়া হয়। এই ভাবে স্তরিভূত করতে করতে অবশেষে একটি পুরুমাটির স্তর দিয়ে ঢাকা দেওয়া হয় যাতে কোন ইঁদুর জাতীয় প্রাণী ঢুকতে না পারে। বিয়োজকদের জৈব পদার্থের বিয়োজন ক্রিয়া ঘটানোর পর যে জৈবগ্যাস নির্গত হয় তা বাইরে বেরোবার জন্য পাইপ দ্বারা ব্যবস্থা করা থাকে। এই গ্যাস অনেক সময় জ্বালানির কাজেও সংগ্রহ করা হয়। এই পদ্ধতিতে আবর্জনা জনিত রোগজীবাণু উৎপন্ন হয় না।

**(২) বর্জ্য পদার্থ ভস্মিভূত করা (Incineration) :**

অজৈব দাহ্য পদার্থের ক্ষেত্রে এটি ব্যবহার করা হয়। গৃহস্থলির এবং অদাহ্য পদার্থ (কাঁচ, ধাতব পদার্থ) আলাদা করা হয়। এই সমস্ত পদার্থকে বিশেষভাবে প্রস্তুতকৃত ফারনেসের মধ্যে উচ্চ তাপে প্রায় ৮১৫°C তাপমাত্রায় অক্সিজেনের উপস্থিতিতে পোড়ানো হয়। এর ফলে বর্জ্যর আয়তন প্রায় ৯০% এবং ওজন ৭৫% পর্যন্ত হ্রাস পায়। এটির জন্য খুবই স্বল্প আয়তনের জায়গা প্রয়োজন। যদিও বা এই পদ্ধতিতে অবশিষ্টাংশ ছাই হিসাবে পড়ে থাকে এবং বাতাসে দূষিত গ্যাস নির্গমন হয় যা খুবই ক্ষতিকারক।

**(৩) বর্জ্য পদার্থ পচিয়ে জৈবসার তৈরি (Composting) :**

এই পদ্ধতিতে জৈব পদার্থকে ব্যাক্টেরিয়া দ্বারা পচন করানো হয় এবং হিউমাসের সৃষ্টি করা হয় যা পরবর্তীকালে জৈবসার হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে। এই পদ্ধতিটি অক্সিজেনের উপস্থিতি এবং অনুপস্থিতি দুই পদ্ধতিতে করা যেতে পারে। এই পদ্ধতিতে পিটের মধ্যের তাপমাত্রা বেশী থাকার জন্য মশা মাছির লার্ভা বা ডিম কিছুই বেঁচে থাকে না তবে এই পদ্ধতিতে জায়গা এবং সময় উভয় অতিরিক্ত লাগে।

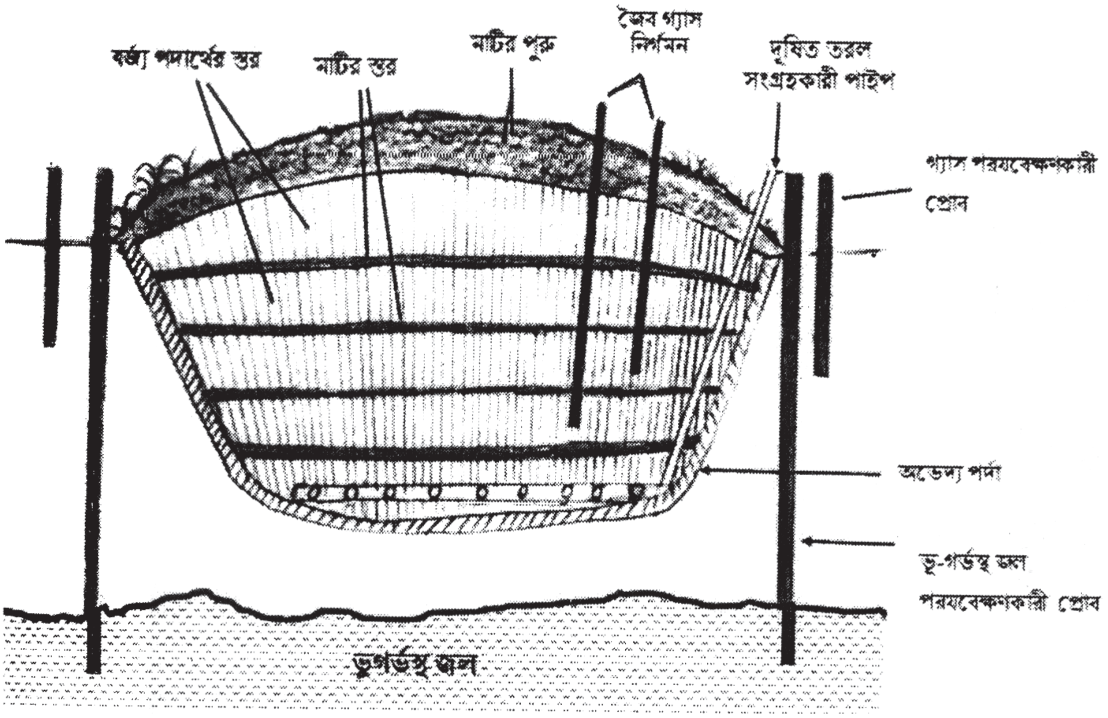


চিত্র ৫.১ : স্যানিটারি ল্যান্ডফিল্ড

১৯৯৮ সালের Biomedical Waste (Management and Handling) Rule-এর নিয়ম অনুসারে হাসপাতালজাত বর্জ্য পদার্থের আলাদাভাবে নিষ্পত্তি ঘটানোর ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে, যা নিচে দেওয়া হল—

| ক্রমিক সংখ্যা | ক্যাটেগরি | বর্জ্য | বিনাশ ব্যবস্থা | সাংকেতিক রং এবং আধার |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ক্যাটেগরি-১ | মানব বর্জ্য : মনুষ্যশরীরের কলা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমূহ | পুড়িয়ে ফেলা বা গভীরে পুঁতে দেওয়া | হলুদ প্লাস্টিক ব্যাগ |
| ২ | ক্যাটেগরি-২ | প্রাণীর বর্জ্য : প্রাণীর কলা সমূহ, অঙ্গ, শরীরের অংশ, রক্তাক্ত অংশ এবং শরীরের তরল, গবাদি পশুর হাসপাতাল ও মেডিক্যাল কলেজ থেকে নির্গত বর্জ্য সমূহ | পুড়িয়ে ফেলা বা গভীরে পুঁতে দেওয়া | হলুদ প্লাস্টিক ব্যাগ |
| ৩ | ক্যাটেগরি-৩ | জীবাণুবিজ্ঞান ও জীবপ্রযুক্তি জনিত বর্জ্য : ল্যাবোরেটারি ও গবেষণাগত ব্যবহৃত মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীর কোষ, অনুজীব, বিভিন্ন ভ্যাক্সিনের অবশিষ্টাংশ, বিষাক্ত বর্জ্য পদার্থ | স্থানীয় অটোক্লেভ/ মাইক্রোওয়েভ দ্বারা পুড়িয়ে ফেলা/ পুড়িয়ে ফেলা | হলুদ প্লাস্টিক ব্যাগ/লাল সংক্রামিত প্লাস্টিক ব্যাগ |
| ৪ | ক্যাটেগরি-৪ | ধারালো যন্ত্রাদি : ছুরি, সূচ, সিরিঞ্জ, ব্লেড, কাঁচ, ইত্যাদি যা শল্য চিকিসায় ব্যবহৃত হয় | নির্বীজকরণ (রাসায়নিক/ মাইক্রোওয়েভ/অটোক্লেভ ব্যবহার করে) এবং গুঁড়ো করা | শক্ত নীল বা সাদা ঈষদচ্ছ ব্যাগ |
| ৫ | ক্যাটেগরি-৫ | অপ্রয়োজনীয় ওষুধ : মেয়াদ উত্তীর্ণ এবং কলুষিত হয়ে যাওয়া ঔষুধ সমূহ | পুড়িয়ে ফেলা এবং নিরাপদ গর্তে নিক্ষেপ করা | কালো প্লাস্টিকের ব্যাগ |
| ৬ | ক্যাটেগরি-৬ | কঠিন বর্জ্য : শুকনো পুঁজরক্ত, রক্তাক্ত তুলো, প্লাস্টার কাস্ট, গজ ইত্যাদি | অটোক্লেভ এবং মাইক্রোওয়েভ ব্যবহার করা হয় | হলুদ / লাল প্লাস্টিক ব্যাগ |
| ৭ | ক্যাটেগরি-৭ | কঠিন বর্জ্য : ধারালো বর্জ্য ব্যাতীত অন্যান্য বর্জ্য, যেমন- পাইপ, ক্যাথেটার, শিরা বা উপশিরা সমূহের মধ্য দিয়ে চালিত করার যন্ত্রাদি | রাসায়নিক ব্যবহার করে নির্বীজ করণ / অটোক্লেভ করা/গুঁড়ো করা | লাল প্লাস্টিক ব্যাগ / শক্ত নীল বা সাদা ঈষদচ্ছ ব্যাগ |
| ৮ | ক্যাটেগরি-৮ | তরল বর্জ্য : ল্যাবোরেটরি থেকে বেরনো নানা তরল পদার্থ, ধোয়ার জন্য এবং নির্বীজকরণের জন্য উৎপন্ন তরল | রাসায়নিক ব্যবহার করে নির্বীজকরণ এবং ড্রেনে নিক্ষেপ করা | |
| ৯ | ক্যাটেগরি-৯ | ভস্মীকৃত বস্তুসমূহ : বায়ো-মেডিক্যাল বর্জ্য পোড়ানোর পর উৎপন্ন ছাই | নিরাপদ গর্তে নিক্ষেপ করা | কালো প্লাস্টিকের ব্যাগ |
| ১০ | ক্যাটেগরি-১০ | রাসায়নিক বর্জ্য : জৈব পদার্থ-তৈরিতে ব্যবহৃত রাসায়নিক এবং রোগবীজ নাশক রাসায়নিক পদার্থ | রাসায়নিক ব্যবহার করে নির্বীজকরণ এবং ড্রেনে বা নিরাপদ গর্তে নিক্ষেপ করা | কালো প্লাস্টিকের ব্যাগ |

## ৫.৯ পরিবেশ বিপর্যয় (Environmental Disaster)

বিপর্যয় এমন একটি ঘটনা বা ঘটনার পর্যায়ক্রম যা স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বিনষ্ট করে, প্রাণহানি ঘটায়। বড় বড় নির্মাণকে ধ্বংস করে, এবং এই সমস্ত কিছুকে সঠিক অবস্থায় আনতে বিশেষ আপদকালীন ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। পরিবেশ বিপর্যয় প্রাকৃতিক কারণে আবার মানব সৃষ্টি কারণেও হয়ে থাকে।

(১) প্রাকৃতিক বিপর্যয় (Natural Disaster) :

পরিবেশের সংশ্লিষ্ট উপাদানগুলি যখন মানুষের পক্ষে প্রতিকূল হয় তখন তাকে প্রাকৃতিক বিপর্যয় বলা হয়। প্রাকৃতিক বিপর্যয় ভৌগোলিক হতে পারে, যেমন— বন্যা, খরা, ভূমিকম্প, সুনামি, সাইক্লোন, অগ্নুৎপাত ইত্যাদি। আবার জৈবিক হতে পারে যেমন— সংক্রামক ব্যাধি (প্লেগ, ইবোলা, অ্যান্থ্রাক্স প্রভৃতি)।

(২) মনুষ্য সৃষ্ট বিপর্যয় (Man-made Disaster) :

এই বিপর্যয় ঘটার ক্ষেত্রে সাধারণভাবে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মানুষের ভূমিকা আছে এবং এর প্রভাবে প্রাণনাশ ও সম্পত্তির বিনাশ ঘটে থাকে। উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে, পারমাণবিক বিস্ফোরণ, ভূমিক্ষয় গ্যাস নিঃসরণ এছাড়া পথ দুর্ঘটনা, রেল দুর্ঘটনা ইত্যাদি এবং নাশকতা মূলক হামলাও বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে।

### ৫.৯.১ **বিপর্যয়ের ব্যবস্থাপনা (Disaster Management)**

বিপর্যয়ের পূর্বাভাস জনসাধারণকে বিপর্যয় মোকাবিলা করার জ্ঞান দান, বিপর্যয় আসার আগে থেকে সঠিক পদক্ষেপ নেওয়া, বিপর্যয়ের সময় মোকাবিলা এবং জনসাধারণকে উদ্ধার করা বিপর্যয় ব্যবস্থাপনার প্রধান কাজ।

বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা প্রধান ৩টি অংশে বিভক্ত— (১) বিপর্যয়ের প্রাক্কাল (২) বিপর্যয়ের সময় (৩) বিপর্যয়ের পর

(১) **বিপর্যয়ের প্রাক কাল (Pri-Disaster)** : ঝুঁকির মূল্যায়ন, প্রতিরোধ বা প্রশমন, পূর্ব প্রস্তুতি।

(২) **বিপর্যয়ের সময় (During Disaster)** : আগাম সতর্কবার্তা, জনমানবকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং বাঁচানো, আপাতকালিন সাহায্য, ধ্বংসের পরিমাপ করা, অন্যান্য ক্ষতির পরিমাপ করা।

(৩) **বিপর্যয়ের পর (Post-Disaster)** : পুনর্বাসন ও পুনঃনির্মাণ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পুনরুদ্ধার, নির্মাণমূলক ক্রিয়াকলাপ, ঝুঁকির মূল্যায়ন এবং প্রতিরোধ।

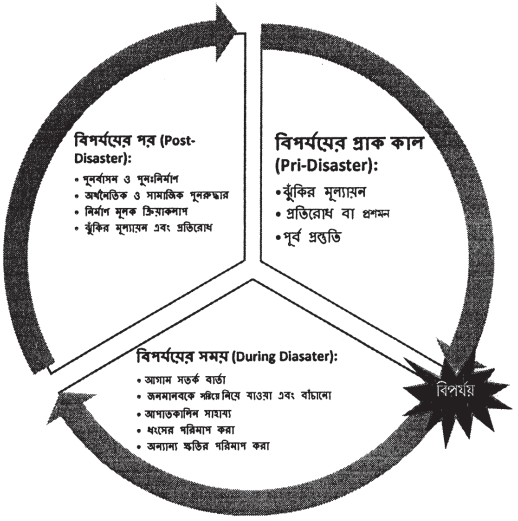


চিত্র ৫.২ : বিপর্যয়ের ব্যবস্থাপনা চক্র (Disaster management cycle)

### ৫.৯.২ বন্যা (Flood)

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ঘটনাগুলির মধ্যে অন্যতম হল বন্যা। প্রতিবছর প্রায় ৭৫ লাখ হেক্টর ভূমি বন্যার কবলে আসে এবং প্রায় ১৫০০ জন মারা যায়। মূলত বড় নদীগুলিতে জলের পরিমাণ বাড়ার ফলে সমতল ভূমি এলাকায় নদীর উপকূলবর্তী অঞ্চল প্লাবিত হয়ে যায়। এর প্রভাবে প্রচুর চাষযোগ্য জমি, ফসল, ঘর বাড়ি সবই নষ্ট হয়ে যায়। আবার সমুদ্র উপকূলবর্তী শহরাঞ্চল, চেন্নাই, বম্বে অধিক জনসংখ্যার এবং জলনিকাশি ব্যবস্থা অনুন্নত বা বন্ধ হয়ে যাওয়ার জন্য প্লাবিত হয়ে থাকে। প্রতিক্ষেত্রেই মুখ্য কারণ হল প্রবল বৃষ্টিপাত। বন্যাপ্রবণ অঞ্চলগুলিতে নিয়ম না মেনে নির্মাণের জন্য ক্ষয় ক্ষতি অনেক বেশী হয়ে থাকে।

**বন্যা সৃষ্টির কারণ :**

বন্যা প্রাকৃতিক এবং মনুষ্যসৃষ্ট উভয় কারণে হয়ে থাকে।

● **প্রাকৃতিক কারণ :**

দীর্ঘদিন অবিরাম বর্ষণের ফলে নদীতে জলস্ফীতি ঘটে এবং বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়। এছাড়া নদীর নাব্যতা কমে গেলে এবং নদীর গতিপথে বাঁকের পরিমাণ যদি অনেক বেশি থাকে তবে বর্ষাকালে অতিবৃষ্টিতে নদীর আশেপাশে বন্যা হয়। আবার শুষ্ক বা পাহাড়ি অঞ্চলে হঠাৎ করে অধিক বৃষ্টি হলে হড়পা বানের সৃষ্টি হয়।

● **মনুষ্য সৃষ্টি কারণ :**

নদীর অববাহিকায় মাত্রাতিরিক্ত বৃক্ষ ছেদনের দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বন্যার মাত্রাকে ত্বরান্বিত করে। নদীর ওপর নির্মাণকার্য যেমন সেতু নির্মাণ, জলাধার নির্মাণ নদীর বহন ও জলধারণ ক্ষমতাকে কমিয়ে দেয় ফলে অতি বর্ষণের সময় প্লাবনের সৃষ্টি করে। সর্বোপরি নগরায়ন, যা জলকে মাটির নীচে যেতে দেয় না। সমস্ত জল পাকা রাস্তা ও ড্রেনের মাধ্যমে নদীতে পড়ে এবং ভবিষ্যতে ড্রেনগুলি আবর্জনা দ্বারা বন্ধ হয়ে গেলে ফলস্বরূপ অতি বৃষ্টিপাতে বন্যা পরিস্থিতি দাঁড়ায়। উদাহরণ— চেন্নাই, মুম্বাই ইত্যাদি।

**বন্যা নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা :**

বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য সরকার নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তবে বর্তমান পরিস্থিতিকে মাথায় রেখে বন্যা সৃষ্টির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কারণগুলি যাচাই করে তার সমাধানে আরো মনোযোগী হতে হবে। এই গৃহীত আধুনিক সুসংহত পদক্ষেপগুলি বন্যার প্রাদুর্ভাব এবং ভয়াবহতাকে হ্রাস করতে সাহায্য করবে। কিছু পদক্ষেপ সম্পর্কে আলোচনা করা হল—

(১) বনভূমি ধ্বংস ও বৃক্ষছেদনের জন্য ভূমীক্ষয়-এর পরিমাণ ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে ফলস্বরূপ নদীগর্ভের নাব্যতা হ্রাস এছাড়া উচ্চ অববাহিকাতে ও পাহাড়ি অঞ্চলে হড়পা বানের সৃষ্টি হয়। তাই বৃক্ষ রোপণ করা খুবই জরুরী।

(২) বর্ষার অতিরিক্ত জল যাতে ধারণ করতে পারে তাই নদীগুলির অববাহিকাতে বাঁধ তৈরি করতে হবে এবং পুরাতন বাঁধগুলিকে সংস্কার করতে হবে। এছাড়া সমতল ভূমিতে নদীগুলিতে পলি পড়ে তার নাব্যতা হ্রাস পায় তাই খনন করে তার গভীরতা বৃদ্ধি করলে জল পরিবহন করার ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।

(৩) নদীর পাড়ের উচ্চতা বৃদ্ধি করলে পার্শ্ববর্তী অঞ্চল প্লাবিত হয় না।

(৪) পূর্ববর্তী বন্যার মানচিত্রায়নের মাধ্যমে জেলা স্তর, রাজ্য স্তর এবং জাতীয় স্তরে বন্যাপ্রবণ এলাকাকে চিহ্নিতকরণ করা হয়। যাতে ভবিষ্যতে ওই স্থানে নির্মাণের নিষেধাজ্ঞা জারি ও বন্যানিয়ন্ত্রক নানা প্রকল্প তৈরি করা যায়। Central Water Commission (CWC), Ganga Flood Control Commission (GFCC) এবং Survey of India (SOI)-এর যৌথ উদ্যোগে এই মানচিত্রায়ন এবং চিহ্নিতকরণের কাজটি করে থাকে।

(৫) অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ও উন্নত স্যাটেলাইটের ব্যবহার করে বন্যার আগাম পূর্বাভাস জানানো সম্ভব। ফলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ হ্রাস পায়।

(৬) জনসচেতনতা এবং আপদকালীন ব্যবস্থাপনায় বিস্তারিত জ্ঞান দানের মাধ্যমে স্থানীয় মানুষকে বন্যা আটকানো ও তার থেকে বাঁচার রাস্তা দেখায়, তাই স্কুল কলেজ এবং জনমাধ্যমে এই জ্ঞান বিস্তার করতে হবে।

(৭) বন্যায় দুর্গত মানুষদের উদ্ধার কাজে সরকারি (যেমন— পুলিশ, অগ্নি নির্বাপক দপ্তর, সামরিক বাহিনী) এবং বেসরকারি সংস্থার (যুব সংগঠন, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, ব্যবসায়ী সমিতি) গুরুত্ব অপরিসীম।

### ৫.৯.৩ ভূমিকম্প (Earthquake)

হঠাৎ করে বিপুল পরিমাণের শক্তি ভূ-গর্ভ থেকে বেরিয়ে আসার কারণে ভূ-পৃষ্ঠে কম্পনের সৃষ্টি হয়। এই কম্পনের মাত্রা এতটাই হয়ে থাকে যে বাড়ি ঘর, বৃহৎ ব্রিজ ইত্যাদি নির্মাণ ধূলিসাৎ হতে পারে, একে ভূমিকম্প বলে। ভূগর্ভের যে স্থানে ভূমিকম্পের উৎপত্তি হয় তাকে ভূমিকম্পের কেন্দ্র এবং তার উলম্বভাবে ভূপৃষ্ঠের ওপরের স্থানটিকে ভূমিকম্পের উপকেন্দ্র বলে। ভূমিকম্পের উপকেন্দ্রে কম্পনের তীব্রতা সর্বোচ্চ থাকে। প্রধানত ২ ধরনের তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। প্রাথমিক তরঙ্গ বা 'p' wave যা বস্তুকণার সঙ্কোচন ও প্রসারণের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়, ইহা সর্বপ্রথম উপকেন্দ্রে পৌঁছায় এবং দ্বিতীয় তরঙ্গ বা 's' wave, এই তরঙ্গ পদার্থের পাশাপাশি ধাক্কার জন্য তরঙ্গের ন্যায় পরিবাহিত হয়। এটি তুলনায় কম গতিশীল, তাই প্রাথমিক তরঙ্গের পরে পৌঁছয় কিন্তু ক্ষতির পরিমাণ বেশি।

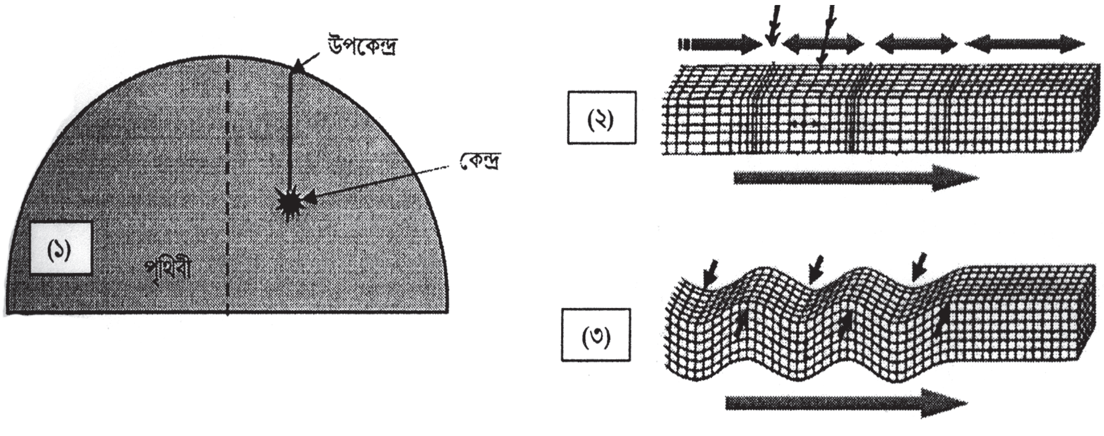


চিত্র ৫.২ : (১) ভূমিকম্পের কেন্দ্র ও উপকেন্দ্র; (২) প্রাথমিক তরঙ্গ বা 'p' wave; (৩) দ্বিতীয় তরঙ্গ বা 's' wave.

সিসমোগ্রাফ দ্বারা ভূমিকম্প সম্পর্কিত তথ্য জানতে পারা যায় এবং রিখটার 'Richter' স্কেল দ্বারা ভূমিকম্পের তীব্রতা মাপা হয়। পূর্বে ঘটে থাকা উল্লেখযোগ্য কিছু ভূমিকম্প—

| তারিখ | স্থান | তীব্রতা | মৃতের সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| ০৩-০১-২০১৭ | ভারত, বাংলাদেশ | ৫.৭ | ৩ |
| ২৬-১০-২০১৫ | আফগানিস্তান, ভারত পাকিস্তান | ৭.৭ | ৩৯৯ |
| ২৫-০৪-২০১৫ | নেপাল, ভারত | ৭.৮ | ৮,৮৬৪ |
| ০৮-১০-২০০৫ | কাশ্মীর | ৭.৬ | ৮৬,০০০-৮৭,৩৫১ |
| ২৬-১২-২০১৪ | সুমাত্রা | ৯.১-৯.৩ | ২২৭,৮৯৮ |
| ২৬-০১-২০০১ | গুজরাত (ভুজ) | ৭.৭ | ১৩,৮০৫-২০,০২৩ |

**ভূমিকম্পের কারণ :**

ভূমিকম্পের কারণগুলি হল—

● প্রাকৃতিক কারণ :

অগ্ন্যুৎপাতের সময় ভূ-গর্ভের গলিত ম্যাগমা ও আবদ্ধ গ্যাস ভূপৃষ্ঠের কোন ফাটল বা নরম অংশ দিয়ে বিপুল শক্তি প্রয়োগ করে বেরিয়ে আসে ফলে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়ে থাকে।

বিপুল সঞ্চিত চাপের প্রভাবে ভূ-অভ্যন্তর শিলা খণ্ড তার স্থিতিস্থাপকতা বজায় রাখতে না পেরে চ্যুতির সৃষ্টি হয় ও ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়ে থাকে। এভাবে সৃষ্টি ভূমিকম্পের তীব্রতা অনেক বেশী হয়ে থাকে।

পাত সঞ্চালন তত্ত্ব অনুযায়ী একটি পাত অন্য পাতের ওপর উঠে গেলে বা একটির থেকে নেমে গেলে ভূকিমম্পের সৃষ্টি হয়ে থাকে। সমুদ্রের মধ্যে হলে এর দ্বারা সুনামিও হয়ে থাকে।

- মনুষ্য সৃষ্ট কারণ : সাধারণত প্রাকৃতিক কারণের জন্যেই ভূমিকম্প ঘটে থাকে তবে কিছু মনুষ্য সৃষ্ট কারণও আছে। যেমন— বৃহৎ জলাধার বা নদী বাঁধ নির্মাণ করার ফলে সঞ্চিত জলের চাপে ভূমিকম্প সৃষ্টি হয়। মাটির নিচে পারমাণবিক শক্তির পরীক্ষা করার ফলেও ভূমিকম্পের সৃষ্টি করে।

**ভূমিকম্পের বিপর্যয় নিয়ন্ত্রণে পরিচালন ব্যবস্থা :**

- নতুন বিল্ডিং তৈরি করার ক্ষেত্রে ভূমিকম্প সহ্য করার ক্ষমতাসম্পন্ন পরিকাঠামো বা প্ল্যান তৈরি করতে হবে এবং তা নির্দিষ্ট দপ্তর দ্বারা যাচাই করার পরই অনুমোদন পাবে।
- জনসচেতনতা কার্যক্রম জরুরি। পরিবারের জন্যে কিভাবে জরুরি ব্যবস্থার মোকাবিলা করবে, first aid দেওয়ার ট্রেনিং দান এবং স্থানীয় ভাষায় লেখা প্রাথমিক ব্যবহারিক বই যাতে সহজে জনগণের করণীয় সম্পর্কে লেখা থাকে তা বিতরণ করা জরুরি।
- তৃণমূল স্তর থেকে শিক্ষার্থীদের ভূমিকম্প মোকাবিলা করার সাধারণ পদ্ধতি শেখানোর জন্যে পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার দায়িত্ব রাজ্য সরকারকে নিতে হবে।

- মেডিক্যাল কলেজে বিপর্যয়ে জরুরি পরিষেবা ও ব্যবহৃত ঔষধের বিষয় পড়ানো প্রয়োজন।
- ভূমিকম্প ঘটার পর সরকারি সাহায্য আসার পূর্বে বেশীরভাগ উদ্ধারকার্য এলাকাবাসীরা করে থাকে, সুতরাং স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী, National Disaster Response Force (NDRF), SDRF, পুলিশ, NGO, অগ্নিনির্বাপক দপ্তর, NSS সবাইকে সমানভাবে প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

### ৫.৯.৪ **ঘূর্ণাবর্ত (Cyclone)**

ভূপৃষ্ঠের ওপর তাপের বৈষম্যের জন্যে বায়ুর চাপেরও বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়। সধারণত উষ্ণ মণ্ডলে, ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলে চাপের বৈষম্যের জন্যে চারিপাশ থেকে উচ্চ চাপযুক্ত শীতল বায়ু ভিতরের দিকে প্রবেশ করতে থাকে এবং গরম বাতাস উপরের দিকে যায়। এর ফলে যা ঘটে তা বিভীষিকাময়, বায়ুর গতিবেগ বেড়ে দাঁড়ায় কমপক্ষে ৬২ km/h থেকে ২২২ km/h এবং তারও বেশি হতে পারে। এর ফলে নিমেষের মধ্যে ঘরবাড়ি ধংস করে দেয়, প্রাণনাশও ঘটে। Indian Meteriologocal Department সাইক্লোনকে ৩টি ভাগে ভাগ করেছে। ৮৯-১১৮ km/h সাইক্লোন; ১১৯-২২১ km/h Severe সাইক্লোন, ২২২ km/h ও তার ওপরে সুপার সাইক্লোন।

**ঘূর্ণাবাত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা :**

১৯৯০ সালে অন্ধ্রপ্রদেশে প্রচণ্ড সাইক্লোন আসার পর বিশ্ব ব্যাঙ্কের তৎপরতায় ভারত প্রথম Cyclone Emergency Reconstruction Project (CERP) তৈরি করে। পরে National Cyclone Risk Mitigetion Project (NCRMP) গৃহ মন্ত্রকের তত্ত্বাবধানে তৈরি হয় যা পরবর্তীকালে National Disaster Management Authority (NDMA) কে হস্তান্তরিত করা হয়।

এই প্রকল্পের প্রধান উপকরণ গুলি হল—

- ঘূর্ণাবর্ত আসার আগাম সতর্ক বার্তা ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে।
- অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা এবং আকাশ থেকে বা Remote Sensing দ্বারা সমুদ্রের উপরে তৈরি হওয়া ঘূর্ণাবর্তের আগাম তথ্য ও অবস্থা সংগ্রহ করা।
- রেডিও, DTH দ্বারা দুর্গম জায়গাতে আগাম সতর্কবার্তা জারি করা।
- ঘূর্ণাবর্তের ঝুঁকি হ্রাস করার জন্যে উপকূলবর্তী ঘূর্ণাবর্তের প্রকোপে পড়া মানুষদের থাকার জায়গা, পশুপাখি থাকার স্থান ইত্যাদি তৈরী।
- জলনিকাশী ব্যবস্থা ঠিক করতে হবে।
- উপকূলবর্তী অঞ্চলের মানচিত্রকরণ, যাতে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এবং অবস্থার পূর্ব বিশ্লেষণ করা সম্ভবপর হয়।
- ম্যানগ্রোভ অরণ্য দ্বারা উপকূলবর্তী অঞ্চলে জৈব প্রতিরোধ তৈরি করতে হবে।
- স্থানীয় জনগণ সাইক্লোনের বিপর্যয়ের প্রত্যাঘাত ও ক্ষয় ক্ষতির মোকাবিলা করার জন্যে প্রশিক্ষণ দান করতে হবে এবং সাইক্লোনের ধ্বংসলীলার পর পুনঃস্থাপন করার জন্য সরকার ও NGO গুলির সাহায্য খুবই জরুরি।

### ৫.৯.৫ ভূমিধস (Landslide)

ভৌম জলের চাপে, অতিবৃষ্টির প্রভাবে, ভূমিকম্প, নির্মাণকার্য বা যানবাহন চলাচল করার জন্যে পাহাড় বা উপকূলবর্তী অঞ্চলের ঢাল থেকে স্খলিত পদার্থ সমূহ মধ্যাকর্ষণের কারণে হঠাৎ করে নেমে আসে, তাকে ভূমিধস বলা হয়ে থাকে। ভূমিধ্বসের জন্যে রাস্তা ঘাট, বসতবাড়ি, বনভূমি সংযোগ ব্যবস্থা নষ্ট হয়।

**ভূমিধসের প্রতিরোধ মূলক ব্যবস্থা :**

- ভূ-বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত পরীক্ষা নিরীক্ষা দ্বারা সঠিক অঞ্চল নির্বাচন করে সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং আইন প্রণয়ন করে ঝুঁকির প্রবণতা কমানো যেতে পারে।
- ভূতাত্ত্বিক মানচিত্র তৈরি করে ভূমিধস প্রবণ এলাকা স্কুল, বাড়ি, হাসপাতাল অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে।
- প্রশাসন ভূতাত্ত্বিকদের সাথে পরামর্শ করে সঠিক নির্মাণের একটি পরিকাঠামো এবং নির্দেশাবলী তৈরি করতে পারে এবং আইন দ্বারা তা বাধ্যতামূলক করতে পারে।
- খাড়া ভূমি ঢালের নিচে বাড়ি তৈরির অনুমতি দেওয়া উচিত না।
- বৃক্ষরোপণ করে সরকার এবং স্থানীয় বাসিন্দারা মাটির দৃঢ়তা বৃদ্ধি করতে পারে যাতে পরবর্তীকালে মাটি আলগা না হয়ে যায় এবং ধ্বস না ঘটে।

## ৫.১০ অনুশীলনী

**সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করুন :**

(১) ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনা কবে হয়?

(i) ৩রা নভেম্বর, ১৯৮১ (ii) ৩রা নভেম্বর, ১৯৮৪ (iii) ৩রা ডিসেম্বর, ১৯৮৪

(iv) ৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯৮৪

(২) মিনামাটা রোগ কোন কোন মৌলের প্রভাবে হয়?

(i) As (ii) Pb (iii) Cd (iv) Hg

(৩) পানীয় জলে আর্সেনিকের অনুমোদিত সর্বোচ্চ মাত্রা—

(i) ০.০১ (ii) ০.৫ (iii) ০.০৫ (iv) ১

(৪) শব্দের প্রাবল্যের মাত্রা মাপা হয়—

(i) ppm (ii) ডবসন (iii) ডেসিবেল (iv) nm

(৫) গাড়ির ধোঁয়া থেকে কি বেরোয়?

(i) NOx (ii) SOx (iii) SPM (iv) $O_3$

**অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্ন :**

(১) দূষণ কাকে বলে?

(২) COD কাকে বলে?

(৩) আর্সেনিক দূষণের ফলে কি কি রোগ হয়?

(৪) মনুষ্য সৃষ্ট বিপর্যয়ের উদাহরণ দিন।

(৫) ভূমিকম্পের কেন্দ্র ও উপকেন্দ্র কাকে বলে?

**সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্ন :**

(১) প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বায়ুদূষণ সম্পর্কে আলোচনা করুন।

(২) জল দূষণের কারণ গুলি ব্যাখ্যা করুন।

(৩) জৈব অক্সিজেন চাহিদা কি আলোচনা করুন।

(৪) বিপর্যয়ের ব্যবস্থাপন সম্পর্কে আলোচনা করুন।

(৫) ভূমিকম্প নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাপনা গুলি আলোচনা করুন।

(৬) স্যানিটারি ল্যান্ডফিল্ডের কাজ প্রণালি ব্যাখ্যা করুন।

**উত্তর সংকেত**

**নির্বাচন ভিত্তিক প্রশ্ন :**

(১) (iii) ৩রা ডিসেম্বর, ১৯৮৪ (২) (iv) Hg (৩) (iii) ০.০৫

(৪) (iii) ডেসিবেল (৫) (i) $NO_x$

# একক ৬ ❑ পরিবেশগত সমস্যা, নীতি এবং চর্চা (Environmental Issues, Policies and Practices)

গঠন

৬.০ উদ্দেশ্য

৬.১ প্রস্তাবনা

৬.২ বিশ্ব উষ্ণায়ন (Global warming)

৬.২.১ কারা কারা গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এ দায়ী

৬.২.২ বিশ্ব উষ্ণায়ণ-এর চিহ্ন বা নজির (Evidence of Global Warming)

৬.৩ অম্লবৃষ্টি : উৎস ও ক্ষতিকারক প্রভাব (Acid rain : Causes and Effects)

৬.৪ ওজন স্তরের বিনাশ (Ozone layer depilation)

৬.৪.১ বায়ুমণ্ডলের ওজোন গ্যাসের উৎপত্তি (Origin of $O_3$ gas in the atmosphere)

৬.৪.২ বায়ুমণ্ডলের ওজোন স্তরের গুরুত্ব (Importance of ozone layer in the atmosphere)

৬.৪.৩ ওজোন গর্ত সৃষ্টির কারণ (Causes of ozone depletion)

৬.৫ পারমাণবিক দুর্ঘটনা (Nuclear Accidents)

৬.৬ মন্ট্রিয়াল প্রোটোকল (১৯৮৭)

৬.৭ কিয়োটো প্রোটোকল (১৯৯৭)

৬.৮ জল সংরক্ষণ (Water Conservation)

৬.৮.১ বৃষ্টির জল সংরক্ষণ (Rain water harvesting)

৬.৯ ভারতে পরিবেশ আন্দোলন (Environmental Movements of India)

৬.৯.১ চিপকো আন্দোলন

৬.৯.২ নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন

৬.৯.৩ তেহরী বাঁধ বিরোধী আন্দোলন

৬.৯.৪ সাইলেন্ট ভ্যালি আন্দোলন

৬.১০ পরিবেশ রক্ষায় সাংবিধানিক ব্যবস্থা সমূহ (Constitutional Provision for Protecting Environment)

৬.১১ অনুশীলনী

## ৬.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানতে পারবেন।

- বিশ্ব উষ্ণায়ন কাকে বলে। যে সমস্ত গ্যাস বিশ্ব উষ্ণায়ণের জন্য দায়ী তাদের উৎস ও প্রভাব।
- অল্পবৃষ্টি। ওজোন স্তরের বিনাশ।
- পারমাণবিক দুর্ঘটনা, মন্ট্রিয়াল ও কিয়োটো প্রোটোকল।
- জল সংরক্ষণ।
- আমাদের ভারতবর্ষের পরিবেশ আন্দোলন এবং পরিবেশ রক্ষায় বিভিন্ন সাংবিধানিক ব্যবস্থাসমূহ।

## ৬.১ প্রস্তাবনা

পৃথিবীতে যে সমস্যা বর্তমানে মানুষের স্থায়িত্বকালকে বিপন্ন করে তুলেছে ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা বৃদ্ধি তার মধ্যে অনত্যম। এটি মানুষের সৃষ্ট তাপদূষণ সমস্যা। বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন গ্যাসের ঘনত্ব বৃদ্ধির দরুন পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই এককে পরিবেশগত বিভিন্ন সমস্যা যেমন বিশ্বউষ্ণায়ণ, অল্পবৃষ্টি, ওজন স্তরের বিনাশ যেমন আলোচনা করা হয়েছে তেমনি আমাদের পরিবেশ বাঁচানোর লক্ষ্যে বিভিন্ন পদ্ধতি ও উল্লেখযোগ্য আন্দোলনের কথা বলা হয়েছে। পরিবেশ রক্ষায় বিভিন্ন সাংবিধানিক ব্যবস্থাও এই এককে আলোচনা করা হল।

## ৬.২ বিশ্ব উষ্ণায়ণ (Global warming)

পৃথিবীর দীর্ঘ ভূতাত্ত্বিক ও জলবায়ুগত বিবর্তনে ভূপৃষ্ঠের গড় তাপমাত্রা একটি নির্দিষ্ট মানে আসার পরই এখানে প্রাণের স্পন্দন মিলেছে। পৃথিবীর গড় স্বাভাবিক তাপমাত্রা 15°C। সূর্য পৃথিবীর এই তাপমাত্রার প্রধান এবং একমাত্র উৎস। পৃথিবীর এই স্বাভাবিক তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত হয় পৃথিবীপৃষ্ঠে আগত সৌর কিরণ (Incoming solar radiation) এবং পৃথিবী থেকে বিগত বা প্রতিফলিত সৌর কিরণের (Outgoing solar radiation) ভারসাম্য দ্বারা। বায়ুমণ্ডলের স্বাভাবিক গ্যাসীয় উপাদান এই তাপীয় ভারসাম্যে এতকাল কোনো প্রকার বিঘ্ন সৃষ্টি করেনি।

কিন্তু শিল্পবিপ্লবের পর অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে এই স্বাভাবিক ভারসাম্যের বিঘ্নতা বিজ্ঞানী মহলের নজরে আসতে শুরু করে। সারা বিশ্ব জুড়ে ভূপৃষ্ঠের গড় উষ্ণতা সামান্য হারে বাড়তে শুরু করে। 1880 থেকে 1980 এই একশো বছরে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বেড়েছে প্রায় 0.6°C। আশঙ্কা করা যাচ্ছে 2100 সাল নাগাদ এই তাপমাত্রা সর্বনিম্ন আরও 1.4°C এবং সর্বোচ্চ আরও 5.8°C বাড়বে। তার কারণ উষ্ণতা বৃদ্ধির এই হার ক্রমবর্ধমান। সারা পৃথিবীর এই গড় উষ্ণতার ক্রমবর্ধমান অবস্থাকে বিজ্ঞানীরা নাম দিয়েছেন "গ্লোবাল ওয়ার্মিং" (Global Warming)। গ্লোবাল ওয়ার্মিং বা উষ্ণায়ণের এই হার নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে নানামত থাকলেও পৃথিবী যে ক্রমশ উত্তপ্ত হচ্ছে এনিয়ে দ্বিমত নেই। এবিষয়ে ইতিমধ্যে বিভিন্ন প্রামাণ্য তথ্য বিজ্ঞানীদের হাতে পৌঁছেছে।

### ৬.২.১ কারা কারা গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এ দায়ী

প্রথমে জানা গিয়েছিল $CO_2$ একমাত্র গ্রিন হাউস গ্যাস, অর্থাৎ $CO_2$-এর ঘনত্ব বৃদ্ধির জন্য পৃথিবীর তাপমাত্রা ক্রমশ বাড়ছে। পরে জানা গেছে মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড, ক্লোরোফ্লুওরো কার্বন ও ওজন গ্যাসও কম দায়ী নয়।

পৃথিবীপৃষ্ঠে তাপমাত্রা বৃদ্ধির ক্ষমতা এদের মধ্যে ক্লোরোফ্লুওরোকার্বনের বেশি, তারপর ক্রমান্বয়ে আসবে নাইট্রাস অক্সাইড, মিথেন, ওজোন ও সবশেষে কার্বন ডাইঅক্সইড।

ক্ষমতা কম হলেও পৃথিবীপৃষ্ঠে উষ্ণতা বৃদ্ধির জন্য মূল দায়ী $CO_2$। উষ্ণতা বৃদ্ধির 55 শতাংশের জন্য দায়ী $CO_2$, 15 শতাংশের জন্য দায়ী মিথেন, 14 শতাংশের জন্য দায়ী ক্লোরোফ্লুওরো কার্বন, 6 শতাংশের জন্য দায়ী নাইট্রাস অক্সাইড এবং ওজোন ও জলীয় বাষ্প প্রত্যেকে প্রায় 4 শতাংশ করে দায়ী। প্রতিবছর এই গ্যাসগুলির পরিমাণ যেভাবে বাড়ছে তা এই রকম— কার্বন ডাই-অক্সাইড 0.4 শতাংশ; মিথেন 1 শতাংশ; নাইট্রাস অক্সাইড 0.3 শতাংশ ও ক্লোরোফ্লুওরোকার্বন 5 শতাংশ।

এখন প্রশ্ন হল এই তাপমাত্রা বৃদ্ধি কী হারে হচ্ছে বা আদৌ হচ্ছে কিনা। বিশেষজ্ঞদের মতে এর উত্তর হ্যাঁ। অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা বৃদ্ধির প্রভাব ইতিমধ্যে আমরা পাচ্ছি।

যে সমস্ত গ্যাসগুলি গ্রিন হাউস প্রভাবের জন্য দীয় তাদের উৎস ও প্রভাব নিম্নে সারণিতে প্রকাশ করা হল।

| গ্যাসের নাম | উৎস | প্রভাব |
|---|---|---|
| ১। কার্বন-ডাই-অক্সাইড ($CO_2$) | ● জীবাশ্মঘটিত জ্বালানি (খনিজতেল, কয়লা প্রভৃতি) ব্যবহারের ফলে।<br>● শিল্প কারখানা ও মোটর গাড়ি ব্যবহারের ফলে।<br>● সিমেন্ট উৎপাদন কারখানা থেকে।<br>● অরণ্য সংহার ও সবুজ নিধনের ফলে $CO_2$-এর পরিমাণ বৃদ্ধি পায় | ● পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে হিমযুগে কার্বন ডাই-অক্সাইডের যে পরিমাণ ছিল আজ তা বেড়েছে প্রায় 1800 কোটি টনের মতো, 0.5% হারে এই বৃদ্ধি ঘটেছে।<br>● পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ এইভাবে বৃদ্ধি পেলে আগামী শতাব্দীতে পৃথিবীর তাপমাত্রা প্রায় 36° সেলসিয়াস বেড়ে যাবে।। |
| ২। মিথেন ($CH_4$) | ● জলাভূমি ও কৃষিক্ষত্রে গাছপালা প্রভৃতির পচনের ফলে, বিভিন্ন জৈব বর্জ্যে, কিছু জীবজন্তুর সাহায্যে এবং তেলখনি থেকে মিথেনের সৃষ্টি হয়।<br>● ভারত, চিন বিভিন্ন দেশগুলির জলমগ্ন ধানখেত গুলি মিথেনের বড়ো উৎস হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। | ● মিথেনের তাপধারণ ক্ষমতা কার্বন ডাই-অক্সাইডের থেকে প্রায় 21 গুণ বেশি। |
| ৩। নাইট্রাস অক্সাইড | ● মাটিতে বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়ার বিক্রিয়া ও গাছপালার জন্য নাইট্রোজেন ঘটিত সার সৃষ্টি হয়।<br>● কলকারখানা, মোটর গাড়ি প্রভৃতি থেকে দহনজনিত কারণেও এটি সৃষ্টি হয়। | ● এটি বছরে 0.25% হারে বাড়ছে।<br>● এটির তাপধারণ ক্ষমতা কার্বন ডাই-অক্সাইডের থেকে 270 গুণ বেশি। |
| ৪। ক্লোরোফ্লুওরোকার্বন (CFC) [এটির মধ্যে উল্লেখযোগ্য [$CFC_{11}$] এবং $CFC_{12}$] | ● ক্লোরিন ও ফ্লুরিনের সংমিশ্রণে একটি বিশেষ ধরনের গ্যাস হল CFC। বিভিন্ন শিল্পে, যেমন রেফ্রিজারেটার ও শীততাপ নিয়ন্ত্রক যন্ত্র তৈরির জন্য, এরোসল, স্প্রেক্যান, প্লাস্টিক, প্রভৃতিতে ইহা ব্যবহৃত হয়।<br>● কলকারখানা, মোটরগাড়ি প্রভৃতি থেকে দহনজনিত কারণেও এটি সৃষ্টি হয়। | ● বায়ুস্তরের কিলোমিটার ওপরে স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার অনেকদিন থাকে।<br>● তাপ ধারণের ক্ষেত্রে এটি কার্বন ডাই-অক্সাইডের থেকে 7000-14000 গুণ বেশি শক্তিশালী। |
| ৫। নিম্নস্তরের ওজোন ($O_3$) | | ● এটির তাপধারণ ক্ষমতা কার্বন ডাই-অক্সাইডের থেকে 2000 গুণ বেশি। |

### ৬.২.২ বিশ্ব উষ্ণায়ণ-এর চিহ্ন বা নজির (Evidence of Global Warming)

সারা পৃথিবীতে উষ্ণায়ণ বা গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর নেগেটিভ প্রভাব কী কী হয়েছে বা হচ্ছে এই নিয়ে একদল বিজ্ঞানী গবেষণায় রত। এদের গবেষণায় ইতিমধ্যে আমরা যে যে নজির বা চিহ্ন পেয়েছি তা সংক্ষেপে আলোচিত হল।

➟ (1) **বায়ুমণ্ডলে $CO_2$ বৃদ্ধি :** আমরা আগেই জেনেছি বায়ুমণ্ডলে $CO_2$-এর মাত্রা শিল্প বিপ্লবের পর অস্বাভাবিক হারে বেড়েছে। শিল্পবিপ্লবের আগে 280 ppm থেকে বর্তমানে প্রায় 360 ppm এ পৌঁছেছে — অর্থাৎ প্রায় 30% বৃদ্ধি। এই মাত্রা গত 160,000 বছরের মধ্যে সর্বাধিক।

➟ (2) **বায়ুমণ্ডলে মিথেন গ্যাসের বৃদ্ধি (Increase of methane gas) :** মিথেন বায়ুমণ্ডলের অন্যতম গ্রিন হাউস গ্যাস। এই গ্যাসও গত 100 বছরে 0.7 ppm থেকে 1.7 ppm-এ তে অর্থাৎ প্রায় 145% বেড়েছে। বর্তমানে প্রতি বছর 540 মিলিয়ান টন মিথেন বায়ুমণ্ডলে মেশে।

➟ (3) **আবহাওয়ার ঘনঘন পরিবর্তন (Frequent change weather) :** গত দুশো (1800-2000) বছরের মধ্যে 1999 ছিল সর্বাধিক তাপীয় বছর এবং এরই মতো চরম তাপীয় অবস্থা এই সময়ে 5 বার হয়েছিল। ফলে খরা ও বন্যার প্রকোপও বেড়েছে লক্ষণীয়ভাবে। আমেরিকা ইউরোপে দেখা গেছে গত 50 বছরের মধ্যে শীতলতম শীতকাল। এই সময়ে তুষারপাত, তুষারঝড় ও বন্যার তীব্রতাও বেড়েছে। গত 25 বছরের মধ্যে তীব্রতম তুষার ঝড় হয়েছে জাপান ও কোরিয়ায়। এই সময়ে থাইল্যান্ড শীতলতম শীতকালের মুখোমুখি হয়েছে। এই ধরনের শীতকাল এসেছে তীব্রতম গ্রীষ্মের পরে। লন্ডনে দেখা গেছে 300 বছরের মধ্যে শুষ্কতম NOAA-র (National Climatic data centre) ডিরেক্টর থমাস কার্ল (Thomas Karl)-এর মতে গত বছরে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে। গত শেষ শতাব্দীতে (1900-2000) পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধির পরিমাণ 0.6°C। এবং শেষ হিমযুগের পর (1800-2000 বছর আগে) বায়ুমণ্ডলে তাপমাত্রা প্রায় 5°-9°F বেড়েছে।

➟ (4) **হিমবাহের অন্তর্ধান কিংবা পশ্চাদপসরণ (Disappearing or retreat of glacier) :** বরফের গলন কিংবা হিমাবাহের পশ্চাদপসারণ হল গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর সবচেয়ে বড়ো এবং নির্ভরযোগ্য প্রমাণ। পৃথিবীর 6টি মহাদেশের এই ঘটনা ঘটে চলেছে।

(i) উত্তর আমেরিকা মহাদেশের সবচেয়ে বড়ো হিমবাহ বেরিং হিমবাহ (Bering glacier) যা প্রায় 11 দৈর্ঘ্যে কমেছে; অর্থাৎ ইতিমধ্যে সে তার আয়তনের 20-25% হারিয়েছে।

(ii) দক্ষিণ পেরুর কুৎরি হিমবাহ (Qori glacier) গত 14 বছরে (1983-2000) আগের 100 বছরের চেয়ে প্রায় 3 গুণ বেশি হারে গলতে শুরু করেছে।

(iii) গ্রিনল্যান্ডের হিমবাহগুলো সমুদ্রের দিকে বেশী গতিতে এগোতে শুরু করেছে। এটি সম্ভবত হিমবাহ গলন এবং গলনের ফলে উৎপন্ন জল হিমবাহের নীচে পিচ্ছিলকারক পদার্থ হিসাবে কাজ করার ফলে ঘটেছে।

(iv) আমাদের ঘরের কাছে হিমালয়ের হিমবাহেও একই ঘটনা লক্ষ করা গেছে। বর্তমানে গঙ্গার উৎপত্তি গঙ্গোত্রী হিমবাহ প্রায় প্রতি বছরে 30 মিটার হারে পৌঁছোচ্ছে। এই হার গত 1935 এবং 1990-এর প্রায় গড়ে 18 মিটার এবং 1842 ও 1935-এর মধ্যে ছিল গড়ে প্রায় 7 মিটার।

এই প্রসঙ্গে নেপাল পর্বতারোহণ সংস্থার (Nepal Mountaineering Association) ডিরেক্টরের বক্তব্য উল্লেখযোগ্য। আজ থেকে 50 বছর আগে এডমন্ড হিলারী ও তেনজিং নোরগে (Edmond Hillary ও Tenzing Norgay) যে স্থান দিয়ে হিমালয়ের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিলেন তা বর্তমানে সরেছে কিমি অর্থাৎ বেড়েছে অতিরিক্ত প্রায় 2 ঘণ্টার পথ।

➟ (5) **সুমেরু ও কুমেরু সাগরে বরফের গলন (Melting of Arctic and Antartic ice) :** পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণের আর্কটিক ও অ্যান্টার্কটিকা বিস্তৃত বরফ রাশিও গলতে শুরু করে অস্বাভাবিক হারে। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন গত 1958 থেকে 1976-তে যেখানে সুমেরুতে বরফের গড় উচ্চতা ছিল 3 মিটার তা 1993 থেকে 1997-এর গড় হিসাবে কমে দাঁড়িয়েছে প্রায় 1.8 মিটারে। অর্থাৎ গত 30 বছরে সুমেরুর বরফ প্রায় 40% আয়তনে কমেছে— বছরে গড়ে সংকুচিত হয়েছে প্রায় বর্গ 38,000 কি.মি.। বিজ্ঞানী আরও বলেছেন যে এভাবে চলতে থাকলে আগামী 50 বছরের পর সুমেরুর গ্রীষ্মে আর কোনো বরফ পাওয়া যাবে না।

কুমেরু অঞ্চলেও প্রায় 5°F হারে গত 50 বছরে প্রায় 5°F তাপমাত্রা বেড়েছে। ফলে বিশাল বিশাল হিমশৈল দক্ষিণ মেরুর মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে।

➟ (6) **ক্রান্তীয় রোগের প্রাদুর্ভাব (Outbreak of Tropical diseases) :** ক্রান্তীয় অঞ্চলে বিভিন্ন নিত্যনতুন রোগের প্রাদুর্ভাবের কারণও এই তাপমাত্রা বৃদ্ধি। নিউজিল্যান্ডের "ওয়েলিংটন স্কুল অফ মেডিসিনের" চিকিৎসকরা এ বিষয়ে গবেষণা করেন। তাদের মতে দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে ঘনঘন ডেঙ্গু জ্বরের (Dengue fever) প্রাদুর্ভাবের পিছনে গ্লোবাল ওয়ার্মিংই দায়ী। এই একই কারণে আফ্রিকার নিত্য নতুন দেশে পীতজ্বরের (yellow fever) প্রকোপও দেখা দিচ্ছে। হাবার্ড স্কুল অব্ পাবলিক হেলথের (Harvard's School of Public Health) চিকিৎসকদের মতে গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর ফলে বর্তমানে এনকেফালাইটিস (encephalitis), ম্যালেরিয়া (malaria) ইত্যাদির মতো রোগসমূহ এশিয়া, লাতিন অ্যামেরিকা কিংবা আফ্রিকা মহাদেশের উচ্চ অংশে দেখা দিচ্ছে যা গত 50 বছরে প্রায় ঘটেনি।

➟ (7) **অন্যান্য প্রভাব (Ohter symptoms) :** গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর অন্যান্য প্রভাবের মধ্যে অন্যতম হল সমুদ্রের বিভিন্ন দ্বীপপুঞ্জের চারিদিকে সমুদ্র জলতলের উচ্চতা বৃদ্ধি (Sea level rise)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়ার্ল্ড ওয়াচ ইনস্টিটিউটের হিসাব অনুযায়ী পৃথিবী জুড়ে সমুদ্রের জলস্তর বাড়ছে প্রতি 20 বছরে এক ইঞ্চি করে। পৃথিবীর প্রবাল দ্বীপগুলি তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। গত 2000 অক্টোবরে ইন্দোনেশিয়ার বালিতে অনুষ্ঠিত "নাইন্থ ইন্টারন্যাশনাল কোরাল রীফ সিম্পোজিয়ামে"-এর তথ্য (9th International Coral Reef Symposium) অনুসারে ইতিমধ্যে পৃথিবীর প্রায় 27% প্রবাল দ্বীপ নষ্ট হয়ে গেছে। আগামী 20 বছরে বাকি দ্বীপগুলোর প্রায় সমস্ত প্রবাল মারা যাবে যদি বর্তমান হারে গ্লোবাল ওয়ার্মিং থাকে অ্যান্টার্টিকায় আলগির (algae) উপর নির্ভরশীল ক্রিলের (Krill) সংখ্যা ক্রমশ কমা এবং পাখিদের পরিযায়ীতার (migratory nature) পরিবর্তনও গ্লোবাল ওয়ার্মিংকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

## ৬.৩ অম্লবৃষ্টি : উৎস ও ক্ষতিকারক প্রভাব (Acid rain : Causes and Effects)

অম্ল বৃষ্টির উৎস ও ক্ষতিকারক প্রভাব সম্বন্ধে নীচে আলোচনা করা হল—

| উৎস | ক্ষতিকারক প্রভাব |
|---|---|
| ● বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন ও ভাসমান ধূলিকণাগুলি জলের সঙ্গে আলোক রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটিয়ে সালফার ডাই-অক্সাইড ($SO_2$) এবং সারফিউরিক অ্যাসিড ($H_2SO_4$) তৈরি করে।<br>● কয়লা, খনিজতেল প্রভৃতির প্রচুর পরিমাণে দহনের ফলে বায়ুমণ্ডলে সালফার (S) ও কার্বন-মনোক্সাইড (CO) ও নাইট্রোজেনের পরিমাণ সঠিক পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই নাইট্রোজেন ও সালফার ঘটিত অক্সাইডগুলি আলোক রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে নাইট্রিক অ্যাসিড ($HNO_3$) ও সালফিউরিক অ্যাসিড ($H_2SO_4$) তৈরি করে।<br>● নাইট্রিক অ্যাসিড ও সালফিউরি অ্যাসিড বায়ুমণ্ডলে মিশে থাকা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (HCl)-এর সঙ্গে মিশে অম্লবৃষ্টি ঘটায়।<br>অম্লবৃষ্টি তৈরির রাসায়নিক সমীকরণ হল—<br>(ক) সালফার-ডাই-অক্সাইড ($SO_2$) + জলীয়বাষ্প ($H_2O$) → সালফিউরিক অ্যাসিড ($HNO_3$)<br>(খ) নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড ($NO_2$) + জলীয়বাষ্প ($H_2O$) → নাইট্রিক অ্যাসিড ($HNO_3$) ও নাইট্রাস অ্যাসিড ($HNO_2$) | ● জলধারাগুলি জল দূষিত হয় এবং উদ্ভিদ ও প্রাণীর প্রজাতি হ্রাস করে।<br>● ঘরবাড়ি, স্থাপত্যশিল্পে, মনুমেন্ট, স্মৃতিসৌধ ও অট্টালিকার ক্ষতি সাধিত হয়।<br>● জলধারাগুলির জলদূষিত হয় এবং উদ্ভিদ ও প্রাণীর প্রজাতি হ্রাস করে।<br>● অরণ্যের উদ্ভিদ ধ্বংস করে।<br>● মৃত্তিকার উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস করে।<br>● অম্লধর্মী মৃত্তিকার বিভিন্ন ধাতু (তামা, জিঙ্ক, অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি) মাটির গভীরে ঢুকে জলকে দূষিত করে।<br>● উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। জমির উর্বরতা নষ্ট হয়।<br>● অম্লবৃষ্টিতে দুই রকমের অ্যাসিড তৈরি হয়। সালফিউরিক অ্যাসিড এবং নাইট্রিক অ্যাসিড। এই অ্যাসিডগুলি শ্বাসনালিতে ও ফুসফুসে নানা রোগে সৃষ্টি করে। এমনকি এর প্রভাবে ফুসফুসে ক্যানসার পর্যন্ত হতে পারে। এ ছাড়াও পরিপাকতন্ত্র ও নার্ভতন্ত্রেরও ক্ষতি সাধিত হয়।<br>উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মথুরার কাছে তৈলশোধনাগার থেকে সালফার-ডাই-অক্সাইড ($SO_2$) ও অন্যান্য গ্যাস নির্গত হয়ে চলেছে যা জলীয় বাষ্পের সাথে বিক্রিয়া করে অ্যাসিড তৈরি করে। ফলে তাজমহলের মার্বেল পাথরে নানারকম ক্ষয় দেখা যাচ্ছে। |

## ৬.৪ ওজন স্তরের বিনাশ (Ozone layer depilation)

ওজোন হল নীলরঙের মৎস গন্ধযুক্ত এক ধরনের গ্যাস — অক্সিজেনের সঙ্গে যার তফাত খুব সামান্য। ওজোনকে অক্সিজেন গ্যাসের রূপভেদও বলা যায়। তিনটি অক্সিজেন পরমাণু পুড়ে তৈরি হয় একটি ওজোন অণু ($O_3$)। 1840 খ্রিঃ বিজ্ঞানী স্কোনবি (Sconbien) সর্বপ্রথম ওজোনের অস্তিত্ব প্রমাণ করেন।

বায়ুমণ্ডলে স্ট্রাটোস্ফিয়ারের উচ্চ অংশে প্রাকৃতিক কারণে অক্সিজেন অণু এবং অক্সিজেন পরমাণুর রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ওজোন গ্যাস উৎপন্ন হয়। সমগ্র স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে ওজোন গ্যাসের অস্তিত্ব পাওয়া গেলেও এর ঘনত্ব সর্বাধিক থাকে 15-35 কিমি উচ্চতায়। এই অংশ ওজোনস্তর (Ozone layer) বা ওজোনোস্ফিয়ার (Ozonosphere) নামে পরিচিত। ওজোনোস্ফিয়ারে ওজোনের গাঢ়ত্ব খুবই কম— মাত্রা 10 ppm। একে ভূপৃষ্ঠের বায়ুচাপ ও তাপমাত্রায় নিয়ে এলে 3 মিলিমিটার পুরু বাতাসের মতো হবে এবং ওজন হবে প্রায় 30 কোটি টনের

মতো। ওজোনের সর্বাধিক গাঢ়ত্ব ক্রান্তীয় অঞ্চলে 25 কিমি উর্ধ্বে, 21 কিমি উর্ধ্বে মধ্য অক্ষাংশে আর 18 কিমি উর্ধ্বে মেরু অঞ্চলে।

সাধারণত বায়ুমণ্ডলে ওজোনের ঘনত্বকে পিপিএম (ppm)-এর বদলে ডবসন এককে (Dobson unit) প্রকাশ করা হয়। এক ডবসন (DB) একক বলতে এক বায়ুমণ্ডলীয় চাপে 0.001 মিলিমিটার পুরু ওজোনের ঘনত্বকে বোঝায়। ক্রান্তীয় অঞ্চল থেকে মেরু অঞ্চলের দিকে ওজোনের ঘনত্ব ক্রমশ বাড়ে। ক্রান্তীয় (0°–30°) অঞ্চলে এই ঘনত্ব মাত্র 250 DU। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের (30°–60°) বায়ুমণ্ডলে ওজোনের স্বাভাবিক ঘনত্ব 350 DU এবং মেরু দেশীয় অঞ্চলে (60°-এর অধিক) প্রায় 450 DU।

নিম্ন অক্ষাংশ থেকে উচ্চ অক্ষাংশে ওজোনের ঘনত্ব অধিক হওয়ায় মূল কারণ স্ট্র্যাটোস্ফিরিক অঞ্চলে নিয়মিত উচ্চ বায়ুপ্রবাহের ফলে ক্রান্তীয় অঞ্চলের থেকে উপমেরু অঞ্চলে ওজোন গ্যাসের পরিবহন বা স্থানান্তর।

### ৬.৪.১ বায়ুমণ্ডলের ওজোন গ্যাসের উৎপত্তি (Origin of $O_3$ gas in the atmosphere)

সূর্য থেকে অনবরত যে আলো পৃথিবীতে এসে পৌঁছোচ্ছে তার সঙ্গে অতিবেগুনি বা আলট্রাভায়োলেট (Ultra violate rays) রশ্মিও আসছে। এই অতিবেগুনি রশ্মিকে তিনভাগে ভাগ করা যায় যথা—

➟ (i) ইউ ভি এ (UV-A) — তরঙ্গ দৈর্ঘ্য 315 – 400 nm

➟ (ii) ইউ ভি এ (UV-B) — তরঙ্গ দৈর্ঘ্য 280 – 315 nm

➟ (iii) ইউ ভি এ (UV-C) — তরঙ্গ দৈর্ঘ্য 100 – 280 nm

দেখা গেছে এই অতিবেগুনি রশ্মির মধ্যে সবচেয়ে কম যাদের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য অর্থাৎ ইউ ভি সি এবং খানিকটা ইউ ভি বি বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেনকে ভেঙে জায়মান অক্সিজেন তৈরি করে। আর এই জায়মান অক্সিজেন পরমাণু (O) আর একটি অক্সিজেন অণুর ($O_2$) সঙ্গে মিলে ওজোন তৈরি করে। এই শেষোক্ত বিক্রিয়াটিতে প্রচণ্ড তাপ উৎপাদন হওয়ায় স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার স্তরে বায়বীয় তাপমাত্রা ট্রপোস্ফিয়ারের তুলনায় অনেক বেশি হয়।

$$O_2 \xrightarrow{\text{UV-C+UV-B}} [O] + [O]$$

$$2O_2 + 2\,[O] \rightarrow 2O_3 + \text{তাপ}$$

### ৬.৪.২ বায়ুমণ্ডলের ওজোন স্তরের গুরুত্ব (Importance of ozone layer in the atmosphere)

ভূপৃষ্ঠে ওজোন গ্যাস একটি পরিবেশ দূষক পদার্থ হিসাবে কাজ করলেও স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের ওজন পৃথিবীর যাবতীয় প্রাণের রক্ষক হিসাবে কাজ করে। ওজনের একটি পাতলা স্তর সূর্যকিরণ থেকে ক্ষতিকর অতিবেগুনি রশ্মির বেশির ভাগ অংশকেই রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে আটকে দেয়। অর্থাৎ ওজোন স্তর পৃথিবীর জীব পরিবেশের প্রাকৃতিক সৌরপর্দা বা ছাতা হিসাবে কাজ করে। কোনো কারণে ওজোনস্তরে ছিদ্র তৈরি হলে পৃথিবীতে ক্ষতিকারক ইউ ভি বি রশ্মির আগমন ঘটবে। ফলে জীবজগতের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। মনে রাখা দরকার পৃথিবী সৃষ্টির বহু কোটি বছর পর পৃথিবীতে প্রাণ এসেছিল মূলত অক্সিজেন হীন, ওজোনস্তর হীন বায়ুমণ্ডলীয় পরিবেশের জন্য। অগভীর সাগরের তলদেশে প্রথম প্রাণ এসেছিল, কারণ তল অতিবেগুনি রশ্মি আটকে দেয়। পরবর্তীকালে স্বভোজী সবুজ উদ্ভিদের আবির্ভাবে বাতাসে অক্সিজেন জমে ওজোন স্তর সৃষ্টি করেছিল। তারপরই জৈববিবর্তনে পৃথিবীতে প্রাণের সমারোহ এসেছিল।

সুতরাং সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মির ক্ষতিকর ক্ষমতা ভয়ংকর। আর এই ওজোন স্তরের সামান্য এক শতাংশ ক্ষয় ঘটলে পৃথিবীপৃষ্ঠে ক্ষতিকারক ইউ ভি-বি-র মাত্রা বা তীব্রতা দুই শতাংশ বেড়ে যায়। এখন দেখা যায় এই ইউ ভি-বি রশ্মি জীবজগতের কী কী ক্ষতি করতে পারে।

● (1) জীবদেহে কার্বন-কার্বন, কার্বন-হাইড্রোজেন, অক্সিজেন-হাইড্রোজেন ইত্যাদি বন্ধন (Bond) রয়েছে। বেশির ভাগ রাসায়নিক বন্ধন ভাঙতে শক্তি লাগে মোটামুটি $6.95 \times 10^{-19}$ জুলের মতো। 200 nm তরঙ্গদৈর্ঘ্যের তড়িৎ চুম্বকীয় (যেখানে UV-B-এর তরঙ্গদৈর্ঘ্য প্রায় 280–315 nm) রশ্মির শক্তিমাত্রা প্রায় $9.93 \times 10^{-19}$ জুল প্রতি ফোটনে। সুতরাং অতিবেগুনি রশ্মির প্রভাবে জীবদেহের যে-কোনো রাসায়নিক বন্ধন সরাসরি ভাঙতে সক্ষম। ফলে জীবদেহে নানারকম বিপত্তির সৃষ্টি হয়।

● (2) অতি অল্পবয়সেই চোখে ছানি (eye cataract) পড়তে পারে। তথ্য বলে ইউ ভি-বি রশ্মির তীব্রতা যদি 10 শতাংশ বাড়ে তাহলে 50 বছরের কম বয়সের মানুষের চোখে ছানি পড়ার সম্ভাবনা অন্তত 6 শতাংশ বৃদ্ধি পায়। ঠিক সময়ে চিকিৎসা না করালে অন্ধ হয়ে যাওয়ারও আশঙ্কা থাকে।

● (3) ত্বকের উপর নানারূপ ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলে এই ইউ ভি-বি রশ্মি। অল্প বয়সেই ত্বক কুঁচকে বয়স্ক মানুষের মতো হতে পারে। কখনো ত্বক পুড়ে তামাটে বর্ণ ধারণ করে (Suntan)। তা ছাড়া ইউ ভি-বি রশ্মি ত্বকের ক্যানসার (Cancer) ঘটাতে সক্ষম। বর্তমানে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় ম্যালিগনেন্ট ত্বক ক্যানসারের হার বৃদ্ধি পাওয়ায় বিজ্ঞানীরা সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মিকে দায়ী করেছেন।

● (4) ইউ ভি-বি রশ্মির দীর্ঘকালীন প্রভাবে মানুষের অনাক্রমতা (immunity) কমে। ফলে মানুষ খুব সহজেই সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হয়।

● (5) গাছের পাতার সালোকসংশ্লেষ ক্ষমতা কমে যায়। ফলে খাদ্য উৎপাদন ব্যাহত হতে পারে। তাছাড়া ইউ ভি-বি রশ্মির প্রভাবে সরাসরি উদ্ভিদের পাতা, ফল এবং বীজের বৃদ্ধি হ্রাস পায়।

● (6) সমুদ্রের এককোশী উদ্ভিদ এবং মাছের একমাত্র খাদ্য ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটনের বৃদ্ধি কমে যায়। ফলে সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্র যেমন নষ্ট হবে তেমনি মাছের উৎপাদনও অস্বাভাবিক কম হবে।

### ৬.৪.৩ ওজোন গর্ত সৃষ্টির কারণ (Causes of ozone depletion)

বায়ুমণ্ডলে ওজোন গ্যাসের সৃষ্টি ও ধ্বংস একটি প্রাকৃতিক ঘটনা। কিন্তু কোনো কারণে ওজোনের সৃষ্টির চেয়ে ধ্বংসের হার বেশি হলে স্বাভাবিকভাবে ওজোনস্তর ক্রমশ পাতলা হবে, ফলস্বরূপ তৈরি হবে 'ওজোন হোল' (Ozone hole)। কিন্তু এই ওজোন ক্রমশ কমে যাবার কারণ কী? এর কারণ হিসাবে রসায়নবিদরা যে সব তথ্য দিয়েছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ক্লোরিন দুষ্ট পদ্ধতি। এই পদ্ধতির সবচেয়ে আদর্শ জায়গা অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশ।

অ্যান্টার্কটিকায় 6 মাস শীতকাল থাকে। ওই সময় প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় শীতকালীন তাপমাত্রা নেমে যায় –88°C পর্যন্ত এবং গ্রীষ্মে তা আবার 11°C পর্যন্ত ওঠে। শীতকালে তাই এই নিম্ন তাপমাত্রায় বায়ুমণ্ডলীয় সমস্ত দূষক গ্যাস জমাট বেঁধে কেলাসাকারে পোলার স্ট্র্যাটোস্ফিরিক মেঘে (Polar stratospheric clouds–PSC) পরিণত হয়। এই সময় জমাট বাঁধা প্রধান দূষক গ্যাসগুলি হল হাইড্রোজেন ক্লোরাইড (HCl), জলীয় বাষ্প ($H_2O$), নাইট্রোজেন অক্সাইড ($NO_2$) এবং ক্লোরিন নাইট্রেট ($ClONO_2$)। এই অবস্থায় HCl-এর সঙ্গে $ClONO_2$ এর বিক্রিয়ায় ক্লোরিন গ্যাস উৎপন্ন হয় এবং প্রচণ্ড শীতে স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের নীচের দিকে সঞ্চিত হয়।

বসন্তের শুরুতে (সেপ্টেম্বর অক্টোবরে) সূর্য কিরণের আবির্ভাব হয় এবং ক্লোরিন অতিবেগুনি রশ্মির দ্বারা বিয়োজিত হয়ে ক্লোরিন পরমাণুতে পরিণত হয় (Cl) যা প্রবল বিক্রমে অনুঘটকীয় ক্রিয়াবিধিতে ওজোন স্তরের ক্ষয় করে চলে। তৈরি হয় 'ওজোন হোল' বা ওজোন গর্ত।

**বিক্রিয়া :**

(i) বসন্তের বায়ুমণ্ডলে অক্সিক্লোরাইড মূলক উৎপাদন : $Cl^{\bullet} + O_3 \rightarrow ClO^{\bullet} + O_2$

(ii) অক্সিক্লোরাইড মূলক নিষ্ক্রিয়করণ : $Cl^{\bullet} + NO_2 + M \rightarrow ClONO_2 + M$ (M = অনুঘটক)

(iii) বায়ুমণ্ডলীয় জলীয় বাষ্পের সঙ্গে বিক্রিয়ায় নাইট্রিক অ্যাসিড উৎপাদন ($HNO_3$) :

$$ClONO_2 + H_2O \rightarrow HOCl + HNO_3$$

(iv) প্রাক্ বসন্তের আলোয় পারমাণবিক ক্লোরিন উৎপাদন :

$$HOCl \xrightarrow{\text{UV-B}} HO^{\bullet} + Cl^{\bullet}$$

$$Cl_2 \xrightarrow{\text{UV-B}} Cl^{\bullet} + Cl^{\bullet}$$

(v) বসন্তের শুরুতে ওজোন ক্ষয় শুরু : $O_3 + Cl^{\bullet} \rightarrow ClO + O_2$

(vi) আবার একইভাবে ClO থেকে $ClONO_2$ উৎপন্ন হয় এবং এভাবেই চলে এক শৃঙ্খল বিক্রিয়া (Chain reaction)।

## ৬.৫ পারমাণবিক দুর্ঘটনা (Nuclear Accidents)

পারমাণবিক শক্তি বিপুল শক্তির আধার, বিশ্বের বিদ্যুৎ শক্তির চাহিদার 13% পূরণ হয় পারমাণবিক শক্তি দ্বারা, পারমাণবিক শক্তি পরিশুদ্ধ এবং কোনরকম গ্রীন হাউস গ্যাস নিঃসরণ করে না এবং অন্যান্য শক্তির তুলনায় ক্ষতির পরিমাণও কম। কিন্তু অত্যাধুনিক সুরক্ষা ব্যবস্থা থাকাতেও যে দুর্ঘটনাগুলি ঘটেছে তার ভয়াবহতা মারাত্মক রকমের।

পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণে ১৯৪৫ সালে জাপানের দুটি মূল শহর হিরোশিমা ও নাগাসাকি প্রায় ধুলিস্যাৎ হয়ে যায়। মারা যায় হাজারেরও বেশি মানুষ এবং লক্ষাধিক মানুষ আহত হয় এবং এই পরমাণু বোমার তেজস্ক্রিয়তা আজও প্রকৃতিতে বর্তমান। এছাড়া আজ পর্যন্ত মোট ৩টি পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে দুর্ঘটনা উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছে যাদের ভয়াবহতা পারমাণবিক বিস্ফোরণের মতই, তিন মাইল আইসল্যান্ড, চেরনোবিল এবং ফুকুসিমায় ঘটা দুর্ঘটনা।

**চেরনোবিল দুর্ঘটনা (Chernobyl disaster) :**

১৯৮৬ সালে ২৬ শে এপ্রিল, ইউক্রেনে সৃষ্ট দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকা সর্ববৃহৎ পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র চেরনোবিলে সকালবেলায় ৪নং রিয়েকটারে বিস্ফোরণ ঘটে যা বিশ্বে সর্ববৃহৎ পারমাণবিক দুর্ঘটনা নামে পরিচিত। পারমাণবিক কেন্দ্রের পরিচালকগণ একটি গবেষণা মূলক কারণে রিয়েকটারের স্বয়ংক্রিয় ভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়ার ব্যবস্থাটি বন্ধ রাখেন যার ফলে পারমাণবিক বিক্রিয়া আয়ত্তের বাইরে চলে যায় ও বিস্ফোরণ ঘটে। প্রায়

৩০টি আগুন লাগে যা নেভাতে ১০০-র বেশি অগ্নিনির্বাপক আধিকারিকের ১০ দিন সময় লাগে, ৬০০০০ বাড়িকে দূষণ মুক্ত করতে হয় এবং ১০ দিনের মধ্যে ১,৩৫,০০০ মানুষ এবং ৮০,০০০ পালিত পশুকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। তেজস্ক্রিয় দূষণ আশেপাশে প্রায় ১০০০ বর্গকিমি পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। এই দুর্ঘটনা ঘটার পরও ভারতবর্ষ সহ বহু উন্নয়নশীল ও উন্নত দেশ পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র তৈরি করছে এবং ভবিষ্যতে এই ধরনের দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা অনেক।

**ফুকুসিমা দুর্ঘটনা (Fukushima Daiichi nuclear disaster) :**

২০১১ সালে ১১ই মার্চ জাপানের ফুকুসিমা ডাইচির পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রটি সুনামির আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ভূকম্পনের ফলে ৩টি রিয়েকটারের ঠাণ্ডা করার প্রণালি ব্যাহত হয় এবং রিয়েকটারগুলি গলে যায় এবং ফাটল ধরে। পরবর্তীকালে অন্য ট্রিটম্যান্ট প্লান্টের জল ব্যবহার করে রিঅ্যাক্টারের তাপমাত্রা কমিয়ে ৮০ ডিগ্রির নীচে নিয়ে আসা হয়। কোনরকম প্রাণহানির ঘটনা না ঘটলেও ফাটলের মধ্য দিয়ে তেজস্ক্রিয় পদার্থ বাইরে বেরিয়ে আসার সম্ভাবনা থেকেই থাকে। প্রায় লক্ষাধিক মানুষকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

## ৬.৬ মন্ট্রিয়াল প্রোটোকল (১৯৮৭)

ওজোন স্তরকে বিনষ্টকারী পদার্থের ওপর তৈরি করে ভিয়েনা সম্মেলনে উল্লেখিত একটি খসড়া হল মন্ট্রিয়াল প্রোটোকল। এটি একটি আন্তর্জাতিক চুক্তিপত্র যার প্রধান লক্ষ ধাপে ধাপে ওজোন স্তরকে বিনষ্ট করা পদার্থগুলির উৎপাদন বন্ধ করা। এটি ১৯৮৭ সালে ২৬ শে আগস্ট সম্মেলনে সর্বসম্মত হয় এবং স্বাক্ষরিত হয় ও ১৯৮৯ সালে ২৬ শে আগস্ট লাগু করা হয়। তারপর থেকে প্রপোজালটি ৯বার সংস্করণ করা হয়, ১৯৯০ (লন্ডন), ১৯৯১ (নাইরোবি), ১৯৯২ (কোপেনহেগেন), ১৯৯৩ (ব্যাঙ্কক), ১৯৯৫ (ভিয়েনা), ১৯৯৭ (মন্ট্রিয়াল), ১৯৯৮ (অস্ট্রেলিয়া), ১৯৯৯ (বেজিং), ২০০৭ (মন্ট্রিয়াল)।

**মন্ট্রিয়াল প্রোটোকলের উদ্দেশ্যগুলি হল :**

● ধাপে ধাপে ওজন স্তর বিনষ্টকারী রাসায়নিক ক্লোরোফ্লুরো কার্বন (CFCs) কমানো।

● ধাপে ধাপে সুপরিচালন ব্যবস্থার মাধ্যমে ওজোন স্তর বিনষ্টকারী হাইড্রো ক্লোরোফ্লুরো কার্বন (HCFCs) কমানো।

● হাইড্রোফ্লুরো কার্বন নির্গমন হ্রাস করা, যদিও এটি ওজোন স্তর বিনষ্ট করে না তবুও এটি একটি গ্রিন হাউস গ্যাস এবং বিশ্ব উষ্ণায়নে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

এই সর্বোব্যাপী ওজোন ধ্বংসকারী পদার্থের উৎপাদন ও ব্যবহার কম হবার জন্যে অ্যান্টার্কটিকার ওজোন গহ্বর ধীরে ধীরে ঠিক হয়ে আসছে। বিভিন্ন আবহাওয়া মডেল দ্বারা এটি অনুমান করা যাচ্ছে যে আগামী ২০৫০ থেকে ২০৭০ সালের মধ্যে ওজোন স্তর ঠিক হয়ে পূর্বের ১৯৮০ সালের অবস্থায় ফিরে যায়।

## ৬.৭ কিয়োটো প্রোটোকল (১৯৯৭)

কিয়োটো প্রোটোকল একটি বহুরাষ্ট্রীয় আন্তর্জাতিক চুক্তি যা United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) দ্বারা প্রতিস্থাপিত। ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বর জাপানের কিয়োটো শহরে

এই চুক্তি প্রথম গ্রহিত হয় এবং রাশিয়ার সম্মতির পর ২০০৫ সালে ১৬ই ফেব্রুয়ারি প্রথম কার্যকরী হয়। বর্তমানে এই চুক্তি দ্বারা ১৬৯টি দেশ দায়বদ্ধ। কিয়োটো চুক্তি স্বাক্ষরিত দেশগুলি ১৯৯০-২০১২ সালের মধ্যে, ৬টি গুরুত্বপূর্ণ গ্রিনহাউস গ্যাস যথা, কার্বন ডাই-অক্সাইড ($CO_2$), মিথেন ($CH_4$), নাইট্রোজেন অক্সাইড ($N_2O$), হাইড্রোফ্লুরো কার্বন (HFCs), পারফ্লুরো কার্বন (PFCs) এবং সালফার হেক্সা ফ্লুরাইড ($SF_6$)-এর পরিমাণ ৫.২% কমানোর জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

চিন এবং ভারতবর্ষ এই চুক্তি দ্বারা দায়বদ্ধ হলেও যেহেতু খুবই নগন্য মাত্রায় গ্রিন হাউস গ্যাস উৎপাদন করে থাকে তাই এখুনি তারা গ্রিন হাউস গ্যাস কমানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করবে না। যদিও ৫.২% উৎপাদনটি সমস্ত দেশের গড় মাত্রা তবু দেশ বিশেষে এর মাত্রা কম বেশি, যেমন— ইউরোপ জাতিপুঞ্জকে ৮% হ্রাস করতে হবে, আবার USA কে ৭%, অস্ট্রেলিয়া ৮%, আইসল্যান্ড ১০%, রশিয়া ০% এবং জাপানকে ৬% হ্রাস করতে হবে। ২০১২ সালে এই চুক্তিকে পরবর্ধিত করে পেশ করা হয়, যা দোহা সংশোধনী নামে পরিচিত এই সংশোধনী অনুসারে শুধুমাত্র ২০২০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইউরোপীয় দেশগুলিকে নিঃসরণের পরিমাণ কমিয়ে আনার প্রস্তাব দেওয়া হয়। দূষণ সৃষ্টিকারীর রাষ্ট্রগুলিকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করার জন্য কিয়োটো পরবর্তী একটি আইন কাঠামো তৈরির চেষ্টা চলছে, যা ২০১৫ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে প্যারিস শহরে পেশ করা হয়। তবে কানাডা ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এই চুক্তি স্বাক্ষর না করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

## ৬.৮ জল সংরক্ষণ (Water Conservation)

পৃথিবীর মোট ৭১ ভাগ জল এবং ২৫ ভাগ স্থল হলেও বেশির ভাগটাই লবণাক্ত অব্যবহার্য জল। মাত্র ৩% জল স্থলভাগে সঞ্চিত তার মাত্র ০.৩% জলাশয় পুকুর ইত্যাদিতে সঞ্চিত এবং প্রায় ৩০% জল ভৌমস্তরে সঞ্চিত। বর্তমানে উন্নত বিলাসবহুল জীবনযাপনের জন্যে এবং অত্যাধিক জনসংখ্যার বৃদ্ধি, ব্যবহার্য স্বাদু জলের ঘাটতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভৌমজল স্তর থেকে জল সংগ্রহ করার জন্যে গভীর থেকে গভীরতর টিউবওয়েল খোঁড়া হচ্ছে। বর্তমানে বহু শহর জল সংকটের শিকার হয়েছে।

ভূমিভাগের জল সম্পদের সংরক্ষণের দ্বারা এই সংকটের মোকাবিলা করা সম্ভব। জল সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলি হল—

- নদীগুলি পরস্পর নালা দ্বারা সংযুক্ত করতে হবে, এর ফলে মধ্যবর্তী অঞ্চলগুলি যেমন জলসেচ ব্যবস্থার সুবিধা পাবে অপর পক্ষে বন্যার সময় অতিরিক্ত জল অপেক্ষাকৃত শুষ্ক অঞ্চলের দিকে পাঠিয়ে বন্যা নিয়ন্ত্রিত হবে এবং জলসঞ্চয়ও হবে।
- পার্বত্য অঞ্চলের নালাগুলি বা পাহাড়ের ঢাল বরাবর চেক ড্যাম প্রস্তুত করতে হবে যাতে বৃষ্টির জল সরাসরি না বয়ে গিয়ে মাটির অভ্যন্তরীণ প্রবাহ বৃদ্ধি পায়। এই ব্যবস্থা সমতলের নদীগুলিতেও করা যেতে পারে।
- জলাভূমি অর্থাৎ 'প্রকৃতির বৃক্ক' যা আজ নগরায়নের তাগিদে বিনষ্ট হয়ে চলেছে। কিন্তু এই জলাভূমি নানাভাবে প্রকৃতিকে সাহায্য করে থাকে। যেমন— শহরের অপরিস্রুত জলকে পরিস্রুত করে, মাটির নিচের ভৌম জলস্তর বৃদ্ধি করে এবং জলাভূমি প্রচুর পরিমাণে বিশুদ্ধ অক্সিজেন সরবরাহ করে থাকে। তাই জলাভূমি সংরক্ষণ করা গুরুত্বপূর্ণ।
- ভূপৃষ্ঠের ওপর প্রবাহমান বৃষ্টির জল ধরে রেখে তা কৃষিকাজ ও অন্যান্য কাজে লাগানোর একমাত্র সহজ উপায় নদীর উপর বাঁধ নির্মাণ যদিও বা এই বাঁধ নির্মাণের অনেক খারাপ দিকও আছে যেমন— বাঁধগুলি

প্রথমে জল সংরক্ষণ করে বন্যা নিয়ন্ত্রণ করে কিন্তু পরে তা মজে গিয়ে বন্যার প্রকোপ আরও বাড়িয়ে দেয়। নদী অববাহিকার বাস্তুতন্ত্র বিনষ্ট করে।

- শুষ্ক নিরক্ষীয় অঞ্চলে সারা বছর বৃষ্টি হয় না তাই জলের চাহিদা মেটানোর জন্যে পুকুর এবং বৃহৎ জলাশয় খনন করা হয়ে থাকে।

মূলত ভৌম জলস্তর ব্যবহার না করে বৃষ্টির জল ধরে রেখে তা ব্যবহার কাজে লাগানোই জল সংকট দূর করার একমাত্র উপায়। তাই সরকার নানা প্রকল্পের মাধ্যমে পুকুর খনন করাচ্ছে।

### ৬.৮.১ **বৃষ্টির জল সংরক্ষণ (Rain water harvesting) :**

ভূভাগে যে স্বল্প পরিমাণ বৃষ্টিপাত হয় তার প্রায় ৭১% জল নদী-নালার মাধ্যমে পুকুরে পতিত হয়, কিন্তু বর্তমান অবস্থাতে বৃষ্টির প্রতিটি জলবিন্দুকে সংগ্রহ করে কাজে লাগাতে না পারলে জল সংকট হ্রাস করা সম্ভবপর নয়। প্রাচীনকালে জলাশয় পুকুর, ডোবা ইত্যাদি খনন করে বৃষ্টির জল ধরে রাখা হত এবং প্রয়োজনে তা ব্যবহার করা হত। তবে বর্তমানে উন্নত প্রযুক্তির দ্বারা জল সংরক্ষণ করা হচ্ছে, যেমন— পাহাড়ি ও শুষ্ক অঞ্চলে বাড়ির ছাদে বৃষ্টির জলসংগ্রহ করে বাড়ির নিচে ট্যাংক বানিয়ে তাতে সঞ্চয় করে রাখা হয়। এবং বর্ষার শেষে ওই জল বাড়ির কাজে ও চাষবাসে ব্যবহার করা হয়। এছাড়া বাড়ির ছাদে বৃষ্টির জল পরিশোধন করে টিউবওয়েলের মাধ্যমে মাটির নিচে পাঠিয়ে ভৌম জলস্তরের বৃদ্ধি ঘটানো হয় যা ভবিষ্যতে কাজে লাগে।

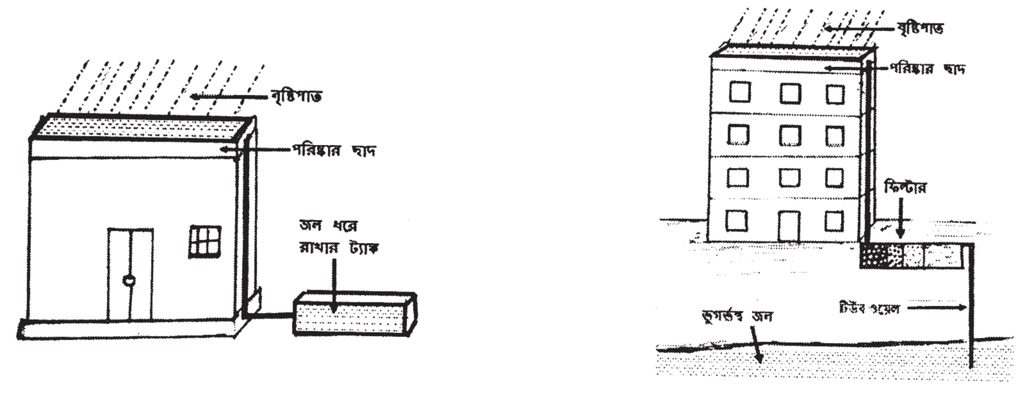


চিত্র : বৃষ্টির জল সংগ্রহ

## ৬.৯ ভারতে পরিবেশ আন্দোলন (Environmental Movements of India)

পরিবেশ সম্পর্কিত সমস্যাগুলি অসংখ্য এবং প্রকৃতিকে বাঁচানোর জন্যে বিভিন্ন ধরনের আন্দোলন সারা পৃথিবী জুড়েই বিভিন্ন সময়ে হয়েছে। জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে আঞ্চলিকভাবে পরিস্থিতি অনুযায়ী এবং সীমিত ক্ষেত্রে পরিবেশ আন্দোলন গড়ে উঠেছে। তাদের মধ্যে অন্যতম হল—

(১) **অরণ্যাঞ্চল ভিত্তিক আন্দোলন :** এই ধরনের আন্দোলনের বিষয় হল অরণ্য নীতি, বনসম্পদের ব্যবহার ইত্যাদি। যেমন— চিপকো, অ্যাপিকো আন্দোলন।

### ৬.৯.১ চিপকো আন্দোলন

1972 সালের ডিসেম্বর মাসে উত্তরপ্রদেশে তেহরী গাড়োয়াল অঞ্চলে এই আন্দোলনের সূচনা হয়। 'চিপকো' কথাটির অর্থ 'আলিঙ্গন'। বিত্তবান ঠিকাদার এবং শিল্পপতিদের নির্বিচারে বনভূমি ধ্বংস এবং বনসম্পদ লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে এই আন্দোলন সংগঠিত হয়। রাতের অন্ধকারে ঠিকাদারের লোকেরা গাছ কাটতে এলে আদিবাসী মেয়েরা প্রতিটি বৃক্ষকে সন্তানের মতো জড়িয়ে থাকেন। রাতের পর রাত জেগে গাছ পাহারা দিয়েছেন এই মহিলারা। আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সরলা বেন, মীরা বেন, সুন্দরলাল বহুগুণা, চন্দ্রিকাপ্রসাদ ভাট ইত্যাদি পরিবেশবাদীরা। বহুগুণার নেতৃত্বে শ্রীনগর থেকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত 300 কিমি পদযাত্রা করা হয়। তিনি পরবর্তীকালে অনশনেও বসেন। এগারো দিনের মাথায় বহুগুণাকে গ্রেপ্তার করা হয়। খবর পেয়েই হাজার হাজার মানুষ ছুটে আসে এবং তার চাপে পুলিশবাহিনী পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হয়। এই আন্দোলনের তীব্রতা কেন্দ্রীয় প্রশাসনের নজরও কেড়েছিল।

ভারতের অন্যান্য প্রান্তের বিভিন্ন অধিবাসীরা এই আন্দোলনে অনুপ্রাণিত হয়। বৃক্ষছেদনের বিরুদ্ধে সাঁওতাল পরগণা, ছত্তিশগড়, থানে এবং আরাবল্লী অঞ্চলেও আন্দোলন শুরু হয়। কর্নাটকে এই আন্দোলন নতুন মাত্রা পেয়ে 1983 সালে অ্যাপ্পিকো (Appiko) নামক আন্দোলনে পরিণত হয়। বহু মানুষ পদযাত্রা করে কেলসী (Kelase) অরণ্যে গাছকে জড়িয়ে ধরে ঠিকাদারের কুঠারাঘাত থেকে তাদের রক্ষা করে। এতে ঠিকাদাররা ভীত হয়ে পড়ে এবং চতুর্দিক থেকে এই আন্দোলন সমর্থনও পায়।

চিপকো আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মৃত্তিকা ও জল সংরক্ষণের জন্য হিমালয় অঞ্চলের উদ্ভিদ নিধন নিষিদ্ধ করা। কারণ পর্বতে অবস্থিত প্রতিটি উদ্ভিদ হিমবাহ ও ধস না হতে দিয়ে মৃত্তিকা ও সঞ্চিত জলকে রক্ষা করে। বহুগুণার মতে গাছ আমাদেরে জ্বালানি বা আসবাবপত্রের কাঠ জোগান দেবার জন্য জন্মায়নি। মৃত্তিকা, জল সংরক্ষণ এবং মানুষকে তার বাঁচার অক্সিজেন সরবরাহ করার জন্য অরণ্যসম্পদ হল ভগবান প্রদত্ত উপহারস্বরূপ। আর একটি দাবিও এই আন্দোলনের ভিতর থেকে জোরদার হয়ে ওঠে— অরণ্যের মূল প্রজাতি বৈচিত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। পশুখাদ্য সংগ্রহ ও হালকা জ্বালানি সংগ্রহে মায়েদের অধিকার থাকবে। তথাকথিত অশিক্ষিত আদিবাসী মহিলাদের পরিবেশ রক্ষার সচেতনতা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। অরণ্য রক্ষার পাশাপাশি, অরণ্য প্রজাতির স্বাভাবিক বিকাশ ও সংরক্ষণও তাদের আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল।

(২) **বৃহৎ জলাধার ভিত্তিক আন্দোলন (Big dam movements) :** জলাধার নির্মাণ, বাস্তুচ্যুত জনগণের পুনর্বাসন, বাস্তুতন্ত্র ও বনাঞ্চল ধ্বংসের বিরুদ্ধে এই আন্দোলন সংগঠিত হয়। যেমন— নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন, সাইল্যানটভ্যালী আন্দোলন, তেহরি বাঁধ বিরোধী আন্দোলন ইত্যাদি।

### ৬.৯.২ নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন

পশ্চিম ভারতের প্রধান নদী হল নর্মদা। দৈর্ঘ্য প্রায় 1450 কিমি। মধ্যপ্রদেশের অমরকণ্টক থেকে পশ্চিমবাহিনী হয়ে দীর্ঘপথ পেরিয়ে আরব সাগরে গিয়ে পড়েছে। নর্মদার উপত্যকায় ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনতম অধিবাসী ভিল, গণ্ডদের হাজার বছরের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। এই নদীর স্রোতপথে ও তার উপনদীতে 30টি বড়ো বাঁধ, 135টি মাঝারি বাঁধ ও 3000টি ছোট বাঁধ তৈরির উদ্দেশ্যে 1985 সালে বিশ্বব্যাংক 45 কোটি ডলার ঋণ মঞ্জুর করে এবং 1988 সালে পূর্ণমাত্রায় কাজ শুরু হয়। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল বন্যা প্রতিরোধ, নিকটবর্তী তিনটি রাজ্যে প্রায় 50 লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচ ব্যবস্থা করা ও জলসম্পদ থেকে 2700 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা। প্রকল্পের সবচেয়ে বড়ো দুটি বাঁধের একটি গুজরাটে অবস্থিত 'সর্দার সরোবর' এবং অন্যটি মধ্যপ্রদেশের 'নর্মদা সাগর' বাঁধ।

এই প্রকল্পের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছেন বিখ্যাত পরিবেশবিদ মেধা পাটেকর এবং বাবা আমতের নেতৃত্বে হাজার হাজার আন্দোলনকারী। তাদের মতে প্রকল্পের পরিকল্পনার সঙ্গে বাস্তবতার অনেক অসঙ্গতি আছে। বাঁধ তৈরির ফলে সাড়ে তিন লক্ষ হেক্টর বনভূমি জলমগ্ন হবে এবং 56 হাজার হেক্টর উর্বর কৃষিজমি ধ্বংস হবে। একদিকের বন্যা প্রতিরোধ হলে অন্যদিকে বন্যা দেখা দেবে। মেধা পাটেকরের মতে, প্রকল্পটিতে 50 মেগাওয়াটের বেশি জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন করা সম্ভব না। প্রকল্পটি রূপায়িত হলে এক মিলিয়ন মানুষ গৃহহীন হবে যাদের বেশিরভাগই গরীব এবং আদিবাসী শ্রেণির। সমৃদ্ধ অরণ্যবৈচিত্র্য লুপ্ত হবে। প্রায় 25টি প্রজাতির পাখির বাসস্থান ধ্বংস হয়ে বিলুপ্ত হবার আশঙ্কা আছে। তা ছাড়া প্রাথমিক ব্যয় 25 হাজার কোটি টাকা ধরা হলেও দিন দিন সেই পরিমাণ এত দ্রুত হারে বাড়ছে যে সবদিক বিবেচনা করলে প্রকল্পটির রূপায়নে লাভের তুলনায় ক্ষতির পরিমাণ অনেক বেশি।

1987 সালে বাবা আমতে এই প্রকল্পের সব কথা সাধারণ মানুষের জানাবার দাবি তোলেন। বাস্তবে তা মানা হয়নি। 1989 সালের ফেব্রুয়ারি মাসে গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্রের যে গ্রামগুলি ডুবে যাবার আশঙ্কা তাদের প্রায় দশ হাজার মানুষ জমা হয়েছিলেন প্রকল্পটি রূপায়ণের প্রতিবাদ জানাতে এবং সেই অহিংস মিছিলকে পুলিশ আক্রমণ করে। নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন বর্তমানে এক বিশেষ দিকে মোড় নিয়ে আন্তর্জাতিক দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছে। 2000 সালের 18 অক্টোবর ভারতের সুপ্রিম কোর্টে তিন সদস্যের বেঞ্চের রায়ে বাঁধ তৈরির পক্ষেই মতামত প্রদর্শন করা হয়েছে। বাঁধ তৈরির জেরে যে হাজার হাজার মানুষের কয়েক প্রজন্মের বাসস্থান ও কর্মস্থল এবং তাকে ঘিরে গড়ে ওঠা সংস্কৃতি নিমজ্জমান হবে, তাদের পুনর্বাসনের প্রশ্নটিকেও উপেক্ষা করা হয়েছে। সর্বশেষ রায়ে সুপ্রিমকোর্ট বাঁধের উচ্চতা বৃদ্ধির প্রস্তাব মেনে নিয়ে কয়েকটি শর্তসাপেক্ষে প্রকল্পের কাজ চালিয়ে যাবার নির্দেশ দেওয়ায় আবার নতুন করে বিক্ষোভ তীব্রতর আকার ধারণ করেছে। দেশের বিশিষ্ট চিন্তাবিদ, বুদ্ধিজীবীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই আন্দোলনে সামিল হচ্ছেন।

### ৬.৯.৩ তেহরী বাঁধ বিরোধী আন্দোলন

উত্তরপ্রদেশের উত্তর-পশ্চিম হিমালয়ের পাদদেশে ভাগীরথী ও ভিলগঙ্গা নদীদ্বয়ের সংযোগস্থলে 260.5 মি. উচ্চ তেহরী বাঁধ নির্মাণ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয় সোভিয়েত আর্থিক সহযোগিতায়। এর ফলে 270000 হেক্টর জমিতে নতুন করে সেচের ব্যবস্থা হবে, 640000 হেক্টর জমির বর্তমান সেচব্যবস্থাকে উন্নত করবে এবং 1000 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে।

1977 সালে এই বাঁধের কাজ শুরু হলে প্রকল্পটির বিরোধিতায় ‘তেহরী বাঁধ বিরোধী সংগ্রাম সমিতি’ গঠিত হয়। তাদের মতে এই বাঁধ নির্মাণের সুফল অতিরঞ্জিত করে দেখানো হচ্ছে। প্রকল্পটির ফলে 85000 মানুষ গৃহহীন হবে এবং তেহরী শহর ও পার্শ্ববর্তী 100টি গ্রাম জলমগ্ন হবে। জলাধারের বিপুল পরিমাণ জলের চাপে প্রবল ভূমিকম্প হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাছাড়া হরিদ্বার, হৃষীকেশ, দেবপ্রয়াগ প্রভৃতি ধর্মীয় শহর ধ্বংস হবে এবং বিস্তীর্ণ উর্বর কৃষিজমি জলে নিমজ্জিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েচে। সুন্দরলাল বহুগুণা এই বাঁধের বিরোধিতায় বেশ কয়েকবার অনশন করেন।

### ৬.৯.৪ সাইলেন্ট ভ্যালি আন্দোলন

এই আন্দোলন ভারতের অন্যতম পরিবেশ আন্দোলন। উত্তর কেরালার পালাঘাট জেলার পাহাড়ি অঞ্চল বর্ষণারণ্য আচ্ছাদিত ‘সাইলেন্ট ভ্যালি’। দুদিকে কেরালার দুই শহর কোজিকোড় এবং পালঘাট নিয়ে এই উপত্যকার চেহারা অনেকটা ত্রিভুজের মতো। এমন গভীর জঙ্গলে ঝিঁঝি পোকার ডাক পর্যন্ত শোনা যায় না। তাই এর নাম ‘সাইলেন্ট ভ্যালি’ বা ‘নীরব উপত্যকা’। এই উপত্যকার মাঝখান দিয়ে উত্তর-দক্ষিণে বয়ে চলেছে কুন্তী নদী, এই

নদীতে 1973 সালে ভারতীয় পরিকল্পনা কমিশন একটি বাঁধ দেওয়ার প্রকল্প ঘোষণা করে। শুরুতে 120 মেগাওয়াট ও পরে 240 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের সিদ্ধান্ত হয়। বহু পরিবেশবিদ আপত্তি জানান এই প্রকল্প রূপায়ণে। WWF, India-র একটি টাস্ক ফোর্সের সমীক্ষায় বলা হয়, প্রকল্পটি রূপায়িত হলে 'the richest expression of life that has evolved on this planet' ধ্বংস হয়ে যাবে, এছাড়া কেরালার বৃহত্তম জনবিজ্ঞান সংগঠন কেরালা শাস্ত্র সাহিত্য পরিষদ (KSSP) গণসাক্ষর সংগ্রহ অভিযান শুরু করে। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে এর বিরোধিতা প্রবল হয়ে ওঠায় 1980 সালের ডিসেম্বর মাসে কেরালা সরকার এই পরিকল্পনা পরিত্যক্ত বলে ঘোষণা করে, এবং 'সাইলেন্ট ভ্যালিকে' 'জাতীয় উদ্যান' হিসাবে ঘোষণা করা হয়।

## ৬.১০ পরিবেশ রক্ষায় সাংবিধানিক ব্যবস্থা সমূহ (Constitutional Provision for Protecting Environment)

ভারতে পরিবেশ সংক্রান্ত আইন কোন নতুন ঘটনা নয়। ১৮৬৫ সালে ভারত প্রথম অরণ্য আইন প্রচলিত হয় এবং পরে আরো বিভিন্ন ধরনের আইন প্রচলিত ও সংশোধিত হয়। ১৯৭২ সালে মানব পরিবেশের উপর রাষ্ট্রসংঘের ঘোষণাপত্র গৃহীত হয়। স্বাক্ষরকারী দেশ হিসাবে ভারত ১৯৭৬ সালে পরিবেশের উপর গুরুত্ব আরোপ করে ভারতীয় সংবিধানে ২টি অনুচ্ছেদ সংযোজিত করে যা অনুচ্ছেদ 48A এবং 51A(g) নামে পরিচিত। 48A অনুচ্ছেদ অনুসারে, দেশের পরিবেশ রক্ষা ও উন্নতি বিধানে এবং বন্য ও বন্যপ্রাণী রক্ষায় রাজ্যের প্রয়াস থাকবে। রাজ্য বলতে বোঝায় ভারত সরকার, ভারত সরকারাধীন দপ্তর, স্থানীয় ও অন্যান্য প্রাধিকারিক।

"The State shall endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country".

51A(g) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী দেশের প্রত্যেক নাগরিকের মৌলিক কর্তব্য জল, বন, হ্রদ ও বন্যপ্রাণী সমেত প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষা করা ও তার উন্নতি সাধন করা এবং সকল জীবিত প্রাণীর প্রতি সদয় হওয়া। এই মৌলিক কর্তব্য পালনের জন্য পরিবেশ সম্পর্কিত সম্যক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন তাই সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশে সারা দেশে প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষায় পরিবেশ সংক্রান্ত শিক্ষাদান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

"It shall be duty of every citizen of India to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wildlife and to have compassion for living creatures."

ভারতে পরিবেশ সংক্রান্ত বিশেষ আইনগুলি হল—

**(১) ১৯৮৬ সালের পরিবেশ (সুরক্ষা) আইন (The Forest Protection Act, 1986)**

ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনার পর সাংবিধানিক উপযোগিতার নিরিখে ১৯৮৬ সালে ১৯ নভেম্বর এই আইনটি কার্যকর করা হয়। পরিবেশ রক্ষা, পরিবেশের উন্নতি ও পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ করাই এই আইনটির মুখ্য উদ্দেশ্যে।

এই আইন অনুযায়ী সমস্ত সাধারণ ক্ষমতা কেন্দ্র সরকারের হাতে দেওয়া হয়েছে।

- কেন্দ্র সরকার পরিবেশের সুরক্ষা এবং উন্নতির তাগিদে সমস্ত পদক্ষেপ নিতে সক্ষম।
- জল, বাতাস, মাটির গুণগত মান নির্ণয় এবং দূষণের মাত্রা নির্ধারণ করা হবে।
- শিল্প সংস্থাগুলিকে দূষণ সংক্রান্ত বিধি মেনে চলতে হবে। ১৯৯৩ সালের পর তাদের পরিবেশ নিরীক্ষা করাতে হবে এবং সেই তথ্য রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রক দপ্তরের কাছে পেশ করতে হবে।

- ক্ষতিকারক পদার্থের প্রস্তাবিত নিয়ম বা বিধিসম্মত ভাবে নাড়াচাড়া না করার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি।
- দূষণ সংক্রান্ত নির্দেশ অমান্য করলে, এই আইন অনুযায়ী ব্যক্তির ৭ বছরের জেল বা ১ লক্ষ টাকা জরিমানা হতে পারে।

(২) **১৯৮১ সালে বায়ুদূষণ (প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ) আইন [The Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981]**

১৯৮১ সালে ২৯শে মার্চ, সরকার এই বায়ুদূষণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ আইনটি প্রণয়িত করে। মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল বায়ুদূষণ প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও উপশম করা হয়। এই আইন অনুযায়ী বাতাসে উপস্থিত কোন কঠিন, তরল বা গ্যাসীয় পদার্থ এবং তাদের উপস্থিতির মাত্রা যা মানুষ সহ অন্যান্য জীব, সম্পদের এবং পরিবেশের ক্ষতিসাধন করে তাদের বায়ুদূষণ বলে।

- এই আইনটির প্রণোদনের জন্য কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ (CPCB) এবং রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ (SPCB) গঠন এবং তাদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব নির্ধারণ করা হয়।
- নির্ধারিত মাত্রার ওপর সীসা, সালফার ডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড, VOC, Particulate Matter (PM) এবং এবং অন্যান্য দূষিত পদার্থ বাতাসে ছাড়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে।
- আইনের নির্দেশাবলী অমান্য করলে কমপক্ষে ৫ মাসের জেল হেফাজত এবং সর্বোচ্চ ৭ বছর জেল হতে পারে।

(৩) **১৯৭৪ সালের জল দূষণ (প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ) আইন [The Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974]**

শিল্পাঞ্চল, গৃহস্থালি এবং কৃষিকাজ থেকে উৎপন্ন দূষিত জল আমাদের জলসম্পদকে দূষিত করছে। এই দূষণ প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণ করার তাগিদে সরকার ১৯৭৪ সালে এই আইনটির প্রবর্তন করে।

- এই আইন দ্বারা CPCB ও SPCB গঠন এবং তাদের দায়িত্ব কর্তব্য নির্ধারণ করা হয়।
- এই আইন দ্বারা কোনরকম দূষিত বর্জ্য পদার্থ ও তরল কোনরকম স্থায়ী বা প্রবহমান জলে ফেলার ওপর নিষেধাজ্ঞা আনা হয়।
- কারখানাগুলি থেকে কোনরকম তরল বা বর্জ্য পদার্থ জলে ফেলার আগে SPCB-র কাছ থেকে অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে এবং SPCB কারখানাগুলির বৈশিষ্টের ওপর ভিত্তি করে তাদের বর্জ্য পদার্থ উৎপাদনের মাত্রা ঠিক করে দেবে।
- প্রতিটি কেন্দ্রীয় ও রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ দপ্তরে নিজস্ব পরীক্ষাগার থাকতে হবে, যাতে জল সংগ্রহ ও পরীক্ষা করা সম্ভব। উক্ত পরীক্ষার জন্য তার বিনিময়ে সংস্থার কাছ থেকে প্রয়োজনীয় টাকা ধার্য করা হবে।
- কোনরকম নিয়ম লঙ্ঘনের কারণে ৩ মাসের জেল ও ১০,০০০ টাকা জরিমানা হতে পারে এবং তার সাথে তত্ত্বাবধানের জন্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের সমস্ত খরচ দিতে হবে। যদি সংস্থার কোন আধিকারিক অসহযোগিতা দেখায় তাহলে তিনি দায়ী বলে গণ্য হবেন।

**(৪) ১৯৭২ সালের বন্যপ্রাণী (সুরক্ষা) আইন [The Wildlife (Protection) Act, 1972]**

পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্রের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই আইনটি ১৯৭২ সালে একটি জটিল প্রশাসনিক পরিকাঠামোর সহিত তৈরি করা হয়।

এই আইন অনুযায়ী

**প্রাণী :** প্রাণীর অন্তর্ভুক্ত, উভয়চর, পাখি, স্তন্যপায়ী প্রাণী, সরিসৃপ ও তাদের বাচ্চা এবং পাখি ও সরিসৃপের ক্ষেত্রে তাদের ডিম।

**বন্যপ্রাণ :** বন্যপ্রাণের অন্তর্ভুক্ত যে কোন প্রাণী, জলচর অথবা কোন নির্দিষ্ট স্থানের উদ্ভিদকুল।

**আবদ্ধ প্রাণী :** I, II, III, IV তপশীলে বর্ণিত প্রাণী যাদেরকে আবদ্ধ অবস্থায় রাখা হয়েছে প্রজনন বা অন্য কোন কারণে।

**শিকার :** এই আইন অনুযায়ী শিকার বলতে বোঝায়।

- কোন বন্য বা আবদ্ধ প্রাণীকে ধরা, ছোটান, ফাঁদে আটকানো, বিষ দেওয়া বা এই সংক্রান্ত প্রচেষ্টা করা।
- উল্লেখিত প্রাণীদের আহত, বিনাশ, শরীরের কোন অংশ সংগ্রহ করা অথবা সরিসৃপ বা বন্য পাখিদের বাসা ও ডিম নষ্ট করা।

**শিকারের বিধি নিষেধ :**

I, II, III, IV তপশীলে বর্ণিত প্রাণীকে শিকার করা যাবে না অবশ্য Chief Wildlife Warden সন্তুষ্ট হলে বিশেষ কারণে শিকারের অনুমতি দান করতে পারেন সেগুলি হল—

- বন্যপ্রাণী মানুষের জন্য ক্ষতিকর প্রমাণিত হলে ও ফসল নষ্ট করলে।
- কোন প্রাণী দূরারোগ্য রোগের শিকার হলে তাকে শিকারের অনুমতি দিতে পারেন।
- শিক্ষা, বৈজ্ঞানিক গবেষণা, জীবনদায়ী ঔষদ তৈরি ইত্যাদি কাজে শিকারের অনুমতি দান করেন।

এই আইনে অভয়ারণ্য ও জাতীয় উদ্যানের গঠন ও বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা হয়। অনুমতি ছাড়া বন্যপ্রাণী এবং বনজ সম্পদ পরিবহন করা নিষিদ্ধ করা হয়। অন্যথায় জেল হেফাজত ও জরিমানা করা হতে পারে।

**(৫) ১৯৮০ সালের বন সংরক্ষণ আইন [The Forest Conservation Act, 1980]**

ভারতে বনদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে, তারপর বিভিন্ন আইন তৈরি হয়, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ১৯২৭ সালের ভারতীয় অরণ্য আইন। এই আইন পূর্বে তৈরি হওয়া সকল বন সম্পর্কিত আইনকে একত্রিত করে। এই আইন সরকার ও বনদপ্তরকে নতুন সংরক্ষিত বন তৈরির এবং তার সুরক্ষার সমস্ত ক্ষমতা আরোপ করে এবং ওই বনের ওপর সরকারের একমাত্র অধিকার স্থাপিত করা হয়। এছাড়া বনকে সংরক্ষিত বন, সুরক্ষিত বন ও আঞ্চলিক বা গ্রামের বনে ভাগ করে।

এই আইন প্রচলিত ছিল ১৯৮০ সাল পর্যন্ত যতক্ষণ না শুধুমাত্র কাঠের সংরক্ষণ না করে বন থেকে প্রাপ্ত অন্যান্য সেবা যেমন— জীববৈচিত্র্যের সংরক্ষণ এর ওপর গুরুত্ব আসে। এরপর নতুন আইন প্রয়োজন ছিল বনের সার্বিক সুরক্ষার তাগিদে তাই ১৯৮০ সালে বন সংরক্ষণ আইন প্রচলন হয়।

বনাঞ্চল ধ্বংস বন্ধ করার জন্য বিশেষ ভাবে এই আইনটি প্রচলন করা হয়। এই আইন অনুযায়ী—

- কেন্দ্র সরকারের অনুমতি ছাড়া কোন বনাঞ্চলকে সংরক্ষণের আওতার বাইরে নিয়ে যাওয়া যাবে না।
- সংরক্ষিত বনাঞ্চলের মধ্যে কোনরকম আগুন লাগানো, পশুচারণ, গাছ কাটা ও বনজ সম্পদ সংগ্রহ করা যাবে না। করলে শাস্তি হিসেবে ৬ মাসের জেল হতে পারে।
- রাজ্য সরকার কেন্দ্র সরকারের অনুমতি ছাড়া উদ্যান পালন, ঔষধি গাছের চাষ ইত্যাদির জন্য বনে জমি দিতে পারবে না।

(৬) **২০০২ সালের জীববৈচিত্র আইন [The Biological Diversity Act, 2002]**

১৯৯২ সালে জাতিসংঘ দ্বারা জৈব বিচিত্র্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় যার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল জীব বৈচিত্র্যের সংরক্ষণ করা এবং আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদের ধারণযোগ্য (Sustainable use) ব্যবহার।

ভারতও এই সম্মেলনে স্বাক্ষরকারী দেশের মধ্যে একটি এবং এই বাধ্য বাধকতা পূরণ করার জন্য ২০০২ সালে ভারত সরকার আইনটি চালু করে, এর প্রধান ও একমাত্র লক্ষ্য ছিল ভারতের জীব বৈচিত্র্যের সংরক্ষণ।

**জীব বৈচিত্র্য :** জীবের উৎস এবং যে বাস্তুতন্ত্রের অংশ তার বিভিন্নতা এবং ২টি প্রজাতির মধ্যে বা একই প্রজাতির মধ্যে অথবা বাস্তুতন্ত্রের মধ্যে যে বিভিন্নতা দেখা যায় তাকে বোঝায়।

**জৈবিক সম্পদ :** প্রাণী, উদ্ভিদ, অণুজীব অথবা তাদের অবশিষ্ট অংশ, তাদের জীনগত পদার্থ বা বাইপ্রোডাক্ট যার ব্যবহার্য মূল্য আছে তাকে বোঝায়, কিন্তু মানব জিনগত পদার্থ এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয়।

**ধারণযোগ্য ব্যবহার :** জীববৈচিত্র্য এবং প্রাকৃতিক সম্পদকে এমনভাবে ব্যবহার করা যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ব্যবহার এবং তাদের চাহিদা মেটানোর জন্য অবশিষ্ট থাকে।

এই আইন অনুযায়ী MoEFCC-এর তত্ত্বাবধানে ন্যাশানাল বায়োডাইভার্সিটি অথরিটি (NBA) তৈরি করা হয়। এর সদর দপ্তর চেন্নাই, এর কাজ হল—

- এই আইনে বিবৃত আইন সমূহের নিয়ন্ত্রণ।
- জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ দান।
- জৈবিক ঐতিহ্যপূর্ণ স্থান নির্বাচনে সরকারকে পরামর্শ দান

এই আইন অনুযায়ী

- স্থানীয় অধিবাসী, চাষি, হাকিম এবং বৈদ্য যারা জীববৈচিত্র্যকে কাজে লাগিয়ে ঔষুধ তৈরি করে তারা এই আইনের আওতার বাইরে থাকবে।
- স্থানীয় বাসিন্দাদের সংরক্ষণের ওপর একটি অভিমত থাকবে এবং তা গ্রহণযোগ্য।
- জাতীয়, রাজ্য, আঞ্চলিক স্তরে বায়োডাইভার্সিটি ফান্ড তৈরি করা হবে।
- ব্যক্তি বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করলে তার ৫ বছরের কারাবাস বা ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা দিতে হতে পারে।

## ৬.১১ অনুশীলনী

**সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করুন :**

(১) কোনটি গ্রিন হাউস গ্যাস নয়

(i) $CO_2$ (ii) $CH_4$ (iii) $N_2$ (iv) CFC

(২) অম্ল বৃষ্টির জন্য দায়ী গ্যাস কোন্‌টি?

(i) $N_2$ (ii) $CO_2$ (iii) $CO_2$ (iv) $O_2$

(৩) নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনকারী নেতৃত্ব হল—

(i) সর্দার পাটিল (ii) মেধা পাটেকর (iii) মীরাবেন (iv) চন্দ্রিকা প্রসাদ

(৪) CFC-র 'Global warming potential' কত?

(i) 1 (ii) 23 (iii) 12.000 (iv) 270

(৫) UV-C এর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য—

(i) 100-280 nm (ii) 280-310 nm (iii) 100-180 nm (iv) 315-400 nm

**অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :**

(১) কিয়োটো প্রোটোকল কবে স্বাক্ষরিত হয়?

(২) চিপকো আন্দোলন কবে হয় এবং এর মুখ্য নেতা কে ছিলেন?

(৩) 51A (g) কি?

(৪) বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন ১৯৭২ অনুযায়ী 'প্রাণীর' সংজ্ঞা দিন।

(৫) CFC কি?

**সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :**

(১) চেরনোবিল দুর্ঘটনা আলোচনা করুন।

(২) মন্ট্রিয়াল প্রোটোকল কবে স্বাক্ষরিত হয় এবং এর উদ্দেশ্যগুলি আলোচনা করুন।

(৩) জল সংরক্ষণের পদ্ধতিগুলি আলোনা করুন।

(৪) বৃহৎ জলাধার ভিত্তিক আন্দোলন সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

(৫) ওজোন স্তর বিনাশের কারণগুলি আলোচনা করুন।

**উত্তর সংকেত**

**নির্বাচন ভিত্তিক প্রশ্ন :**

(১) (iii) $\sqrt{2}$ (২) (ii) $CO_2$ (৩) (ii) মেধা পাটেকর

(৪) (iiiV 12–000 (৫) (i) 100-280 nm

# একক ৭ ❑ জনসংখ্যা ও পরিবেশ (Human Population and Environment)

গঠন

৭.০ উদ্দেশ্য

৭.১ প্রস্তাবনা

৭.২ জনসংখ্যা (Human population)

৭.২.১ জনসংখ্যা বৈশিষ্ট্য

৭.৩ জনবিস্ফোরণ ও পরিবার কল্যাণ কর্মসূচি (Population explosion and Family welfare programme)

৭.৩.১ জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ

৭.৩.২ জনবিস্ফোরণের প্রভাব

৭.৩.৩ পরিবার কল্যাণ কর্মসূচী (Family Welfare Program)

৭.৪ পরিবেশ ও মানব স্বাস্থ্য (Environment and Human Health)

৭.৪.১ মানব স্বাস্থ্যের ওপর পরিবেশের প্রভাব

৭.৫ সংক্রামক ব্যাধি (Communicable Disease)

৭.৫.১ যক্ষ্মা রোগ (Tuberculosis)

৭.৫.২ ম্যালেরিয়া (Malaria)

৭.৫.৩ ডেঙ্গু (Dengue)

৭.৫.৪ ডাইরিয়া বা পাতলা পায়খানা (Diarrhea Diseases)

৭.৫.৫ এইডস (AIDS)

৭.৬ অসংক্রামক ব্যাধি (Non-Communicable Diseases)

৭.৬.১ হৃদরোগ (Cardiovascular Disease)

৭.৬.২ কর্কট রোগ (Cancer)

৭.৬.৩ মধুমেহ রোগ (Diabetes Mellitus)

৭.৭ অনুশীলনী

৭.৮ সহায়ক গ্রন্থাবলী

## ৭.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানতে পারবেন।

- জনসংখ্যা ও তার বৈশিষ্ট্যসমূহ।
- জনবিস্ফোরণ ও পরিবার কল্যাণে কর্মসূচী।
- পরিবেশ ও মানব স্বাস্থ্য।
- বিভিন্ন প্রকার সংক্রামক ব্যাধির লক্ষণ ও চিকিৎসা।
- বিভিন্ন প্রকার অসংক্রামক ব্যাধির কারণ ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা।

## ৭.১ প্রস্তাবনা

জনসংখ্যা ও পরিবেশ ওতপ্রোতভাবে একে অপরের সাথে সম্পর্ক যুক্ত। মানুষের বেঁচে থাকার জন্য যেমন দূষণমুক্ত সুস্থ পরিবেশ প্রয়োজন, তেমনই পৃথিবী বাসযোগ্য হয়ে উঠেছে মানুষের কর্মকাণ্ড ও নানা প্রয়াসের মাধ্যমে। মানুষ তার বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগিয়ে অট্টালিকা, নগর, বাণিজ্য, চিকিৎসাশাস্ত্র ইত্যাদি তৈরি করেছে। এই সমস্ত কারণেই জনসংখ্যা আজ যে কোন রাষ্ট্রের কাছে সম্পদ (মানব সম্পদ) হিসাবে পরিচিত। আবার অত্যাধিক জনবিস্ফোরণ সীমিত প্রাকৃতিক সম্পদের অত্যাধিক ব্যবহার এবং পরিবেশ দূষণের কারণে পরিণত হতে পারে। জনসংখ্যা ও পরিবেশের আন্তঃসম্পর্ককে অনুধাবন করার লক্ষ্যে, এই অধ্যায়ে জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্য ও বৃদ্ধি। সম্পর্কিত বিভিন্ন ধারণা, প্রক্রিয়া এবং পরিবেশ ও স্বাস্থ্যের ওপর জনসংখ্যাবৃদ্ধির প্রভাব সম্পর্কে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

## ৭.২ জনসংখ্যা (Human population)

জনসংখ্যা বা ‘পপুলেশন’ শব্দটি ল্যাটিন শব্দ ‘পপুলাস্’ (Pupulas) থেকে এসেছে যার অর্থ হল জনগণ। একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলে বসবাসকারী এবং প্রজনন ক্ষমতা সম্পন্ন একই গোষ্ঠী বা প্রজাতির জীবকে জনসংখ্যা বলা হয়। বিজ্ঞানের যে শাখা জনসংখ্যা নিয়ে অধ্যয়ন করে তাকে জনসংখ্যার বাস্তুবিদ্যা (Population Ecology) বলা হয়। জনসংখ্যার আকার, আকৃতি, হ্রাস, বৃদ্ধি ইত্যাদি সবই জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্য।

### ৭.২.১ জনসংখ্যা বৈশিষ্ট্য

**(১) আকার ও ঘনত্ব (Size and Density) :**

জনসংখ্যার আকার বলতে যত সংখ্য প্রাণী অবস্থান করছে তাকে বোঝায়। প্রজাতির জনসংখ্যার আকার জীবের জন্ম, মৃত্যুর উপর নির্ভরশীল।

জনসংখ্যার আকার = যতগুলি প্রাণী বর্তমানে অবস্থান করছে + জন্ম - মৃত্যু।

প্রতি বর্গ কিলোমিটারে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা দ্বারা জনঘনত্ব পরিমাপ করা হয়। জনঘনত্ব পরিমাপ দ্বারা মাথাপিছু কতটা করে প্রাকৃতিক সম্পদ মানুষ ব্যবহার করতে পারবে বা ব্যবহার করছে তা হিসেব করা সম্ভব হয়।

**(২) জন্মহার (Birth Rate) :**

প্রতি এক হাজার মানুষ পিছু বছরে শিশুর জন্মের সংখ্যাকে জন্মহার বা স্থূল জন্মহার বলা হয়।

$$\text{জন্মহার} = \frac{\text{বছরে জীবিত নবজাতকের সংখ্যা}}{\text{মোট বর্তমান জনসংখ্যা}} \times ১০০০$$

উন্নত দেশ এবং উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে জন্মহারের বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। যেমন— ২০১১ সালে উন্নত দেশগুলির জন্মহার ১২ আবার উন্নয়নশীল দেশগুলির ক্ষেত্রে ২২ ছিল।

**(৩) মৃত্যুহার (Death Rate/Mortality) :**

প্রতি এক হাজার মানুষ পিছু বছরে মৃত লোকের সংখ্যাকে ওই বছরের মৃত্যুহার বলা হয়।

$$\text{মৃত্যুহার} = \frac{\text{বছরে মৃত লোকের সংখ্যা}}{\text{মোট বর্তমান জনসংখ্যা}} \times ১০০০$$

উন্নত দেশে মৃত্যু হার উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশের তুলনায় কম এবং শুধুমাত্র বৃদ্ধদের মৃত্যুর পরিমাণ বেশি। উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশগুলির ক্ষেত্রে যুবক ও কিশোরদের মৃত্যুর পরিমাণ বেশি।

**(৪) বয়স বিন্যাস (Age Distribution) :**

জনসংখ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল জনগোষ্ঠীর মধ্যে বয়স বিন্যাস। কোন গোষ্ঠীর মধ্যে অবস্থানকারী বিভিন্ন বয়সের জনগণের হারকে বোঝায়। পূর্ব প্রজন্মক্ষম বয়স (০-১৮ বছর), প্রজন্মক্ষম বয়স (১৮-৫০ বছর), প্রাক প্রজন্মক্ষম বয়স (৫০-৮০ বছর) এই তিনটি ভাগে বয়স বিন্যাসকে ভাগ করা হয়। বয়স বিন্যাসের ওপর কোন জাতিগোষ্ঠীর জন্মহার ও মৃত্যুহার নির্ভর করে।

**(৫) জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (Rate of Polulation Growth) :**

দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি বা হ্রাসের পরিমাপ করার ক্ষেত্রে একটি কার্যকরী ধারণা হল 'জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার'। রাষ্ট্রের মধ্যে জন্মহার ও মৃত্যুহারের মধ্যে পার্থক্যকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বলা হয়ে থাকে।

$$\text{জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার} = \frac{\text{বছরে জীবিত নবজাতকের সংখ্যা}}{\text{মোট বর্তমান জনসংখ্যা}} \times ১০০০$$

**(৬) লিঙ্গ অনুপাত (Sex Ratio) :**

প্রতি হাজার জন পুরুষের নিরিখে নারীর সংখ্যাকে লিঙ্গ অনুপাত বলা হয়। কোন সম্প্রদায়ের লিঙ্গের অনুপাত ওই সমাজের সামাজিক উন্নয়নের একটি সূচক যা লিঙ্গ বৈষম্য রোধ করে। ভারত একটি পুরুষতান্ত্রিক সমাজ হওয়ায় পুরুষ শিশুর কাম্যতা অধিক তাই আজ ভারতে ১০০০ জন পুরুষের নিরিখে ৯৪০ জন মহিলা উপস্থিত।

**(৭) জনবিস্ফোরণ (Polulation Explosion) :**

জনবিস্ফোরণ বলতে বোঝায় জনসংখ্যার অতিবৃদ্ধি। কোন রাষ্ট্রের মৃত্যুহারের তুলনায় দ্রুত জন্মহার হলে জনবিস্ফোরণ ঘটে থাকে। জনবিস্ফোরণ ঘটলে প্রাকৃতিক সম্পদের দ্রুত হ্রাস, দারিদ্র্য, বেকারত্ব, রোগব্যাধির শিকার ইত্যাদি দেখা যায়। জনবিস্ফোরণের শিকার আমাদের দেশ ভারত ও চিন যা আজ এত উন্নয়নের পরও উন্নয়নশীল দেশের তকমা ঘোচাতে অক্ষম। জনবিস্ফোরণ তাই সমস্ত দেশের অনগ্রসরতার প্রধান কারণ।

**(৮) ধারণ ক্ষমতা (Carrying Capacity) :**

জনবিস্ফোরণ এবং প্রাকৃতিক সম্পদের অতিরিক্ত ব্যবহারের প্রসঙ্গে পৃথিবীর ধারণ ক্ষমতার বিষয়টি আজ অতিব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলের প্রাপ্ত সম্পদ যে সংখ্যক মানুষের চাহিদা মেটাতে পারে তাকে তার ধারণ ক্ষমতা বলা হয়। ধারণ ক্ষমতা অতিক্রম করার পর পর্যাপ্ত উপাদান না পাবার জন্য উক্ত প্রজাতির জনসংখ্যা হ্রাস পায়।

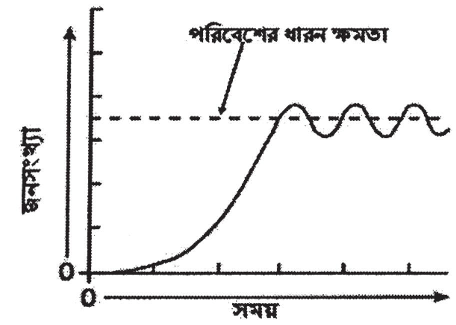


চিত্র : ৭.১ ধারণ ক্ষমতা (Carrying Capacity)

## ৭.৩ জনবিস্ফোরণ ও পরিবার কল্যাণ কর্মসূচি (Population explosion and Family welfare programme)

ভারত আজ বিশ্বে দ্বিতীয় বৃহত্তম জনবহুল দেশ, বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ১৩% মানুষ ভারতে বসবাস করে। বর্তমানে চীন প্রথম স্থান অধিকার করে থাকলেও, সমীক্ষা দ্বারা একটি অনুমান করা যায় যে ২০২৮ সালে ভারত চীনের জনসংখ্যাকে ছাপিয়ে যাবে। তার একমাত্র কারণ চীন বিগত দুই দশক ধরে তার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকে অনেক কমিয়ে এনেছে, ভারত যা পারেনি উপরন্তু ২০১১ সালের সমীক্ষার পর দেখা যায় দুই দশকে ১৯৯০ থেকে ২০১১ সালের মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে চার গুণ।

**সারণি ৭.১ :** ভারতে জনসংখ্যার বৃদ্ধি (উৎস : ভারতীয় জনগণনা)

| জনগণনার বছর | জনসংখ্যা (কোটিতে) | জনগণনার দশকে বৃদ্ধি (কোটিতে) | জনসংখ্যার বৃদ্ধির শতাংশ |
|---|---|---|---|
| ১৯০১ | ২৩.৮৩ | — | — |
| ১৯১১ | ২৫.২০ | ১.৩৭ | ৫.৩৫ |
| ১৯২১ | ২৫.১৩ | ০.০৭ | ০.৩২ |
| ১৯৩১ | ২৭.৮৯ | ২.৭৬ | ১১.০০ |
| ১৯৪১ | ৩১.৮৬ | ৩.৭৯ | ১৪.২২ |
| ১৯৫১ | ৩৬.১০ | ৪.২৪ | ১৩.৩০ |
| ১৯৬১ | ৪৩.৯২ | ৭.৮২ | ২১.৫০ |
| ১৯৭১ | ৫৪.৮১ | ১০.৮৯ | ২৪.৮০ |
| ১৯৮১ | ৬৮.৫৯ | ১৩.৭৮ | ২৪.৭০ |
| ১৯৯১ | ৮৪.৬৩ | ১৬.০৪ | ২৩.৮০ |
| ২০০১ | ১০২.৮৭ | ১৮.২৪ | ২১.৩০ |
| ২০১১ | ১২১.০১ | ১৮.১৪ | ১৭.৬৪ |

সারণিতে (৭.১) দেখা যায় ১৯৭১ থেকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির শতাংশ হ্রাস পেলেও জনগণনা দশকে বৃদ্ধির পরিমাণ বেড়েই চলেছে। তার কারণ হল, ভারতের আয়ু কাঠামোর দিকে তাকালে দেখা যায় ২০১১ সালে ৩৩ শতাংশ মানুষের বয়স ১৫ বছর বা তার কম। সুতরাং বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে আগামী দিনে তারা জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে অংশগ্রহণ করবে। ফলে স্থিতিশীল অবস্থায় পৌঁছতে আরও ৩৫ বছর অপেক্ষা করতে হবে এবং ভারতের জনসংখ্যা ২০৫০ সাল নাগাদ ১৭৫ কোটিতে পৌঁছবে। এই বিপুল জনসংখ্যার বৃদ্ধির দায় আমাদের মতো দেশের পক্ষে নেওয়া অসম্ভব। তাই জনবিস্ফোরণ আমাদের একটি অন্যতম সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা।

### ৭.৩.১ জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ

জন্মহার ও মৃত্যু হারের মধ্যে ব্যাপক ব্যবধানই ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। অন্যান্য দেশের মতো চিকিৎসা শাস্ত্রে উন্নতির মাধ্যমে ভারতে মৃত্যু হার অনেক হ্রাস হয়েছে কিন্তু জন্মহার নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়নি। সমীক্ষা দ্বারা জানা গেছে ভারতের ৪১% মহিলা নিরক্ষর এবং তারা কোনরকম জন্ম নিয়ন্ত্রণ করার পদ্ধতি জানেন না। এছাড়া পুত্র সন্তান কামনা, ধর্মীয় অপব্যাখ্যা, নিম্ন জীবন যাত্রার মান, বহু বিবাহ ইত্যাদিও জনসংখ্যার বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করেছে। সর্বোপরি সরকার কর্তৃক গৃহীত পরিবার কল্যাণ কর্মসূচির বাস্তবায়নের উপযুক্ত পরিকাঠামোর অভাবে জন্ম নিয়ন্ত্রণ কার্যকর হয়নি।

### ৭.৩.২ জনবিস্ফোরণের প্রভাব

জনবিস্ফোরণ ভারতে বিভিন্ন ধরনের আর্থিক সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার জন্ম দিয়েছে। মাথাপিছু আয় ও সম্পদের সুবণ্টনে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলি বহু প্রয়াস করেও অসফল। অধিক জনবিস্ফোরণের জন্য ভারতবর্ষ আজ নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। সমস্যাগুলি হল— বেকারত্ব, দারিদ্র, অশিক্ষা, অপুষ্টি, খাদ্য সঙ্কট, পানীয় জল সঙ্কট, স্কুল ও হাসপাতালের সুবিধালাভে অসমর্থ, অপর্যাপ্ত পরিবহন ব্যবস্থা, সংক্রামক রোগের বিস্তার, শিশুশ্রমিক, অসামাজিক ক্রিয়াকলাপ বৃদ্ধি, পরিবেশ দূষণ ইত্যাদি। এই ধরনের প্রচুর সমস্যায় ভারতবর্ষ আজ জর্জরিত, তার একমাত্র অন্যতম কারণ জনবিস্ফোরণ। তাই আজও ভারত উন্নয়নশীল দেশগুলির একটি।

### ৭.৩.৩ পরিবার কল্যাণ কর্মসূচী (Family Welfare Program)

কেন্দ্র সরকারের অধীনে ১৯৫১ সালে ভারতে জাতীয় পরিবার কল্যাণ কর্মসূচী চালু করা হয়। প্রধান লক্ষ্য হল জন্ম নিয়ন্ত্রণ। প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী কর্মসূচীটি পুরোটাই ক্লিনিক্যাল ভিত্তিক ছিল। কিন্তু ১৯৬১ সালের জনসুমারির পর তা পুরোপুরি শিক্ষাদান ও ক্লিনিক্যাল ভিত্তিক হয়। পরবর্তীকালে চতুর্থ ও পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে জন্মহার ৩৫ থেকে ৩২তে নামিয়ে আনার পরিকল্পনা নেওয়া হয়। অষ্টম পরিকল্পনাতে (১৯৯২-৯৭) NGO গুলিকে কাজে লাগানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়। ভারতের জাতীয় কল্যাণ কর্মসূচী জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য নানারকমের জন্ম নিরোধক সামগ্রীর প্রস্তাব দেয়, যেমন— কন্ডোম, গর্ভনিরোধক বড়ি, ইন্ট্রা ইউরাইন ডিভাইস (IUD) যেমন— কপার-টি। এছাড়া গর্ভনিরোধক, জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে জনসচেতনতা মূলক কর্মসূচী গ্রহণ এবং তা সফল করার জন্য সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলিকে কাজে লাগানো হয়। ২০০২-২০০৩ সালে অনিয়ন্ত্রিত যৌন সংযোগ বা অযাচিত গর্ভাবস্থাকে রোধ করার জন্য আপতকালীন গর্ভনিরোধক বড়ির প্রচলন করা হয়। উপরিউক্ত পদ্ধতি ছাড়া আরও একটি বহুল প্রচলিত পদ্ধতি হল বন্ধ্যাত্বকরণ। জাতীয় পরিবার কল্যাণ কর্মসূচীর অন্তর্গত বন্ধ্যাত্বকরণ পদ্ধতিগুলি হল—

- টিউব্যেক্টমি : এটি মহিলাদের বন্ধ্যাত্বকরণ পদ্ধতি যা ফ্যালোপিয়ান নালিকে কেটে করা হয়।
- ভ্যাসিক্টমি : এটি পুরুষদের বন্ধ্যাত্বকরণ পদ্ধতি যা ভ্যাস ডিফারেন্সকে কেটে করা হয়।

## ৭.৪ পরিবেশ ও মানব স্বাস্থ্য (Environment and Human Health)

মানব স্বাস্থ্য বলতে কেবল রোগ, ঔষুধ, ডাক্তার, হাসপাতালকে বোঝায় না, স্বাস্থ্য বলতে বোঝায় নীরোগ দেহ। পরিবেশবিদদের মতে স্বাস্থ্য হল মানুষ এবং তার পরিবেশের মধ্যে প্রাণবন্ত সহাবস্থান। অর্থাৎ অসম্পূর্ণ মানুষ ও অসম্পূর্ণ পরিবেশের আত্মসম্পর্ক রোগের সৃষ্টি করে। স্বাস্থ্য, নির্ভর করে মানুষের দৈহিক, সামাজিক, মানসিক, সংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবেশের উপর।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এর মতে স্বাস্থ্য হল দৈহিক, মানসিক ও সামাজিক পরিপূর্ণতার সার্বিক প্রকাশ। অর্থাৎ বিশেষ ভৌগোলিক এবং সামাজিক অবস্থানে একজন বয়স ও লিঙ্গ সাপেক্ষে স্বাভাবিকভাবে সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পরিচালনায় কার্য সম্পাদন কুশলতা হল সুস্বাস্থ্যের লক্ষণ।

স্বাস্থ্যের গুণগত অবস্থার উপর নির্ভর করে স্বাস্থ্যকে কতগুলি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা—

ধনাত্মক স্বাস্থ্য ↔ উন্নতর স্বাস্থ্য ↔ রোগের অনুপস্থিতি // অপরিকল্পিত অসুখ ↔ অসুস্থতা ↔ অধিক অসুস্থতা ↔ মৃত্যু

### ৭.৪.১ মানব স্বাস্থ্যের ওপর পরিবেশের প্রভাব

পরিবেশ মানব স্বাস্থ্যকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে। পরিবেশকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়— আভ্যন্তরীন ও বাহ্যিক পরিবেশ। আভ্যন্তরীন পরিবেশ যা আসলে মানুষের আভ্যন্তরীন অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, কোষ কলা ইত্যাদির সহাবস্থানের মাধ্যমে দেহ সুঠাম ও সবল হয়ে ওঠে। অন্যদিকে মানব শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকেই পরিবেশের সমন্বয়ে মানসিক ও সামাজিক ভাবে মানুষের দৈহিক, প্রাকৃতিক ও মানসিক বিকাশ সম্পূর্ণ হয়।

পরিবেশ যদি রোগ জীবাণুর বংশ বিস্তার সহায়ক হয় বা ছড়াতে সাহায্য করে তখন মানুষ রোগের কবলে পড়ে। আবার পরিবেশ যদি মানব দেহের সহায়ক হয়ে ওঠে তবে তার রোগ জীবাণুর বিরুদ্ধে সুরক্ষা বলয় তৈরি করে। সহজ কথায় বলা যায় পরিবেশ স্থিতিশীল দণ্ডের ন্যায় কাজ করে, কিছুমাত্র পরিবর্তন রোগ সৃষ্টির কারণ হতে পারে। জীবাণু, মানবদেহ ও পরিবেশের আত্ম সম্পর্ককে এপিডেমিওলজিক্যাল ট্রায়েড (Epidemiological Triad) বলা যায়।

চিত্র ৭.২ : রোগজীবাণু, মানবদেহ ও পরিবেশের আত্মসম্পর্ক (উৎস : Text Book of Preventive and Social Medicine, -K, Park)

## ৭.৫ সংক্রামক ব্যাধি (Communicable Disease)

কয়েকটি সংক্রামক ব্যাধি সম্পর্কে আলোচনা করা হল—

### ৭.৫.১ যক্ষ্মা রোগ (Tuberculosis)

যক্ষ্মা বা টিবি, *M. tuberculosis* নামক জীবাণুঘটিত রোগ, সাধারণত ফুসফুস, অস্থি, লিম্ফ, গ্ল্যান্ডস ও অস্থির সংযোগ স্থলে টিবির সংক্রমণ ঘটে থাকে। বিশ্বে টিবি আক্রান্ত দেশগুলির মধ্যে ভারত প্রথম স্থান অধিকার করে আছে। প্রতি বছর প্রায় ১৮ লক্ষ লোক টিবি দ্বারা আক্রান্ত হয়ে থাকে এবং তাদের মধ্যে ৪ লক্ষ লোক মারাও যায়।

**সংক্রমণ :**

এটি একটি বায়ু বাহিত রোগ। আক্রান্ত যক্ষ্মা রোগীর কাশি, থুতু, কফ, শ্লেষ্মার মাধ্যমে রোগের জীবাণু বাতাসে ছড়ায় এবং সুস্থ মানুষকে আক্রান্ত করে। জীবাণু সংক্রমণের সাধারণত ৩-৬ সপ্তাহের পর যক্ষ্মা রোগ প্রকাশ পায়।

**লক্ষণ :** যক্ষ্মা রোগের সংক্রামণের লক্ষণগুলি হল—

- এক মাস বা তার বেশি দিন ধরে কাশি এবং জ্বর
- বুকে ব্যাথা
- কাশির সাথে রক্ত
- ক্রমান্বয়ে ওজোন হ্রাস ও ক্ষুদামন্দা

এছাড়া কফ, থুতু, পরীক্ষা, এক্স-রে ও টিউবারকিউলিন পরীক্ষা দ্বারা সংক্রমণ জানতে পারা যায়।

**চিকিৎসা :**

সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা দ্বারা এই রোগ নিরাময় করা সম্ভব। বর্তমানে DOT (Directly Observed Treatment) প্রকল্পে নিখরচায় সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এই রোগের চিকিৎসা করা হয়। নিয়মিত স্বাস্থ্যকর্মীর তত্ত্বাবধানে প্রায় নয় মাস ঔষুধ সেবন করলে এই রোগ সম্পূর্ণ নিরাময় হয়। নিয়মিত ঔষুধ না খেলে জীবাণুগুলি TB-ঔষুধের প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করে ফেলে সেইসব রোগীকে সুস্থ করে তোলা ব্যয়বহুল ও দুষ্কর হয়ে পড়ে। এছাড়া শিশুর জন্মের পর BCG (Bacilli Chalmette Guerin) টিকা সারাজীবন টিবি রোগ থেকে রক্ষা করে।

### ৭.৫.২ ম্যালেরিয়া (Malaria)

ম্যালেরিয়া একটি প্রোটোজোয়া ঘটিত রোগ এবং স্ত্রী-প্রজাতির অ্যানোফিলিস মশা এই রোগ বহন করে। WHO-এর তথ্য (২০০৯) অনুযায়ী বিশ্বে বছরে প্রায় ২০ কোটি মানুষ ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত এবং এক লক্ষ লোক মারা যান। প্রধানত ৪ প্রকারের ম্যালেরিয়ার প্যারাসাইট সংক্রমণ ঘটায়, যেমন *P. vivax, P. falciparum, P. malariae, P. ovale*। এই প্রজাতিগুলির মধ্যে ভারতে প্রায় ৭০% সংক্রমণ *P. vivax* দ্বারা এবং প্রায় ২৫% সংক্রমণ *P. falciparum* দ্বারা হয়ে থাকে ও মৃত্যুও হয়। বিশ্বের উন্নত দেশগুলি থেকে ম্যালেরিয়া বিদায় নিয়েছে কিন্তু ভারত সহ অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলি থেকে তা সম্ভবপর হয়নি একমাত্র ঘনবসতি ও দূষণের কারণে, যা মশাকুলের বসবাসের উপযুক্ত করে তুলেছে।

**সংক্রমণ :**

ম্যালেরিয়া সব বয়সের মানুষকে আক্রমণ করে, তবে মহিলা অপেক্ষা পুরুষদের আক্রমণের হার বেশি। গর্ভাবস্থায় মহিলাদের সংক্রমণের প্রবণতা বেশি থাকে এমনকি গর্ভস্থ সন্তানের মৃত্যুর আশঙ্কাও থাকে। সাধারণত মশারি না টাঙিয়ে শোওয়া ম্যালেরিয়া সংক্রমণের প্রধান কারণ। তাছাড়া ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে এবং সংক্রামিত রোগীর কাছ থেকে রক্তগ্রহণের মাধ্যমেও রোগ ছড়াতে পারে।

**লক্ষণ :**

ম্যালেরিয়ায় সংক্রামিত মশা কামড়ানোর ৯-১০ দিনের পর ম্যালেরিয়ার লক্ষণ দেখা দিতে পারে কিন্তু তা বিভিন্ন প্রজাতির ওপর নির্ভর করে। ম্যালেরিয়ার লক্ষণগুলি হল— অত্যধিক তাপমাত্রা, মাথাব্যাথা, বমিভাব, সারা শরীরে ব্যাথা, দুর্বলতা, এছাড়া চামড়ায় র‍্যাশ্ বেরোয়, একনাগাড়ে জ্বর চলতেই থাকে ও মানুষ ভুল বকে। এই রোগে রোগীর মৃত্যুর হার অত্যধিক থাকে।

**চিকিৎসা :**

ম্যালেরিয়ার লক্ষণগুলি দেখা গেলে রোগীর রক্ত পরীক্ষা করাতে হবে এবং রক্তে প্যারাসাইটের উপস্থিত থাকলে নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসা করাতে হবে।

**ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ :**

- বাড়ির আশপাশ পরিষ্কার রাখতে হবে, বর্ষাকালে জল জমতে দেওয়া চলবে না। কারণ পরিষ্কার জমা জলে ম্যালেরিয়ার মশা ডিম পাড়ে।
- মশারি খাটাতে হবে বা মশা মারার ঔষধ ব্যবহার করা যেতে পারে।
- ডোবা, মজা পুকুর বা নদর্মাতে তেলাপিয়া ও গ্যাম্বুসিয়া মাছের চাষ করলে তারা মশার লার্ভা খেয়ে ফেলে ফলে মশার উপদ্রব কমে।

**৭.৫.৩ ডেঙ্গু (Dengue)**

এটি একটি ভাইরাস ঘটিত রোগ যার বাহক *Aedes aegypti* ও *Aedes albopictus* প্রজাতির মশা। বর্ষাকালে মশা বেশি হওয়ার কারণে ডেঙ্গুর প্রভাবও বেশি লক্ষ্য করা যায়। সব বয়সের নারী ও পুরুষ আক্রান্ত হয়। ডেঙ্গুর দুটি ভাগ আছে Dengue Haemorrhagic Feaver (DHF) ও Dengue Shock Syndrome (DSS)।

**লক্ষণ :**

সাধারণত শুরুর দিকে কাঁপুনি দিয়ে জ্বর, অসহ্য মাথাব্যথা, ক্ষুধামন্দা, চোখের যন্ত্রণা, গাঁটে ব্যথা দেখা দেয়, জ্বর হয় (১০৩-১০৪°C), মুখে গলায় র‍্যাশ্ বেরোয়। ৫ দিন পর জ্বর ছেড়ে দেয়।

DHF-এর ক্ষেত্রে ৪-৬ দিন জ্বর, পেট ব্যথা ও মুখ দিয়ে রক্ত বমি ও প্লাজমা বেরোতে থাকে। রক্ত পরীক্ষা দ্বারা শনাক্তকরণ করা যেতে পারে। DSS লক্ষণগুলি DHF-এর মতই থাকে, শুধুমাত্র ‘শক’ দেখা যায় এর মাধ্যমে মৃত্যু হার বেশি হয়।

**প্রতিরোধ ব্যবস্থা :**

ম্যালেরিয়ার মতই উপযুক্ত টীকার ব্যবস্থা না থাকার কারণে মশার কামড় থেকে বাঁচাই উপযুক্ত প্রতিষেধক ব্যবস্থা, মশার বিনাশ করাই একমাত্র উপায় ও মশারি ব্যবহার করতে হবে।

**৭.৫.৪ ডাইরিয়া বা পাতলা পায়খানা (Diarrhea Diseases)**

দিনে তিনবারের বেশি পাতলা পায়খানা হলে তাকে ডাইরিয়া বলা যেতে পারে, এটি বিভিন্ন ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়ার জন্য হয়ে থাকে। ডাইরিয়ার জন্য হাজার হাজার লোক প্রতি বছর মারা যায়।

**সংক্রমণ :**

সাধারণত দূষিত জল, দূষিত খাদ্য গ্রহণ করার ফলে এই রোগ হয়ে থাকে। আক্রান্ত রোগীর মূল মূত্র থেকে জীবাণু, মাছি, আরশোলা দ্বারা খাদ্য ও জল দূষিত করে থাকে। এছাড়া ভালো করে হাত না ধুয়ে খাদ্য গ্রহণ করলেও এই রোগ ছড়ায়, তাই বাচ্চারা বেশি আক্রান্ত হয়ে থাকে। এছাড়া বাসি, পচা খাবার, অপরিশোধিত জলে তৈরি আইসক্রীম সংক্রমণকে বাড়িয়ে দেয়।

**প্রতিকার :**

অত্যধিক বার পায়খানা করার ফলে শরীরে সোডিয়াম, পটাশিয়াম এর অভাব হয়। রোগী দুর্বল হয়ে পড়ে ও মারা যায়। তাই রোগীর শরীরে ইক্সট্রোলাইট ব্যালান্স করে রোগীকে স্থিতিশীল করা প্রয়োজন। তার জন্য রোগীকে Oral Rehydration Salt (ORS) ১ লিটার জলে গুলে বারে বারে খাওয়াতে হবে তাছাড়া বাড়িতে মুড়ি ভেজা জল, ডালের জল, ডাবের জল, নুন-চিনির সরবত ইত্যাদি খাওয়ালে সাধারণভাবে ডাইরিয়ার উপশম হয়। কিন্তু বেশি বাড়াবাড়ি হলে হাসপাতালে ভর্তি করাটাই উচিত।

ডাইরিয়ার প্রকোপ কমাতে গেলে বিশুদ্ধ জল খেতে হবে, খাবার খাওয়া ও খাবার দেবার সময় হাত সাবান দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে। খাবার দাবার সবসময় ঢাকা দিয়ে রাখতে হবে। যত্রতত্র মল মূত্র ত্যাগ করা চলবে না বাড়ি ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে, মাছির উপদ্রব কমাতে হবে। সর্বোপরি জনগণকে বিশেষ করে বাড়ির মহিলাদেরে জ্ঞান দান ও সচেতন করতে হবে।

৭.৫.৫ **এইডস (AIDS)**

HIV (Human Immuno Deficiency Virus) ভাইরাস ঘটিত রোগ হল এইডস (AIDS- Acquired Immuno Deficiency Syndrome)। এইডস সংক্রমণের ফলে দেহের প্রতিরোধ ব্যবস্থা হ্রাস পায় এবং তার ফলে অন্যান্য রোগ দেহে বাসা বাঁধে। HIV ভাইরাস দেহে রক্তের মাধ্যমে বা যৌন সংযমের মাধ্যমে প্রবেশ করে এবং T-helper cell কে আক্রান্ত করে শ্বেত রক্তকণিকা গুলিকে নষ্ট করে। ফলে রোগী ধীরে ধীরে দুর্বল ও প্রতিরোধ ক্ষমতাহীন হয়ে পড়ে। অবশেষে AIDS রোগে আক্রান্ত রোগী একটি মারাত্মক রোগে যেমন— যক্ষ্মা, ক্যানসার, ডাইরিয়া, নিউমোনিয়া ইত্যাদিতে আক্রান্ত হয় এবং অবশেষে তাতেই মারা যায়। ১৯৮৬ সালে ভারতের তামিলনাড়ুতে প্রথম AIDS-এর রোগীর সন্ধান পাওয়া যায়।

**সংক্রমণ :** AIDS বিভিন্ন ভাবে মানবদেহে ছড়াতে পারে,

- যৌনসঙ্গম-এর মাধ্যমে
- আক্রান্ত রোগীর রক্ত গ্রহণের মাধ্যমে

- সংক্রামিত ইনজেকসন সিরিঞ্জ ও চিকিৎসার যন্ত্রপাতি দ্বারা
- এইডস আক্রান্ত গর্ভবতী মা থেকে শিশুর দেহে সংক্রমণ হয়।

**লক্ষণ :**

- মাসে ১০% বা তার বেশি দেহের ওজন হ্রাস
- ঘন ঘন রোগে আক্রান্ত হওয়া
- জ্বর সর্দি কাশি লেগেই থাকা

সাধারণত ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay) ও Western Blot Test দ্বারা এই রোগ শনাক্ত করা হয়।

**প্রতিকার :**

- আক্রান্ত রোগীর কাছ থেকে রক্ত, প্লাজমা বা অঙ্গ প্রতিস্থাপন করা চলবে না।
- যৌন সঙ্গমের ক্ষেত্রে সুরক্ষা অবলম্বন করা জরুরি যাতে দেহ রসের কোন সংযোগ না ঘটে।
- অন্যের ব্যবহৃত ছুঁচ, ব্লেড ইত্যাদি ব্যবহার করা চলবে না।
- $HIV^+$ হলে স্ত্রী লোকের গর্ভ সঞ্চার না হওয়ায় বাঞ্ছনীয়।

## ৭.৬ অসংক্রামক ব্যাধি (Non-Communicable Diseases)

যে রোগ কোনভাবে এক মানুষ থেকে অন্য মানুষ বা পশু থেকে মানুষের দেহে ছড়ায় না তাদের অসংক্রামক ব্যাধি বলে। সাধারণত অতিরিক্ত ধূমপান, মদ্যপান, খাদ্যাভাস, মানসিক দুশ্চিন্তা, ঝুঁকিপূর্ণ পেশা ইত্যাদি। সাধারণত যে রোগগুলি হয়ে থাকে তা হল—

### ৭.৬.১ হৃদরোগ (Cardiovascular Disease)

মানুষের গড় আয়ু বাড়ার সাথে সাথে বাড়ছে হৃদরোগ। গ্রামের মানুষদের থেকে শহরের মানুষের আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা অনেক বেশি, এর দৈহিক কারণগুলি হল— মেদ বৃদ্ধি, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, অতিরিক্ত ধূমপান, তৈলাক্ত খাবার বেশি খাওয়া, কায়িক পরিশ্রমের অভাব হৃদরোগের জন্য অন্যতম কারণ। শরীরে প্লাজমা-কোলেস্টেরল-এর ঘনত্ব 200 mg/dl এর ওপরে গেলে হৃদরোগের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।

**প্রতিরোধ :**

হৃদযন্ত্রকে ঠিক রাখতে গেলে—

- দেহে রক্তচাপ ও কোলেস্টেরল-এর মাত্রা বজায় রাখতে হবে।
- কায়িক পরিশ্রম করতে হবে।
- মানসিক দুশ্চিন্তা দূর করতে হবে ও ভালো ঘুম জরুরি, রোজ প্রায় ৮ ঘণ্টা।
- সর্বোপরি সরল ও সঠিক সময় আহার গ্রহণ করতে হবে।

### ৭.৬.২ কর্কট রোগ (Cancer)

ক্যান্সার বলতে কোন কোষের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি, টিউমারের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ও আক্রান্ত অংশের দূরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে আক্রমণের ক্ষমতার ফলে রোগীর মৃত্যুকে বোঝায়। সারা বিশ্বে ৬০ লক্ষেরও বেশি লোক আক্রান্ত এবং ভারতের প্রায় ৩.৫ লক্ষ লোক মারা যাচ্ছে প্রতিবছর। মেয়েদের মধ্যে স্তন ও জরায়ুর ক্যান্সার এবং পুরুষদের ক্ষেত্রে ফুসফুস ও মুখের ক্যান্সার বেশি হয়।

**ক্যান্সারের কারণ :**

- ধূমপান, দক্তা, পানমশলা ইত্যাদি গ্রহণ মুখ ও ফুসফুসের ক্যান্সারের অন্যতম কারণ।
- অতিরিক্ত মদ্যপান লিভারে ক্যান্সারের সৃষ্টি করে।
- পরিবেশ দূষিত আর্সেনিক, ক্রোমিয়াম, ক্যাডমিয়াম, এসবেস্টস, বেঞ্জিন ইত্যাদিও ক্যান্সারের সম্ভাবনা বাড়ায়।
- হেপাটাইটিস- B, C ক্যান্সারের পার্শ্ব ভাবে সহায়ক।
- সূর্যের অতি বেগুনী রশ্মি, এক্সরে ইত্যাদি ত্বকে ক্যান্সার ঘটায়।
- বংশানুক্রমে জিন দ্বারা কিছু কিছু ক্যান্সার হয়।

**প্রতিরোধ :**

- ধূমপান, তামাক সেবন এবং মদ্যপান বর্জন করতে হবে।
- এক্সরে, সূর্যের বিকিরণ এড়িয়ে চলতে হবে।
- হেপাটাইটিস-বি রোগের টীকা করণ করা দরকার।
- ক্যান্সারের লক্ষণ আগে থেকে বুঝতে পারলে ডাক্তারের পরামর্শ ও শনাক্তকরণ করা জরুরি।

যদিও মাত্র এক তৃতীয়াংশ রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ সম্ভব।

### ৭.৬.৩ মধুমেহ রোগ (Diabetes Mellitus)

এটি একটি জটিল ব্যাধি, দীর্ঘস্থায়ী hyperglycemia হল এর লক্ষণ। দেহ দুর্বল হয়ে পড়ে, শর্করা জাতীয় খাদ্য কোষে পৌঁছায় না এবং রক্তে বিদ্যমান থাকে। এর প্রধান কারণ দেহ ইনসুলিন উৎপন্ন করতে পারে না। ইনসুলিন শর্করাকে বিপাকে সাহায্য করে। দেহ দুর্বল ও কোষে সঠিক পুষ্টি না পাবার ফলে বিভিন্ন অসুখকে ত্বরান্বিত করে বা সৃষ্টিতে সাহায্য করে, যেমন— হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, চোখের দৃষ্টি শক্তি হ্রাস, কিডনি নষ্ট হওয়া ইত্যাদি।

**প্রতিরোধ ব্যবস্থা :**

- দেহের স্বাভাবিক ওজন, নিয়মিত ব্যায়াম করা।
- রক্তে শর্করার মাত্রা ঠিক রাখা।
- মানসিক চিন্তা কম করা, রক্ত চাপ কম রাখা।
- পরিবারের ইতিহাসে এই রোগ থাকলে তাদের সামলে চলতে হবে এবং মিষ্টি কম খেতে হবে।

- ডায়াবেটিস রোগীদের নিয়মিত ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে ও ওষুধ খেতে হবে।
- অন্যান্য অঙ্গ যেমন— চোখ, হৃদযন্ত্র ইত্যাদিও মাঝে মধ্যে পরীক্ষা করাতে হবে।

## ৭.৭ অনুশীলনী

**সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করুন :**

(১) ২০১১ সাল অনুযায়ী ভারতের জন সংখ্যা—

(i) ১০২ কোটি (ii) ১১২ কোটি (iii) ১২১ কোটি (iv) ১২৫ কোটি

(২) Natality বৃদ্ধি পেলে জনসংখ্যা—

(i) কমে যাবে (ii) বাড়বে (iii) একই থাকবে (iv) কোনটি নয়

(৩) DOTs-এর কোন রোগের উপশম ব্যবস্থা—

(i) AIDSs (ii) Hepatatis (iii) যক্ষ্মা (iv) ম্যালেরিয়া

(৪) AIDs কোন রোগ শনাক্তকরণের উপায়—

(i) এক্স রে (ii) টিউবার কিউলিন (iii) স্মিয়ার টেস্ট (iv) ELISA

(৫) কর্কট রোগের কারণ—

(i) ধূমপান (ii) অতিরক্তি মদ্যপান (iii) UV-রশ্মির কারণে (iv) সবকটি

**অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :**

(১) জনসংখ্যা কি?

(২) লিঙ্গ অনুপাত কি?

(৩) স্বাস্থ্য বলতে কি বোঝেন?

(৪) ORS কি?

(৫) AIDS রোগ কোন ভাইরাসের জন্য হয়ে থাকে?

**সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :**

(১) জন্মহার ও মৃত্যুহার কাকে বলে ব্যাখ্যা করুন।

(২) ধারণ ক্ষমতা কাকে বলে?

(৩) মানবস্বাস্থ্য ও পরিবেশের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করুন।

(৪) AIDS সংক্রমণ কিভাবে হয় ও তার প্রতিকার সম্পর্কে লিখুন।

(৫) মধুমেহ রোগের প্রতিরোধ ব্যবস্থাগুলি আলোচনা কর।

**উত্তর সংকেত**

**নির্বাচন ভিত্তিক প্রশ্ন :**

(১) (iii) ১২১ কোটি (২) (i) কমে যাবে (৩) (iii) যক্ষ্মা

(৪) (iv) ELISA (৫) (iv) সবকটি

## ৭.৮ সহায়ক গ্রন্থাবলী

Agrawal, K. M., Sikdar, P. K. & Deb, S. C. (2002). *A Textbook of Environment* (1st ed.). Macmillan India Limited.

Barrick, M., Barrett, G. W. & Odum, E. P. (2005) *Fundamentals of Ecology* (5th ed.) Cengage.

Basu, M., Xavier, S. (2016). *Fundamentals of Environmental Studies.* Cambridge University Press.

Bharucha, E. (2003). *Textbook of Environmental Studies for UG Courses* (2nd ed.). Unisersities press (India) Private Limited.

Bhattacharya, K., Ghosh, A. K., Hati, G. (2017). *A Textbook of Botany* (1st ed.). New Central Book Agency (NCBA)

Government of India (2011). *Census of India (Provisional).* New Delhi, Ministry of Information and Broadcasting.

Park, K. (2005). *Park's Textbook of Priventive and Social Medicine* (18th ed.). M/s. banarasidas Bhanot.

Rajagopalan, R. (2011), *Environmental Studies from Crisis to Cure* (2nd ed.). Oxford University Press.

Tripathi, A. K. (2018). *Environmental Studies Multiple Choice Questions.* TERI Press.

Study Material (2019). NSOU, *Environmental Studies (BDP)*, 33th, Reprint.

# NOTES

# NOTES